অর্পিতা সরকার

এসো না অসময়ে

এসো না অসময়ে

অর্পিতা সরকার

এসো না অসময়ে



পত্রভারতী®

www.patrabharati.com

পত্রভারতী®

প্রথম প্রকাশ **নভেম্বর ২০২২**

দ্বিতীয় মুদ্রণ **ডিসেম্বর ২০২২** তৃতীয় মুদ্রণ **জানুয়ারি ২০২৩**

পত্রভারতী বুকস প্রাইভেট লিমিটেড, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ **কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল**

অলংকরণ **ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য**

ESHO NA ASHOMOYE

Collection of Love Stories *by* Arpita Sarkar

Published by PATRA BHARATI BOOKS Pvt. Ltd.

1/1 Brindaban Mallick Lane, Kolkata 700009

Sales Office : PATRA BHARATI®

at 3/1 College Row, Kolkata 700009

+91-33-22411175, 9433075550

+91-33-22411175, 9433075550

info@patrabharati.com

patrabharatibooks 9830806799

ISBN 978-93-95635-03-5

আমার বাপি
৺নবকুমার ঘোষকে
অলক্ষ্যে থাকলেও যার উপস্থিতি
আমার প্রতিটা সাফল্যে আমি অনুভব করি আজও।



প্রেম

'এসো না অসময়ে' বইয়ের বড় গল্পগুলোর মূল বিষয় প্রেম। সে প্রেম কখনও আপেক্ষিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে চিরস্থায়ী হয়েছে, আবার কখনও ঋতুরাজের সঙ্গে এসে তার সঙ্গেই ফিরে গেছে। ভালোবাসা নামক ম্যাজিকাল ওয়ার্ডের আশায় গল্পের সমস্ত চরিত্ররাই রাজপথ থেকে মফস্‌সলে ছুটে বেড়িয়েছে। কখনও তাদের কাছে ভালোবাসা ধরা দিয়েছে, কখনও অনুরাগের ছোঁয়ায় রাঙিয়ে দিয়েছে দুটি হৃদয়, কখনও ভালোবাসা নামক মরীচিকাকে ধরতে গিয়ে শুধুই কেঁদেছে মন।

এ বইয়ের প্রতিটা গল্প বলবে প্রেমের বিভিন্ন রূপ। গল্পের চরিত্ররা বলবে, তাদের জীবনে ভালোবাসা কীভাবে এসেছিল তার গল্প। চরিত্রগুলো কোনো কল্পনার জগতে বসবাস করে না। চরিত্রগুলো আপনার ভীষণ চেনা, হয়ত আপনিও একইভাবে জীবনকে দেখেছেন, ভালোবেসেছেন উজাড় করে। 'এসো না অসময়ে'-র দশটি বড়গল্প আশাকরি পাঠকদের নিরাশ করবে না।

অর্পিতা সরকার



সূচিপত্র



ফেসবুক প্রোফাইল

আত্রেয়ী ডাইনিং টেবিলে নিখুঁত করে ভাতের থালা সাজিয়ে একটু তটস্থ হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। সায়ন্তন ভীষণ রকমের খুঁতখুঁতে আর রাগী। পছন্দ না হলে ভাতের থালা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে না খেয়ে চলে যাবে। তারপর থেকে শুরু হবে আত্রেয়ীর শাশুড়ির অমৃতবাণী। কেন তাঁর ছেলে না খেয়ে চলে গেল, ঠিক কী খুঁত হয়েছিল তাকে খেতে দিতে, এসব তল্লাশি চালিয়ে মহিলা শেষ পর্যন্ত ওকেই দোষী সাব্যস্ত করবেন। আত্রেয়ী নিজেও চায় দোষী হয়ে এই দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে। রান্নাবান্না করে দিলেও সায়ন্তনকে খেতে দিতে ওর একটুও ভালো লাগে না। বিয়ের পর পর অনেক আগ্রহ নিয়ে খাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করত আত্রেয়ী। কিন্তু দেখেছে কোনো না কোনো খুঁত বের করে, চিৎকার করে আত্রেয়ীকে দুটো বাজে কথা বলার মধ্যে সায়ন্তন একটা স্যাডেস্টিক প্লেজার পায়। সায়ন্তন খুব চিৎকার করে কথাগুলো বলে, যাতে আশেপাশের বাড়ির লোকজন শুনতে পায়। আত্রেয়ীর শাশুড়ি বেশ গর্ব করে বলেন, 'আমার সোনুর কাছে এসব ছাড় নেই। বেশ শাসনে রেখেছে বউকে।'

আত্রেয়ীর কোনো রাগ বা অভিমান হয় না এদের প্রতি। আত্রেয়ী নিজেকে শক্ত করে নিয়েছে। তার একমাত্র অভিমানের জায়গা তার বাবা। বাবাই পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছে সায়ন্তনের সঙ্গে। নিজের বাবাই যখন মেয়ের মনের খবর নিল না, তখন পরের বাড়িতে এর থেকে বেশি আর কী বা আশা করা যায়! সায়ন্তন, ওর বাবা বা মা এদের ওপরে কখনও তেমন রাগ বা অভিমান হয়নি। কারণ এদের কোনোদিন ও নিজের মানুষ ভাবেইনি। তাই এদের ওপরে কোনো রাগ নেই ওর। আত্রেয়ী শুধু বিয়ের পর থেকে বাবার সঙ্গে আর কখনও আগের মতো প্রাণখুলে গল্প করেনি। বাবা শ্বশুরবাড়িতে এলে যত্ন করে খাইয়েছে, আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি করেনি, কিন্তু আগের মতো বাবার সঙ্গে গল্পে ভাসেনি। বাবা হয়তো আত্রেয়ীর পরিবর্তনটা খেয়াল করেছে, তাই বারংবার বলেছে, 'মামনি আমার কাছে একটু বস না।'

আত্রেয়ী হেসে বলেছে, 'উঁহু, তুমি এবাড়ির আত্মীয়, তোমার যত্নের যেন কোনো ত্রুটি না হয় সেটা দেখা আমার কর্তব্য।'

বাবা গাঢ় গলায় বলেছে, 'আর তুই বুঝি আমার মেয়ে নোস?'

আত্রেয়ী হেসে উত্তর দিয়েছে, 'ছিলাম বিয়ের আগে।'

মা-ও অনেক চেষ্টা করেছে বাবার সঙ্গে দূরত্বটা ঘুচিয়ে দিতে। কিন্তু আত্রেয়ীর জেদ বড় ভয়ঙ্কর। নিজেকে একটু একটু করে শেষ করে দেবে তবুও বাবাকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না ও। ওর কাছে বাবার এখন একটাই পরিচয়—বিশ্বাসঘাতক।

সায়ন্তন ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে বলল, 'আজ মাত্র তিনরকম ভাজা কেন? আর নেই? এরপর সারাদিন তো শুয়ে-বসে সিরিয়াল দেখে সময় কাটবে। একটু রান্না করতেও কষ্ট হয়? তাও তো তাপুর মা আছে হেল্পিং হ্যান্ড হিসাবে।'

গলার পারদ চড়ছিল সায়ন্তনের। এ ওর রোজকার রুটিন। এরপর খেয়ে নেবে চুপচাপ। কিন্তু বসেই একপ্রস্থ চিৎকার করে নেবে। খুব রেয়ার ভাত ফেলে বেরিয়ে যায়। আত্রেয়ী জানে সেদিন অন্যত্র নিমন্ত্রণ থাকে ওর। ফোনে কখনও কখনও শুনেছে সে কথা। নিমন্ত্রণ আছে জেনেও ওকে দিয়ে রান্না করাবে, খেতে দেওয়াবে তারপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বীরত্ব দেখাবে। প্রথম বছরটা খুব কষ্ট হত, কান্না পেত। দু-একটা কথাও বলে ফেলত আত্রেয়ী। কথা বললেই সায়ন্তন আরও ভায়োলেন্ট হয়ে যেত। তাই আত্রেয়ী টেকনিকটা শিখে নিয়েছিল। একটা কথাও উচ্চারণ করত না। শুধু বলত, 'সরি।' এতে অনেকটা কাজ হতো। আত্রেয়ী জানে এবাড়ির সকলেই মানসিকভাবে অসুস্থ। এরা কখন যে কী করবে, কেউ জানে না। সেসব কবেকার কথা। প্রায় বছর আঠেরো তো হবেই। তবুও চোখ বন্ধ করলেই টেবিলের ধারে কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা নিজেকে প্রায় দেখতে পায় আত্রেয়ী। নীচ থেকে সুনেত্রা ডাকছে। সুনেত্রা আত্রেয়ীর একমাত্র সন্তান। মুখ-চোখ-স্বভাব—সবই প্রায় বাবার মতো পেয়েছে। ছোটবেলায় যদিও বা আত্রেয়ীকে মা বলে একটু ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, তবে এই পনেরো বছরে এসে বাবার মতোই ওকে বাড়ির আর দুটো পরিচারিকার মতোই মনে করে। প্রথম যেদিন আত্রেয়ীর নামে মিথ্যে নালিশ করে, সায়ন্তনের কাছ থেকে থাপ্পড় খাইয়েছিল, সেদিনই আত্রেয়ী বুঝেছিল, আম গাছে আমই হয়।

সায়ন্তন যখন আত্রেয়ীকে মারছিল তখন সুনেত্রার চোখে আনন্দের রেশ ফুটে উঠেছিল। বাবার আদরের মেয়ে বলে কথা! সায়ন্তনও মেয়ে অন্ত প্রাণ। মেয়েটার স্বভাবও ওর মতো উগ্র। কথায় কথায় চিৎকার করা, গায়ে হাত তোলা, ঠিক যেন দ্বিতীয় সায়ন্তন। অবশ্য আত্রেয়ী বিশেষ কিছু আশাও করেনি ওর মেয়ের কাছ থেকে। আত্রেয়ী যত তাড়াতাড়ি পারত সংসারের কাজ মিটিয়ে ছুটে চলে যেত ছাদে। বিশাল আকাশের নীচে একা দাঁড়িয়ে

থেকে প্রাণভরে প্রকৃতির নির্যাসটুকু শুষে নিতে। এভাবেই বেঁচে থাকাটা ছিল ওর কাছে একমাত্র বিলাসিতা। ওই বিশালত্বের সামনে নিজের সব সমস্যাগুলোকে যেন মনে হত বড্ড ছোট। সায়ন্তন বিয়ের পর থেকেই আত্রেয়ীকে এবং আত্রেয়ীর শরীরটাকে নিজের সম্পত্তি ভেবে নিয়েছিল। রাতে বিছানায় শুয়ে চুলের মুঠি ধরে টেনে শোওয়াত আত্রেয়ীকে। তারপর, দাঁত-নখ বের করে রক্তাক্ত করত ওর গোটা শরীর। ওটাই নাকি সায়ন্তনের আনন্দ। ওতেই নাকি ও শারীরিক সুখ পায়। এমন অমানুষিকভাবে আঁচড়ানো কামড়ানোর কোনো খবর পায়নি নিউজ চ্যানেলগুলো। কারণ, আত্রেয়ী বিবাহিত। বন্ধ ঘরের এই শারীরিক অত্যাচারগুলোকে লোকে বৈবাহিক মিলন বলে, ধর্ষণ নয়।

আত্রেয়ীর চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিল, চোখের নীচে কালি পড়ে গিয়েছিল। ওর বাবা মাঝে-মাঝেই জিজ্ঞাসা করত, 'সায়ন্তন তোকে ভালোবাসে তো মামনি?'

একমুখ হেসে আত্রেয়ী বলত, 'ও বড্ড ভালোবাসে বাবা।'

'তাহলে তোর চোখের তলায় এত কালি কেন, মুখটা এমন পেলব কেন?'

আত্রেয়ী হেসে বলত, 'সুখে।'

সায়ন্তন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। নম্র-ভদ্র, আত্রেয়ীর খেয়াল রাখা ঠিক যেন পারফেক্ট হাজবেন্ড। সায়ন্তনের এরূপ আচরণ দেখে আত্রেয়ী বেশ মজা পায়। মা তো জামাই বলতে অজ্ঞান। বাবাও বারংবার বলে, সায়ন্তনের মতো ছেলে নাকি লাখে একটা পাওয়া যায়। এটা অবশ্য আত্রেয়ীও মানে। সত্যিই সায়ন্তনের মতো ছেলে লাখে একটা হয়। আত্রেয়ী ওর পরিচিত বন্ধুমহলেও এমন কোনও চরিত্রের মানুষকে দেখেনি।

আত্রেয়ী জীবনের শেষদিনের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে। একটু একটু করে পুরোনো আত্রেয়ীকে বদলে ফেলে। সায়ন্তনের যেকোনো অন্যায়

ব্যবহারে কোনোদিন ওর বাবা-মাকেও প্রতিবাদ করতে দেখেনি। আর শ্বশুরবাড়িতে তো সায়ন্তন বেস্ট জামাই। বাপের বাড়িতে আত্রেয়ী ভীষণ সুখী স্ত্রী। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির চিত্রটি বিপরীত। আত্রেয়ী ছাদের বারোটা টব আর আকাশ নিয়ে সারাদিন মেতে থাকে। ছাদের ওই টবগুলোতে আত্রেয়ী বেলফুল ফুটিয়েছে। না কোনো ভ্যারাইটি নেই, শুধুই বারোটা বেলফুলের গাছ। গাছ ভর্তি সাদা বেলফুল ছেয়ে থাকে চারিদিকে। সেই ফুল দিয়ে আত্রেয়ী ঠাকুর পুজো অবধি করে না। ওগুলো নিজেদের খেয়ালে ফোটে আবার নিজের খেয়ালেই ঝরে পড়ে। শাশুড়ি হাঁটুর ব্যথা নিয়ে দোতলার ওপরের ছাদে উঠতে পারেন না। সায়ন্তনের অকারণ নষ্ট করার সময় নেই বলেই বেঁচে আছে গাছগুলো। এরাই নির্দ্বিধায় বাঁচিয়ে রেখেছে আত্রেয়ীকে।

আরেকটা জিনিস ও বরাবর লুকিয়ে এসেছে সকলের কাছ থেকে। তা হল, কৃষ্ণেন্দুর আঁকা ছবি দেখার নেশাটা। বছর দশেক আগে ফেসবুকে কৃষ্ণেন্দুর নিজস্ব প্রোফাইলে গিয়ে ওর আঁকা ছবিগুলো দিনে অন্তত পাঁচ থেকে ছয়বার করে দেখে আসে। ওর আঁকা সেই ছবি, যেগুলো একসময় সবার প্রথম আত্রেয়ী দেখত। না, অন্য কারোর দেখার অধিকার ছিল না ওর আগে। কৃষ্ণেন্দু ছবি এঁকেই আত্রেয়ীকে ফোন করে বলত, ‘এই যে ম্যাডাম, আরেকটা ছবি এঁকেছি, দেখবে নাকি?’

কৃষ্ণেন্দুর জন্মদিনে ওর স্ত্রী ওকে কেক খাইয়ে দিচ্ছে, অথবা ওদের অ্যানিভার্সারির ছবি দেখে আত্রেয়ীর বুকের ভিতরটা চিনচিন করে উঠত। কৃষ্ণেন্দুর পাশে তো ওরই থাকার কথা ছিল। দুজনের কেউ কোনোদিন ভাবেনি কেউ কারোর প্রাক্তন হয়ে যাবে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস। কৃষ্ণেন্দুর স্ত্রীকে ভারি মিষ্টি দেখতে। ওর সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে। অবশ্য আত্রেয়ীর থেকে বেশি কাউকে মানাত না কৃষ্ণেন্দুর পাশে। গোটা কলেজ বলত, ওরা নাকি উত্তম-সুচিত্রা জুটি।

ফেসবুকে কী সুন্দর করে ক্যাপশন লেখে কৃষ্ণেন্দু—'ঠিক এমনই এক রক্তপলাশ আর শিমুলের মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার দিনে আমি পেয়েছিলাম আমার স্বপ্নের রাজকন্যাকে। যে আমার জীবনটা কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছে।'

নীচে ওদের দুজনের হাসি মুখের ছবি। কমেন্টে উপচে পড়া শুভেচ্ছাবার্তা এবং অভিনন্দন। কমেন্ট বক্সের অনেক মুখই আত্রেয়ীর চেনা। ওরা সবাই একই ব্যাচের সহপাঠী ছিল।

কৃষ্ণেন্দু কখনও আবার ক্যাপশন দেয়, 'যাকে ভালোবেসে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া যায়, যাকে ভালোবেসে কাটিয়ে দেওয়া যায় একটা গোটা জীবন, আজ তার সঙ্গে পাহাড়ের কিনারায়।' ক্যাপশনের নীচে কৃষ্ণেন্দু এবং ওর স্ত্রী রঞ্জিনীর ছবি। পাহাড়ের ধারে দুজনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ছবিগুলো দেখলে আত্রেয়ীর ভীষণ কষ্ট হয়। তবুও ওর দেখতে ইচ্ছে করে। মনে মনে বলে ওঠে, ওরা ভালো থাকুক। কৃষ্ণেন্দুও নিশ্চয়ই তাই চায়। আত্রেয়ী ভালো থাকুক এটাই সবসময় চাইত ও। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর চাওয়ায় কিছু এসে গেল না আত্রেয়ীর। ওর ভালো থাকা হল না। আত্রেয়ী চেষ্টা করেছিল কৃষ্ণেন্দুকে ভুলে সায়ন্তনকে ভালোবাসতে। কিন্তু সমস্যাটা হল অন্য জায়গায়, সায়ন্তন আত্রেয়ীর কাছ থেকে একেবারেই ভালোবাসা চায় না। ও আত্রেয়ীর শরীর চায়, আত্রেয়ীর যত্ন, তোষামোদ চায়, আত্রেয়ীকে অপমান করে সুখ পেতে চায়, আত্রেয়ী কাঁদছে এটা দেখে অনন্দ পায়, শুধু ও ভালোবাসছে এটুকুই চায় না সায়ন্তন। ভালোবাসা শব্দটা বোধহয় বড্ড বিরক্তিকর ওর কাছে। আরও একটা জিনিস চায় না সায়ন্তন, আত্রেয়ী হাসছে এটাও সহ্য করতে পারে না ও।

সুনেত্রা হওয়ার পর থেকে মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে সায়ন্তন। মেয়েকে নিজের মতো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। অবশেষে সাফল্যের হাসি

হেসেছে। কিন্তু যবে থেকে ফেসবুকে কৃষ্ণেন্দুর প্রোফাইলটা খুঁজে পেয়েছে তবে থেকে যেন নতুন নেশায় বেঁচে আছে ও। আজ কী পোস্ট করল কৃষ্ণেন্দু? এটা দেখার নেশায় এবাড়ির অনেক অপমান তুচ্ছ হয়ে গেছে ওর কাছে। মাঝে মাঝেই ওর বিভিন্ন এগজিবিশনের ছবি দেয় কৃষ্ণেন্দু। আত্রেয়ী সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এবাড়িতে এত সময় কোথায়? দিনরাত কাজ আর কাজ।

তাড়াতাড়ি করে নিজের কাজকর্ম সেরে দরজা বন্ধ করল আত্রেয়ী। আজ ২২শে জুন, বাংলা তারিখ অনুযায়ী ৭ই আষাঢ়। আজ কৃষ্ণেন্দুর জন্মদিন। এবারে বাংলা আর ইংরাজি ডেট একই পড়েছে। আত্রেয়ী মনে মনে ভাবল ওর প্রোফাইলে গিয়ে দেখতে হবে, কে কে উইশ করেছে। এই দিনটায় প্রতিবার ওরা বৃষ্টির মধ্যেই কফি হাউজে যেত। বর্ষাকালের কলেজ স্ট্রিট। হাঁটুজল উঠে সে এক বিশ্রী অবস্থা। আত্রেয়ী বলত, 'তোমার সঙ্গে পবনদেবের আগের জন্মে মনে হয় ঝামেলঝাটি হয়েছিল, বুঝলে। তোমার জন্মদিনের দিনই কুলোয় করে জল ঢালে কেন?'

কৃষ্ণেন্দু হাসতে হাসতে বলত, 'গোটা শহরটাকে ধুয়ে দেবে বলে। আর তোমার মনটাকে আমার জন্য ভিজিয়ে দেবে বলে।'

আত্রেয়ী লজ্জা পেয়ে বলেছিল, 'আর কত ভেজাবে? চব্বিশঘন্টা তো তোমাকে নিয়েই ভেবে যাই। এবারে বোধহয় বন্যা নামবে আমার মনে।'

বৃষ্টির সকালে মা বলত, 'আজ কোথায় বেরোবি? আজ কলেজ ছুটি হয়ে যাবে যে!'

আত্রেয়ী চুড়িদারের প্যান্ট হাঁটু অবধি গুটিয়ে বলত, 'স্পেশাল ক্লাস আছে। যেতেই হবে।'

একবার তো কৃষ্ণেন্দুর জন্মদিনে কলেজ স্ট্রিটে ঢুকে জল-কাদার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল আত্রেয়ী। হাতের গোলাপগুলো কাদা জলে পড়ে মাখামাখি।

তার মধ্যে থেকেই একটা গোলাপ তুলে বৃষ্টির জলে ধুয়ে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'বৃষ্টিধোয়া একটা গোলাপ তো রইল আমার কাছে। মনখারাপ না করে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ধরে বাড়ি যাও। ভেজা জামা পরে ঠান্ডা লাগবে।'

কৃষ্ণেন্দু বরাবর এরকমই। সবরকম পরিস্থিতিতেই নিজেকে মানিয়ে নিত। কোনো অবস্থাতেই ওর কোনো বিরক্তি দেখেনি আত্রেয়ী। ও মাঝে মাঝে কৃষ্ণেন্দুর গায়ে চিমটি কেটে বলত, 'তুমি কী ধাতু দিয়ে গড়া গো? কিছুতেই তোমার কষ্ট হয় না?'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'যখন আমার বছর পাঁচেক বয়েস তখন আমি প্রথম জানতে পারলাম, আমার সঙ্গে যারা বড় হচ্ছে তারা আমার ভাই-বোন নয়। কারণ আমার আদৌ কোনো বাবা-মা নেই। আমি অনাথ। অনাথ তো কেউ হয় না। আমরা জানি বায়োলজিক্যাল ফাদার বা মাদার নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তারা আমায় অস্বীকার করেছিল, হয়তো তাদের নিজেদের কোনো সমস্যা ছিল আমার পরিচয় দিতে। আমাদের আশ্রমে যিনি থাকতেন, তাঁকে আমরা সকলে বাবা বলতাম। ওনার নাম হরিনারায়ণ চক্রবর্তী। খাঁটি ব্রাহ্মণ। তাই তো আমাদের সবার সারনেম চক্রবর্তী। উনি আর ওনার ওয়াইফ আমাদের গোটা পঞ্চাশেক ছেলে-মেয়েকে নিয়ে একটা অনাথ আশ্রম তৈরি করেছিলেন। কাউকে আস্তাকুঁড় থেকে তুলে এনেছিলেন, কাউকে আবার রেললাইনের ধার থেকে। ওনারা নিঃসন্তান ছিলেন। আমরাই ছিলাম ওনাদের সন্তান। কী অদ্ভুত ভঙ্গিমায় মা আমাদের সকলকে সমানভাবে ভালোবাসতেন, সমানভাবে শাসন করতেন। তারপর উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পরেই আমি অনেকগুলো টিউশনি পড়াতে শুরু করলাম। তখন থেকেই বুঝেছিলাম, আমাকেই আমারটা বুঝে নিতে হবে। আমরা সবাই ছোটখাটো কাজ করে নিজেদের পড়াশোনা চালাতাম। এই যে কলেজের পরে আমি সোজা যাব একটা কোচিংয়ে। এখন ভাবি ওঁরা যদি নিজেদের সুখের কথা

ভাবতেন, তাহলে হয়তো আমি রাস্তায় ভিক্ষা করতাম বা মরেই যেতাম। ওঁরা আমাদের সকলের জন্য যে কষ্ট সহ্য করেছেন, সে তুলনায় আমাদের সমস্যা তো কিছুই নয়। এখন তো আমি মেসে বিন্দাস আছি। টিউশনি করছি, পড়াশোনা করছি। তুমি আছ। সমস্যা আর কী!'

আত্রেয়ী অবাক হয়ে দেখত কৃষ্ণেন্দুকে। অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায় ছেলেটা। কী অপূর্ব ছবি আঁকে, খালি গলায় কী সুন্দর গান গায়। ভগবান যেন ঢেলে সাজিয়েছেন কৃষ্ণেন্দুকে। তেমনই তুখোড় পড়াশোনায়। কলেজের প্রফেসররা ওর নামে ঢোক গেলেন। অমন ছেলে নাকি কেমিস্ট্রির ব্যাচে এই প্রথম। হিস্ট্রি অনার্সের আত্রেয়ীর সঙ্গে কেমিস্ট্রির ছেলের কেমিস্ট্রি যে কীভাবে জমেছিল সেটা অবশ্য ওদের দুজনেরই অজানা ছিল। ওই আর পাঁচটা প্রেমের মতোই, কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে হয়নি। ভালোলাগা থেকেই সম্পর্কটা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আত্রেয়ী জানত কৃষ্ণেন্দু ওকে ভীষণ রকমের রেসপেক্ট করে। শুধু ভালোবাসা নয়, সম্মানও পেত ও কৃষ্ণেন্দুর কাছ থেকে। তাই হয়তো নিজেকে উজাড় করে ভালোবেসেছিল। গোটা কলেজ জানত ওদের সম্পর্কের কথা। আত্রেয়ী বলত, 'আমার লজ্জা করে, সবাই জানে বলে।'

কৃষ্ণেন্দু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলত, 'জানো আত্রেয়ী, আমি সবথেকে বেশি ভালোবাসি আকাশকে। দেখো আকাশ কিন্তু খারাপ-ভালো বিচার করে না। সে সবার মাথায় ছাতা ধরে আছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ সবটা কেমন উন্মুক্ত। কোনো লুকিয়ে রাখার বাসনা নেই। জানুক না সবাই আমাদের সম্পর্কের কথা। আমরা তো ভালোবেসেছি, অন্যায় তো করিনি।'

কৃষ্ণেন্দুর সমস্ত নেশাগুলো কীভাবে যেন আত্রেয়ীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল সে টেরটিও পায়নি। এই যেমন, অবসরে আকাশ দেখা, বেলফুল ভালোবাসা ইত্যাদি। কৃষ্ণেন্দুর পছন্দের ফুল ছিল বেল। ও বলত, 'জানো

আত্রেয়ী বেলফুল নিজেকে বিশাল দামি, ক্ষত্রিয় ফুল বলে দাবি করে না। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে ফোটে। আড়ম্বর লাগে না। তবুও এমন তার সুবাস যে নিজেকে কিছুতেই লুকিয়ে রাখতে পারে না। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকেরই বেলফুলের মতো হওয়া উচিত, আড়ম্বরহীন, অহংকারহীন কিন্তু অস্তিত্বহীন নয়। সবাই খুঁজে নেবে তোমায়।'

মোহিত হয়ে শুনত আত্রেয়ী।

নিজের জন্মদিনে ফেসবুকে একটা সুন্দর ছবি পোস্ট করেছে কেমিস্ট্রির প্রফেসর কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী। ওর স্ত্রী ওকে কেক খাইয়ে দিচ্ছে। সামনে থালায় সাজানো প্রচুর খাবার। বাটিতে পায়েস।

ক্যাপশনে লেখা—'জন্মদিনে আগে কলেজ স্ট্রিট যেতাম। কফি হাউজে ঢুঁ দিতাম। এখন বাড়িতেই কাটাই। দিনটাকে বিশেষ করে তোলে আমার একমাত্র ঠাঁই রঞ্জিনী।'

প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী কমেন্টের মাধ্যমে ওদের প্রিয় স্যারকে শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়ে দিয়েছে। আত্রেয়ীর খুব ইচ্ছে করে একটা ছোট্ট কমেন্ট করতে, ঠিক আগে যেমনটা বলত, 'শুভ জন্মদিন আমার কৃষ্ণেন্দু।'

কিন্তু না, আত্রেয়ী লিখতে পারে না। সব অধিকার হারিয়ে ফেলেছে ও। কৃষ্ণেন্দুর আত্রেয়ী মারা গেছে বহুবছর আগে।

বহুবার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে গিয়েও পাঠানো হয়নি। লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেছে।

আত্রেয়ী নিজের মনেই বলল, শুভ জন্মদিন আমার কৃষ্ণেন্দু। ভালো থেকো তোমরা।

দশ বছর ধরে এই ফেসবুক প্রোফাইলটা ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সায়ন্তন, সুনেত্রা, সায়ন্তনের বাবা-মা সকলের অত্যাচারে ও হয়তো এতদিন পাগল

হয়ে যেত। ভুলে যেতে ওর নাম আত্রেয়ী। কিন্তু শুধু কৃষ্ণেন্দুকে দেখবে বলেই যেন ওর বেঁচে থাকা।

নীচ থেকে সুনেত্রার গলা পেল আত্রেয়ী। অশান্তি চায় না ও। আর ভালো লাগে না। তাই দরজা খুলে তাড়াতাড়ি ছুটল নীচে। মেয়ে টিউশন থেকে এসে ফ্রুট জুস খায়। সেটা বানাতে ভুলে গেছে। ঝটপট রান্নাঘরে গিয়ে মুসম্বি, চিনি আর বরফ নিয়ে জুসারের সামনে দাঁড়াল।

সুনেত্রা পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা, তুমি এক কাজ করো। তুমি বসে বসে কবিতা লেখো। শুনেছি এত ভুলো মন নাকি কবিদের হয়। বাবাকে বলতে হবে বিষয়টা।'

আত্রেয়ী জানে সুনেত্রা বাবাকে নালিশ করলেই সায়ন্তন ওর হাতটা মুচকে ধরে বলবে, 'এত ভুল হয় কী করে!'

আবার সুনেত্রাকে বারণ করলে ও বেশি করে নালিশ করবে বাবাকে। তাই বোবার শত্রু নেই এই বিশ্বাসের ওপরে ভর করেই চুপ করে জুসের গ্লাসটা মেয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আর বরফ দেব কিনা দেখ।'

মেয়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'তুমি আসলে কিছুই ভালোমতো পারো না।'

আত্রেয়ী অন্য কাজে মনোনিবেশ করল। সুনেত্রা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটাকে মা হিসাবে শাসন করা হয়তো দরকার ছিল। কিন্তু আত্রেয়ী জানে যে এ বাড়িতে ও সেটা পারবে না। হিতে বিপরীত হবে। তাই নির্লিপ্ত হয়ে গেছে। বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ কৃষ্ণেন্দুর ফেসবুক প্রোফাইল। আর ওই বেলফুলের গাছগুলো।

বাবা, মায়ের বয়েস হয়েছে। কর্তব্য করতে মাঝেমাঝে যায় বাপের বাড়ি। কিন্তু আজও অভিমানটা জমাট বেঁধে আছে ওই বাড়ির উঠোনের পূর্ব কোণের শিউলি গাছের তলায়। যেখানে কৃষ্ণেন্দু ঠায় একঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিল।

যাকে ভিতরে অবধি ঢুকতে দেয়নি ওর বাবা। গোটা উঠোনে সেদিন বৈশাখের তীব্র রোদ। সদ্য গ্র্যাজুয়েশন করেছে আত্রেয়ী। কৃষ্ণেন্দু ভর্তি হয়েছে এমএসসি-তে। বাড়িতে আত্রেয়ীর বিয়ের তৎপরতা। মাসি-পিসি থেকে প্রতিবেশীদের দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম কেড়েছে আত্রেয়ীর বিয়ের ভাবনা। তাই সবাই পাত্র খুঁজতে ব্যস্ত। বাবা সবাইকে পারমিশন দিয়েছে ভালো পাত্র খুঁজে আনার। মা বলেছে, 'আর ইউনিভার্সিটি গিয়ে কাজ নেই। রান্না-বান্না একটু শেখ, রূপচর্চা কর।' আত্রেয়ী অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে বাড়িতে বোঝাতে। শেষে কৃষ্ণেন্দুকে গিয়ে বলেছিল বিষয়টা। কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'কিন্তু আমার এস্টাব্লিশড হতে তো কয়েক বছর দেরি আছে আত্রেয়ী। এটুকু সময় অপেক্ষা করতে হবে তোমায়। তুমি চাইলে তোমার বাবার কাছ থেকে আমি সেই সময়টুকু চেয়ে আনতে পারি।'

কোনো উপায় না দেখে ও কৃষ্ণেন্দুকে নিয়ে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে। তখন দুপুর বারোটা। ছুটির দিন বলে সবকিছুই একটু দেরিতে শুরু হয়েছিল। বাবা বাজার থেকে ফিরে আয়েশ করে খবরের কাগজের খুঁটিনাটি দ্বিতীয়বার পড়তে শুরু করেছিল। মা রান্নাঘরে খাসির মাংসের সুবাস তুলেছিল।

কৃষ্ণেন্দু বাড়িতে ঢুকতেই আত্রেয়ীর বাবা বলেছিল, 'উঠোনেই দাঁড়াও। আগে কয়েকটা প্রশ্ন করি। তুমি আমার মেয়েকে ভালোবাসো? তোমার বাড়ি কোথায়? বাবা কী করেন?'

কৃষ্ণেন্দু মাথা নীচু করে নয় মাথা উঁচু করেই উত্তর দিয়েছিল, 'আমি একটা অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছি। ওঁরাই নিজেদের পরিচয়ে আমায় মানুষ করেছেন।'

আত্রেয়ী বলেছিল, 'বাবা, ও আমাদের কলেজের টপার। খুব ভালো ছেলে।'

বাবা ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গাত্মক হাসি চেপে বলেছিল, 'ও, তার মানে তুমি নিজের বাপের নাম জানো না। ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢোকার আগে এটুকু জেনে আসা দরকার ছিল।'

মাথায় গনগনে বৈশাখের রোদ। তাই হয়তো একটু ছায়ার সন্ধানে শিউলি গাছের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। ও বলেছিল, 'আমার মনে হয় আমি প্রতিষ্ঠিত হব। আর আপনার মেয়েকে ভালোই রাখব। তাই আপনি এটুকু ভরসা করে দেখতে পারেন। আর অনাথ হওয়াটা দোষের নয়। অন্তত এক্ষেত্রে আমার কোনো দোষ নেই।'

আত্রেয়ীর বাবা তীক্ষ্ণ স্বরে বলেছিল, 'না, তোমার কোনো দোষ নেই। দোষ আমার মেয়ের। যে নিজের বংশের মুখে চুনকালি মাখাবে বলে একটা নামহীন ছেলেকে বিয়ে করতে চাইছে। যার না আছে জন্মতারিখ না আছে বংশ পরিচয়। দোষ তো তোমার নেই।'

কৃষ্ণেন্দুর মুখটা রোদের তাপে লাল হয়ে গেছিল, নাকি অপমানে, সেটা বুঝতে পারেনি আত্রেয়ী। ও শুধু চিৎকার করে বলেছিল, 'তুমি চলে যাও কৃষ্ণেন্দু। আর এসো না কখনও। এখানে বংশপরিচয়ওয়ালা ভদ্রলোক বাস করে।'

কৃষ্ণেন্দু তবুও বলেছিল, 'আঙ্কেল প্লিস। আত্রেয়ী আর আমি দুজনে দুজনকে ভালোবাসি। ওকে ভালো থাকতে দিন প্লিস।'

বাবা চিৎকার করে বলেছিল, 'তোর বন্ধুকে কি গলা ধাক্কা দিয়ে বের করতে হবে?'

মা এসে বলেছিল, 'তুমি চলে যাও।'

তবুও বৃথা একটু অপেক্ষা করে ফিরে এসেছিল কৃষ্ণেন্দু।

ওই শিউলি তলায় এখনও জমে আছে অনেকটা অভিমান আর অপমানের জমাট অন্ধকার। তাই ওটাকে আর কোনোদিন নিজের বাড়ি ভাবতে পারিনি

আত্রেয়ী।

কৃষ্ণেন্দু মেসে থাকত, ওর কোনো বাড়ি ঘর ছিল না। তাই ও যে এই মুহূর্তে আত্রেয়ীকে বিয়ে করতে পারবে না সেটা ওরা দুজনেই বুঝেছিল। তাই কেউ আর দেখা করেনি কারোর সঙ্গে। ওই বৈশাখের দুপুরে শিউলি গাছের নীচেই কৃষ্ণেন্দুকে শেষ দেখেছিল আত্রেয়ী।

ইচ্ছে করেই আর ফোন করেনি, যোগাযোগ করেনি। কৃষ্ণেন্দুও হয়তো এই তীব্র অপমানের পরে বুঝেছিল, এই সম্পর্ক কোনোদিন সম্ভব নয়। আত্রেয়ীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, বড় ব্যবসাদার, বনেদি পরিবারের সন্তান সায়ন্তনের সঙ্গে। ঠিক সেদিন থেকে বাবা আর ওই বাড়িটা ওর কাছে বহুদূরের দ্বীপ হয়ে গিয়েছিল। যার চারপাশটা শুধুই অহংকারে পরিপূর্ণ। তবুও নিজের কর্তব্যটুকু করতে যায়। বাবা আজও ছানি পড়া চোখে ওর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। হয়তো ওর মুখে খুঁজতে থাকে খুশি-অখুশির সূক্ষ্ম রেখাগুলো। কারণ বাবা আজও জানে না আত্রেয়ী বিবাহিত জীবনে সুখী না সুখী নয়। সুনেত্রাও ছোট থেকেই বাবার মতো পাক্কা অভিনেত্রী। দাদুর বাড়ি গিয়ে মা'কে বেশ নরম গলায় কথা বলে। কে বলবে, এ বাড়িতে মাকে সে তিন নম্বর পরিচারিকার আসনে বসিয়েছে!

আত্রেয়ী মনে মনে হাসে। বাবার মনের এই দ্বন্দ্বটুকুই কৃষ্ণেন্দুকে অপমানের শাস্তি হয়ে থাকুক।

বিকেলে ছাদে উঠে আবারও প্রোফাইলটি খুলল আত্রেয়ী। কী সুন্দর একটা ছবি এঁকেছে কৃষ্ণেন্দু। সারা রাস্তা জুড়ে বিছিয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া। দুটো ছেলে-মেয়ে হাত ধরে হেঁটে চলেছে। খুব জানতে ইচ্ছে করে, ওকে কি আদৌ মনে আছে কৃষ্ণেন্দুর? নাকি স্ত্রীকে পেয়ে আত্রেয়ীর অস্তিত্বটাই ভুলে গেছে ও? আদৌ কি মনের এককোণে অবহেলায় হলেও পড়ে আছে ওর স্মৃতি? নাকি সব ধুয়েমুছে ফেলেছে ওর স্ত্রী উজাড় করা ভালোবাসা দিয়ে? কত কত

প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে আত্রেয়ীর। কিন্তু সেই দুপুরে বাড়ির উঠোনে একগ্লাস জল অবধি খাওয়াতে পারেনি ও ছেলেটাকে, এটা মনে করেই 'অ্যাড ফ্রেন্ড' বাটম থেকে হাতটা সরিয়ে নেয় সংকোচে।

রোজই নতুন কিছু পোস্ট দেখার আশায় কৃষ্ণেন্দুর প্রোফাইলটা খোলে আত্রেয়ী। কিন্তু প্রায় দিন পনেরো হল আর কোনো পোস্ট নেই কৃষ্ণেন্দুর। অবাক লাগছে ওর। কৃষ্ণেন্দু হয়তো ব্যস্ত কলেজ আর এগজিবিশন নিয়ে। তাই ফেসবুকে পোস্ট করার সময় নেই ওর। অথবা স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে গেছে। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু জানেই না, এদিকে একজনের দিনরাত্রি কাটছে ওর পোস্টের অপেক্ষায়।

অপেক্ষার সময়টা ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে আসছে। প্রায় পঁচিশ দিন হয়ে গেছে কৃষ্ণেন্দুর কোনো পোস্ট নেই। আত্রেয়ী আকাশ আর বেলফুলের গাছগুলোকে সঙ্গী করে কাটিয়ে দিচ্ছে অবসরের অল্প সময়টুকু। প্রায় মাসখানেক কোনো পোস্ট করেনি কৃষ্ণেন্দু। আর সহ্য করতে না পেরেই আত্রেয়ী মেসেঞ্জারে লিখে পাঠাল, 'হাই। চিনতে পারছ?'

কোনো রেসপন্স নেই। প্রায় দিন চারেক বারংবার চেক করেই যাচ্ছিল মেসেজটা। না, কোনো উত্তর নেই। ওদিক থেকে সিনও হয়নি। প্রায় সপ্তাহখানেক পরে ওদিক থেকে উত্তর এল, 'আত্রেয়ী, কেমন আছ?'

বুকের ভিতরটা ধুকপুক করে উঠল আত্রেয়ীর। কৃষ্ণেন্দু উত্তর দিয়েছে ওকে।

ও লিখল, 'তুমি এতদিন পোস্ট করোনি কেন? প্রায় একমাস কোনো পোস্ট করছ না?'

কৃষ্ণেন্দু লিখল, 'আত্রেয়ী সব বলব তোমায়। তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলা যায়! একবার আসতে পারবে? দেখা করে সব বলব।'

এই মধ্যবয়েসে এসেও ঠিক কলেজের মতোই বুকটা কেঁপে উঠল কৃষ্ণেন্দুর একটা মেসেজে। এতদিন ধরে ও ভেবেছিল, নিজের অনুভূতির সব সূক্ষ্ম তারগুলো বিকল করে ফেলেছে দায়িত্ব নিয়ে। কিন্তু আজ বুঝল, রাতের সব তারাই থেকে যায় দিনের গভীরে। যে অনুভূতি, উপলব্ধিদের ও এতদিন বাধ্য করে রেখেছিল, তারাই আচমকা বড্ড চঞ্চল, অবাধ্য হয়ে উঠল।

বাপের বাড়ি যাচ্ছি-র নাম করে বেরিয়ে পড়ল আত্রেয়ী। আজ কি সাজগোজ একটু বেশি করে ফেলেছে ও?

সুনেত্রা বারবার আড়চোখে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল। কৃষ্ণেন্দুর পছন্দের আকাশনীল শাড়ি পরা বন্ধ করে দিয়েছিল বিয়ের পর থেকেই। সায়ন্তনদের বাড়িতে দুটো আকাশনীল শাড়ি পেয়েছিল ও উপহারে। কিন্তু পরেনি কখনও। আজ আলমারি ঘেঁটে তারই একটা বের করে পরে নিল। একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছে না আত্রেয়ী, কোনো কথা না বলে এভাবে ডেকে কেন পাঠাল কৃষ্ণেন্দু।

কৃষ্ণেন্দুর লিখে দেওয়া অ্যাড্রেসে পৌঁছে দেখল, ও একটা অনাথ আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্রমের নাম 'আত্রেয়ী সেবা নিকেতন'।

ওর নামের আশ্রম! গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণেন্দুর স্ত্রী। ছবিতে বারবার দেখার ফলে চিনতে অসুবিধা হল না আত্রেয়ীর। কিন্তু ছবির থেকে বড্ড শুকনো লাগছে যেন। রঞ্জিনী এগিয়ে এসে বলল, 'আপনিই আত্রেয়ী, তাই না? আসুন প্লিস।'

আত্রেয়ী একটু চমকে গিয়েই বলল, 'কৃষ্ণেন্দু আসেনি? ও যে আজ দেখা করতে চেয়েছিল।'

রঞ্জিনী বলল, 'না, ওর প্রোফাইলের মেসেজটার উত্তর আমি দিয়েছিলাম।'

আত্রেয়ী বেশ বুঝতে পারছে স্ত্রীকে দিয়ে প্রাক্তনকে ওই একইভাবে অপমান করাবে কৃষ্ণেন্দু। ঠিক যেভাবে কৃষ্ণেন্দু অপমানিত হয়েছিল ওদের

বাড়িতে গিয়ে। পা দুটো কাঁপছে আত্রেয়ীর। এমনিতেই বাইরে সেভাবে বেরোনোর অভ্যেস নেই দীর্ঘদিন। ওই সায়ন্তনের সঙ্গে টুকটাক নিমন্ত্রণ বাড়ি ছাড়া। অপরিচিত পরিবেশে আজকাল অনভ্যাসে কেমন একটা আনইজি ফিল করে আত্রেয়ী। তারওপর বাড়ি থেকে একটা মন নিয়ে বেরিয়েছিল, এখানে এসে দেখল কৃষ্ণেন্দু নেই, ওর স্ত্রী। এমনকী ওর মেসেজের উত্তর অবধি দিয়েছে রঞ্জিনী। রীতিমতো ভয় করতে শুরু করল ওর। হয়তো এখুনি রঞ্জিনী ঘুরে দাঁড়িয়ে বলবে, লজ্জা করে না অন্যের স্ত্রী হয়ে আমার স্বামীকে মেসেজ করেন? কী উত্তর দেবে আত্রেয়ী!

রঞ্জিনী একটা অফিস মতো রুমে ওকে বসিয়ে বলল, 'আপনি বসুন, আমি শরবত আনতে বলছি।'

গরম রয়েছে বেশ। নার্ভাস লাগছে আত্রেয়ীর। রঞ্জিনীকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা অসম্ভব স্মার্ট। এর সামনে আত্রেয়ী ঠিক করে কথাই বলে উঠতে পারবে না হয়তো। কৃষ্ণেন্দুকে আরেকবার খোঁজার চেষ্টা করল আত্রেয়ী। তার আগেই শরবতের গ্লাস এনে রাখল একটি মেয়ে।

রঞ্জিনী বলল, 'খেয়ে নিন।'

আত্রেয়ী এতক্ষণ বুঝতে পারেনি ওর এতটা পিপাসা পেয়েছিল, অথবা শরবতের গ্লাসের পিছনে একটু যেন আড়াল খুঁজল ও। শরবত খাওয়া শেষ করে টেবিলে গ্লাসটা নামাতেই রঞ্জিনী বলল, 'আপনারা তো কলেজ ফ্রেন্ড ছিলেন তাই না? ফ্রেন্ড বললে ভুল হবে, আপনারা তো বিয়ে করবেন সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন। তাই না?'

আত্রেয়ী কিছু বলার আগেই রঞ্জিনী বলল, 'সেই আপনি মেসেজ করলেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু আর মাসখানেক আগে যদি করতেন। তাহলে আপনার সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর দেখা হত।'

আত্রেয়ী কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে বলল, 'কেন আজ দেখা হবে না?'

রঞ্জিনী দেওয়ালের এক কোণে ঈশারায় তাকাতে বলল, আত্রেয়ী দেখল কৃষ্ণেন্দুর একটা বড় সাইজের ছবিতে মালা দেওয়া আছে। অদ্ভুত গলায় আত্রেয়ী প্রশ্ন করল, 'মালা কেন ওর গলায়? ও কোথায়?'

রঞ্জিনী বলল, 'মাসখানেক আগে বাইক দুর্ঘটনায় ব্রেন হেমারেজ হয়ে মারা গেছে কৃষ্ণেন্দু।'

আত্রেয়ীর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে। রঞ্জিনী বলল, 'আমরা দুজনেই একই কলেজের প্রফেসর। আমার সঙ্গেও ওর প্রেম করেই বিয়ে। না, না আপনাদের মতো অতটা সুন্দর ছিল না আমাদের প্রেমটা। বলতে পারেন দুজনেরই একটা অবলম্বন দরকার ছিল ওই বয়েসে এসে, তাই আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে নিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন, কৃষ্ণেন্দুকে ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারবে না। ভালোবাসা, সম্মান, আদরে ভরিয়ে দিয়েছিল ও আমাকে। তাই আমিও নিরুপায় হয়েই ওকে উজাড় করে ভালোবেসেছিলাম। আমরা ভীষণ হ্যাপি ছিলাম জানেন। আমার শারীরিক সমস্যার কারণে আমাদের কোনো বাচ্চা হয়নি। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর সেই নিয়ে কোনোদিন কোনো আক্ষেপ ছিল না। পাড়ার লোকজন বলত, 'বাঁজা বউয়ের আবার জন্মদিন করছে ঘটা করে!' অথবা 'বাচ্চার জন্মদিন করার সময়ে নিজেদের বিবাহবার্ষিকী করছে!' এসব কথাতে আমার মনখারাপ হলেও ও কোনোদিন পাত্তা দিত না। ওর সবটা জুড়ে আমি ছিলাম। সরি ভুল বললাম, অন্তত ৩০% আমি ভরাট করতে পারিনি, ওখানে আপনি ছিলেন। কৃষ্ণেন্দু বলত, 'জানো রঞ্জিনী, আত্রেয়ী আমাকে ভীষণ ভালোবাসত, তাই আর বিয়ের জন্য বিব্রত করেনি।' আপনাদের সব গল্প আমি জানি, সবটুকু বলেছে ও। আমি আপনাকে রেসপেক্ট করি। কৃষ্ণেন্দু আর আমার সম্পর্কটা ছিল স্বচ্ছ জলের মতো। কোনো রাখঢাক নেই সেখানে। কোনো পজেসিভনেস নেই। শুধু

রয়েছে অফুরন্ত বিশ্বাস, সম্মান আর ভালোবাসা। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর মতো মানুষরা বেশিদিন পৃথিবীর মায়ায় নিজেদের জড়িয়ে রাখতে পারে না বুঝলেন। স্বর্গের মায়াকানন ওদের ডাকে।'

আত্রেয়ী দেখল রঞ্জিনী কথা বলতে বলতেই কাঁদছে। ফুঁপিয়ে উঠছে ওর ঠোঁট দুটো। তবুও কৃষ্ণেন্দুর জন্য ওর কান্নাভেজা দু'চোখে অনেকটা গর্ব আর সম্মান রয়েছে। আত্রেয়ী এখনও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কৃষ্ণেন্দু নেই! ওর সঙ্গে আর দেখা হল না আত্রেয়ীর! সেই শিউলিতলার অপমানটুকু নিয়েই চলে গেল কৃষ্ণেন্দু!

আত্রেয়ী প্রায় কঁকিয়ে বলে উঠল, 'আমি ওর প্রোফাইলে আপনাদের ছবিগুলো দেখেই বেঁচে আছি প্রায় বছর দশেক। এখন আমার অবসর কাটবে কীভাবে রঞ্জিনী? আমি তো সবসময় চেয়েছিলাম, আপনারা ভালো থাকুন। তাহলে কেন এমন হল?'

রঞ্জিনী বলল, 'কৃষ্ণেন্দু বলত, "জানো রঞ্জিনী এই গোটা বিশ্বে আমি অনাথ। আমার ভালো-খারাপ চাওয়ার হয়তো কেউ নেই। তবে আমি বিশ্বাস করি একজন আমার ভালো চায়।" আপনার প্রোফাইলটি আমায় দেখিয়ে বলেছিল, "এই যে কোনো পোস্ট নেই, প্রায় ইনঅ্যাক্টিভ প্রোফাইলটা আত্রেয়ী কেন খুলে রেখেছে জানো? শুধু আমায় খুঁজবে বলে।" '

আমি বলেছিলাম, 'তাহলে ওকে একটা মেসেজ করো।'

বলত, 'না। ও অন্য সংসারে অনেক কষ্টে মন বসিয়ে নিয়েছে। আর ওকে বিরক্ত করে লাভ নেই।'

আসলে কৃষ্ণেন্দুর ফেসবুক প্রোফাইলটি আমিই খুলে দিয়েছিলাম। তাই পাসওয়ার্ড আমার কাছেই ছিল। অপনার মেসেজ পেয়ে খুব ইচ্ছে করছিল, গল্পে চেনা মানুষটাকে একবার অন্তত সামনে দেখি। কৃষ্ণেন্দুর চলে যাওয়ার খবরটা ভাগ করে কষ্টটা একটু কমিয়ে নিই অন্তত। হয়তো আপনি আমাকে

স্বার্থপর ভাববেন, কিন্তু কাকে বলব এই কষ্টের কথা। এমন একটা মানুষকে আমরা দুজনেই পেয়েছিলাম আত্রেয়ী, কিন্তু কেউই ধরে রাখতে পারলাম না। আমাদের বাড়ির গেটে বড় করে পাথরের ফলকে লেখা আছে রঞ্জিনী ভিলা। কৃষ্ণেন্দু বলত, 'এই বাড়িটা আমার তরফ থেকে তোমায় উপহার দিলাম রঞ্জিনী। এখানে প্লিস আমার নাম ঢোকাবে না।' আপনি বোধহয় জানতেন চক্রবর্তী দম্পতির কথা, যাঁদের কাছে ও মানুষ হয়েছিল?'

আত্রেয়ী ঘাড় নেড়ে বলল, 'জানতাম। ওদের মা, বাবা বলত কৃষ্ণেন্দু।'

রঞ্জিনী বলল, 'হ্যাঁ ওঁরা আর নেই। মারা গেছেন। এটাই ওঁদের সেই আশ্রম। মারা যাওয়ার আগে ওঁরা কৃষ্ণেন্দুকে সব দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন এই অনাথ আশ্রমের। এমনকি আশ্রমের ট্রাস্টি বোর্ডের নমিনি অবধি কৃষ্ণেন্দু আর আমাকে করে গেছেন ওঁরা। কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, ''রঞ্জিনী, নাও কত সন্তান নেবে নাও। একটা সন্তান হয়নি বলে দুঃখ করছিলে!'' '

'আত্রেয়ী, আপনাকে একটা বিশেষ প্রয়োজনে ডেকেছি আমি। প্লিস না বলবেন না।'

আত্রেয়ী বিহ্বল চোখে তাকিয়ে বলল, 'বলুন।'

রঞ্জিনী বলল, 'এই আশ্রমের দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। আপনার নামেই কৃষ্ণেন্দু আশ্রমের নামকরণ করেছিল, দেখতেই তো পাচ্ছেন। ও তো আর নেই। আমার একার পক্ষে কলেজ সামলে এত কিছু করা সম্ভব হবে না।'

আত্রেয়ী নরম গলায় বলল, 'আমি যদি এই আশ্রমের দায়িত্ব নিই, তাহলে কি আমি এখানে থাকার জন্য একটা ঘর পাব? আর খাওয়া-দাওয়াও পাব?'

রঞ্জিনী বলল, 'হ্যাঁ, সে তো পাবেনই। কিন্তু আপনি আপনার সংসার ছেড়ে হয়তো সারাদিন সময় দিতে পারবেন না, তাই...'

রঞ্জিনীর কথা শেষ হওয়ার আগেই আত্রেয়ী বলল, 'পারব। ও সংসারে আমার আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। আমি এখানে চলে আসতে পারি?'

রঞ্জিনী কাঁপা ঠোঁটে, কান্না ভেজা গালে আত্রেয়ীর হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলল, 'সত্যি আপনি আসবেন? কৃষ্ণেন্দুর প্রিয় রং আকাশনীল। আপনাকে এই রঙের শাড়িতে বড্ড মিষ্টি লাগছে। ফাঁকিবাজি করে আগে চলে গেল, তাই আপনার সঙ্গে আর ওর দেখা হল না। জানেন, এই ক'দিন শুধু কেঁদেছি। তারপর আচমকাই আপনার মেসেজের ওই একটা হাই আমাকে সোজা হতে সাহায্য করল। আমি ভাবলাম, এতগুলো বছর তো আমি মানুষটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে পেলাম। নিংড়ে নিলাম সব ভালোবাসাটুকু। হাত ধরে চললাম অনেকটা পথ। কিন্তু আপনি কী পেলেন! একজনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে অপরিচিত একজনের সংসারে সারাজীবন অভিনয় করে গেলেন। হয়তো ভালোবাসলেন তাকেও কিছুটা, কিন্তু কৃষ্ণেন্দুকে তো পেলেন না। তাই নিজেকে বড্ড লাকি মনে হল। আর তখনই মনে হল, কৃষ্ণেন্দু আমাকে অনেকগুলো দায়িত্ব দিয়ে গেছে, সেগুলো করতে হবে। আত্রেয়ী সেবাশ্রমের দায়িত্ব আপনার কাঁধে তুলে দিতে হবে। কৃষ্ণেন্দুর আঁকার স্টুডিওটা দিয়ে দিতে হবে ওরই এক প্রিয় ছাত্র সপ্তর্ষিকে। রঞ্জিনী ভিলাকে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। তাই সোজা হয়ে দাঁড়ালাম সব শোক ভুলে। আপনার ওই একটা মেসেজ আমার বড্ড উপকার করল আত্রেয়ী।'

আত্রেয়ীর আজ আর কিছুই বলার নেই। কৃষ্ণেন্দু ওকে মনে রেখে, ওর ভালোবাসাকে এতটা সম্মান দিয়ে ওর নামে আশ্রমের নাম করে রেখে গেছে দেখার পর থেকেই বাকরুদ্ধ হয়ে বসে আছে ও। রক্তক্ষরণ হয়েই চলেছে বুকের মধ্যে। কৃষ্ণেন্দু বলত, 'আত্রেয়ী, ভালোবাসার সুখটুকু নেবে আর বিচ্ছেদের যন্ত্রণাটুকু নেবে না, বললে তো চলে না। ভালোবাসা তো সবটুকু নিয়েই।'

সায়ন্তনকে আত্রেয়ী শুধু একটাই কথা বলল, ‘আমি এ বাড়িতে আর থাকব না। একটা কাজ পেয়েছি। ওখানেই থাকব।’

সায়ন্তন অবাক হয়ে বলল, ‘তোমার মতো অকর্মণ্যকে কাজ দেবে কে? এত বাজে বকো কেন?’

সুনেত্রা হেসে বলেছিল, ‘ডোন্ট ওরি ড্যাড। মা কোনো বাড়িতে রান্নার কাজ পেয়েছে। তিনদিন করতে দাও। ফোর্থ ডে’তে তারাই তাড়িয়ে দেবে।’

সায়ন্তন আর সুনেত্রার হাসির মধ্যেই নিজের ছোট্ট ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়েছিল ও। ওদের অবাক দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সম্মানের সঙ্গে এই বাড়ি ছাড়ল আত্রেয়ী। মনে মনে বলল, কৃষ্ণেন্দু এতদিনে নিজেকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে। তুমি আমাকে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে শিখিয়ে গেলে। বেলফুলের গাছগুলো একটা ভ্যান রিক্সায় তুলে নিয়ে এল আশ্রমে।

রঞ্জিনী হেসে বলল, ‘বেলফুল? তুমি তো দেখছি কৃষ্ণেন্দুর পছন্দেই নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলে এত বছর। মৃত মানুষকে হিংসে করতে নেই, তবুও আমার হিংসে হচ্ছে কৃষ্ণেন্দুকে। একটা মানুষকে সবাই কেন এত ভালোবাসে কে জানে!’

রঞ্জিনীর চোখের জল সঞ্চারিত হল আত্রেয়ীর চোখেও। কৃষ্ণেন্দু ছবির ভিতর থেকে হাসছে।



সে এসেছিল অবশেষে

'আহা দেবসেনা, এসব পাগলামি বাদ দাও তো। ওই অপরাধীর না আছে ছাড়া পাওয়ার ইচ্ছে, না আছে বাঁচার আবেগ। দিনরাত বসে বসে একটা খাতায় আঁকিবুকি করে যাচ্ছে। উনি নাকি উপন্যাস লিখছেন। সে উপন্যাস একেবারে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পেয়ে যাবে যেন। তুমি কয়েদিদের নিয়ে রিসার্চ পেপার রেডি করতে চাও খুব ভালো, তুমি মহিমের মেয়ে, সবরকম হেল্প আমি করব। মহিম ফোন করে বলল, দেবসেনা যাচ্ছে ওকে যেন হেল্প করি। কয়েদিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিলাম। কিন্তু পাঁচজন কয়েদির সঙ্গে তোমায় আমি কথা বলার সুযোগটুকুও দিতে পারব না দেবসেনা। এই জনা পাঁচেক কয়েদি গত তিন-চার বছরে কারোর সঙ্গে কো-অপারেট অবধি করেনি। এদের আত্মীয়রা উকিল নিয়ে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে, এরা মুখ দিয়ে টুঁ শব্দ বের করেনি। তাই এদের মধ্যে এখনও একটা করে ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল বাস করছে। তুমি আমার কাছের বন্ধু মহিমের মেয়ে। তোমার কোনো বিপদ হোক আমি চাইব না।'

দেবসেনা আদুরে গলায় বলল, 'কিন্তু কাকু, আমি অর্জুন রায়ের কেস হিস্ট্রি পড়েছি। ইনফ্যাক্ট যে মিডিয়ায় যতটুকু খবর বেরিয়েছিল, সব পড়েছি। থানায় জমা পড়া ওর বয়ান অবধি আমি পড়েছি। তারপরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি অর্জুন রায়ের ওপরে গবেষণা করব। প্লিস কাকু, হেল্প মি। কেসটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং।'

একটু যেন অন্যমনস্ক হলেন জেল সুপার দেবদুলাল মিত্র। কেসটা যে ইন্টারেস্টিং সেটা দেবদুলাল নিজেও জানেন। প্রথম যেদিন অর্জুনকে দেখেছিলেন, সেদিন চমকে উঠেছিলেন তিনি। নিরীহ দুটো কবি কবি চোখ, পরনে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি, ফেডেড জিন্স, চুলগুলো একটু উস্কোখুস্কো। তর্জনীতে একটা জায়গায় কড়া পড়ে গেছে। ওকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'তুমি খুন করার চেষ্টা করেছিলে ইন্দ্রাণী নামের মেয়েটাকে?'

অর্জুন বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, 'আমি আমার ভালোবাসাকে মরতে দেখলাম, বিশ্বাসকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখলাম, মানুষ খুন কি তার থেকেও বেশি অপরাধ?' তারপরেই নিজের এলোমেলো মাথার চুলগুলো খামচে ধরে বলেছিল, 'ইন্দ্রাণী বেঁচে গেল আমার হাত থেকে। ওকে মেরে ফেলা দরকার ছিল। ভীষণ দরকার ছিল। আমাকে একঘণ্টা সময় দিন আমি ওকে নিজের হাতে শেষ করে আপনাদের কাছে এসে সারেন্ডার করছি।'

চমকে গিয়েছিল এসআই গৌরব মিত্র। দেবদুলালকে বলেছিল, 'স্যার, এ তো নিজেই স্বীকার করেছে যে খুন করতে চায়। একবার সুযোগ পেলেই প্রেমিকাকে মেরে ফেলবে।'

আর কোনো কথা কোনোদিন বলেনি অর্জুন। শুধু বিজবিজ করে বলত, 'ইউক্যালিপটাস গাছটা বাড়ির গেটের সামনে আমি বসিয়েছিলাম। গাছটা একটু বড় হতে তার নীচে একটা বেঞ্চ রাখব ভেবেছিলাম। কিংবা সিমেন্টের

বাঁধানো বেদি। শুকনো পাতায় ছেয়ে থাকবে সেই বেদিটা। হল না, কিছু হল না।'

ওর বিরুদ্ধে ইন্দ্রাণী কেস এনেছিল—অ্যাটেম্পট টু মার্ডার।

এ কেস এতদিন চলে না। কবেই ছাড়া পেয়ে যেত অর্জুন। কিন্তু যতবারই ওর উকিল ওকে কোর্টে দাঁড় করিয়েছে, ততবারই ও একই কথা বলেছে, 'একঘণ্টা সময় দিন আমি ইন্দ্রাণীকে শেষ করেই ফিরে আসছি।'

দেবসেনা বলল, 'হ্যাঁ কাকু, এই কথাগুলো আমি পড়েছি। কিন্তু কেন খুন করতে গিয়েছিল, সেটা না অর্জুন বলেছে না ইন্দ্রাণীর কোনো বয়ানে আছে। ইন্দ্রাণী বলেছিল, ওর আর অর্জুনের নাকি দীর্ঘ পাঁচ বছরের লাভ রিলেশন ছিল। ওদের বন্ধুরা মিলে ফাল্গুন মাসে বিয়ের ডেট ফাইনাল করেছিল। সেই অবস্থায় যখন ওদের বিয়ের আর মাত্র তিনমাস বাকি তখন ওদের শপিংয়ে ব্যস্ত থাকার কথা, ঠিক সেইসময় আচমকাই অর্জুন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আর হঠাৎই ওকে গলা টিপে খুন করতে চায়। ইন্দ্রাণী কোনোমতে ওর কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। ইন্দ্রাণী নাকি অর্জুনকে অনেক জিজ্ঞাসাও করেছে ঠিক কী কারণে ও এমন করছে? কিন্তু অর্জুন চুপ ছিল, আক্রমণাত্মক ছিল। তাই বাধ্য হয়ে নিজেকে বাঁচাতে ইন্দ্রাণীকে অর্জুনের বিরুদ্ধে কেস করতে হয়েছে।'

দেবদুলালবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, একদমই তাই। এর বেশি তথ্য কেউ দিতে পারেনি। অর্জুন তো কোনো কথাই বলে না দেবসেনা। আর এমন ধরনের চুপ করে থাকা মানুষগুলোর বুকের মধ্যে থাকা প্রতিশোধের আগুনটা কিন্তু কিছুতেই নিভে যায় না। ধিকধিক করে জ্বলে। কম কয়েদি তো জীবনে দেখলাম না! তাই এটুকু স্টাডি করতে পারি যে অর্জুন বাইরে থেকে ঠিক যতটা শান্ত, ভিতরে ঠিক ততটাই হিংস্র। এতকিছু জানার পরও আমি তোমাকে ওর কাছে যেতে দিতে পারি না, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

অর্জুনের মা দুবার দুটো উকিল নিয়োগ করেছিল, কারোর সঙ্গে কথা বলেনি ও। শেষে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে।'

দেবসেনা নাছোড়বান্দা। ও বলল, 'প্লিস কাকু, একবার আমায় চেষ্টা করতে দিন। সাতদিন সময় নেব, যদি উনি কথা না বলেন তাহলে আর অনুরোধ করব না।'

দেবদুলালবাবু একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, 'বেশ, সুযোগ কিন্তু বারবার দেব না দেবসেনা। তুমি কাল সকাল এগারোটার পরে চলে যেও জেলে, আমি বলে রাখব।'

দেবসেনা টুপ করে একটা প্রণাম সেরে বেরিয়ে এল।

সমীররঞ্জন স্যারের বাড়ি একবার ঘুরে যাবে। স্যারের আন্ডারে পিএইচডি করবে কথা হয়েই আছে। কয়েদিদের জীবনদর্শন নিয়ে রিসার্চ পেপার্সগুলো রেডি করতে হবে। আনমনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল দেবসেনা। যদি এই অর্জুন নামক ছেলেটি ওকে দেখেই পত্রপাঠ বিদায় করে দেয়, তাহলে ও কী করবে? অন্য কয়েদিদের সঙ্গে কথা বলে পেপার রেডি করাই যায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভেঙে যাবে দেবসেনা। কে জানে কেন অর্জুন নামক ছেলেটির সব কথা শোনার পর ওর সম্পর্কে লেখার ইন্টারেস্টটা বেড়েই চলেছে।

ফোনটা ভাইব্রেট করছে জিন্সের পকেটে। বের করতেই স্ক্রিনে ফুটে উঠল শতরূপের নামটা। ইদানীং আর ভালো লাগে না শতরূপের সঙ্গে কথা বলতে। কেমন একটা গা গোলানো অনুভূতি কাজ করে দেবসেনার মধ্যে।

ফোনটা কেটে দিল ও। ইচ্ছে করছে না কথা বলতে। ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই আবার ফোন। শতরূপ একবার ফোন করে কোনোদিন রেহাই দেয় না দেবসেনাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না দেবসেনা রিসিভ করছে এবং শতরূপের সমস্ত কথা বলা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ও কল করেই যাবে। দেবসেনা

যেন ওর নিজস্ব সম্পত্তি। ঠিক যেন শতরূপের জমিদারির অংশে পানীয় পুকুর। সেখানে কে নামবে, আর কে নামবে না সেটা একমাত্র ওরই ঠিক করার অধিকার আছে।

দেবসেনা ফোনটা রিসিভ করে বলল, 'ব্যস্ত আছি। অকারণে বিরক্ত কেন করছিস?'

শতরূপ ওর নিজস্ব স্টাইলে বলল, 'আমার জন্য তুই সব সময় ফ্রি দেবী। নন্দনে চল আজ বিকালে। মুভি দেখব।'

দেবসেনা শীতল গলায় বলল, 'আজ হবে না রে, সরি। আমি একটা কাজে ব্যস্ত আছি।'

শতরূপের গলার পারদ চড়ছে। দেবসেনার মুখ থেকে স্পষ্ট 'না' শুনতে ও অভ্যস্ত নয়। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে শতরূপের স্বর। কিছুক্ষণের বিরতির পর বলল, 'আমাকে অ্যাভয়েড করছিস তুই? তাহলে অকারণে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলি কেন? সেদিনই তো নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম আমি। কেন বাঁচতে শেখালি আমাকে?'

দেবসেনা শান্ত গলায় বলল, 'তোকে বাঁচতে শিখিয়েছি বলেই কি তুই আমাকে দমবন্ধ করে মেরে ফেলতে চাইছিস? আমার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত কন্ট্রোল করতে চাইছিস তুই রূপ? এভাবে জোর করে কিছু পাওয়া যায়? বরং দূরত্ব বাড়ে।'

ফোনটা কেটে দিল শতরূপ। আগে হলে দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হত দেবসেনা। বারবার ফোন করত রূপকে। ওর ফোনে সুইচড অফ পেলে ওর বড়দিকে কল করে ফেলত উত্তেজনায়। এখন সেসব ভয় আর পায় না দেবসেনা। কী করবে শতরূপ? সুইসাইড করবে? সুইসাইড নোটে ওর নাম লিখে রেখে যাবে? যা ইচ্ছে করুক রূপ। এমন দমবন্ধ জীবন থেকে ও নিজেও মুক্তি চায়। বন্ধুত্বের মাশুল প্রতিমুহূর্তে গুনতে গুনতে ও এখন ভীষণ রকমের

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। রূপের হুমকি তাই আর ওর ভিতরে প্রবেশ করে না কিছুতেই। রূপের ওই নিজেকে শেষ করে দেওয়ার হুমকি বহুবার ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে গেছে।

কলেজের নবীন বরণের দিন ও প্রথম দেখেছিল শতরূপকে। না শতরূপ সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের ছাত্র নয়। ফিজিক্সের স্টুডেন্ট ছিল। একই দিনে দুটো ডিপার্টমেন্টেরই নবীন বরণ ছিল। নিজের ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে দেবসেনা একাই হাঁটছিল। কপালে এক বিন্দু চন্দনের টিপ, পরনে শরতের আকাশকে টেক্কা দেওয়ার মতো আকাশ নীল শাড়ি, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ, হাতে দুটো গোলাপ আর একটা পেন। গোলাপ আর পেনটা ফ্রেশারদের গিফট।

হঠাৎই চোখে পড়েছিল, একটা ছেলে গোলাপের পাপড়িগুলো নৃশংসভাবে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলছে, তারপর অহেতুক রাগে জুতো দিয়ে পিষে চলছে। ছেলেটার কপালে চন্দনের টিপ দেখেই বুঝেছিল ফ্রেশার। একটু এগিয়ে গিয়ে দেবসেনা বলেছিল, 'নিরীহদের ওপরে রাগ দেখিয়ে অনেককে বীরপুরুষ হতে দেখেছি।'

ছেলেটা সম্ভবত এমন আকস্মিক কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, 'নিরীহ! কে নিরীহ? ওই গোলাপগুলো? কিছুতেই ওরা নিরীহ নয়। বরং অনেকটা রক্ত জমাট বেঁধে রেখে দিয়েছে নিজেদের পাপড়িতে। ওরা যদি সাদা হত, তাহলে ব্লাড ক্রাইসিসে কেউ মারা যেত না।'

আর দাঁড়ায়নি ছেলেটা। হনহন করে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গিয়েছিল করিডোর পেরিয়ে। পিছনে বিমূঢ় হয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল দেবসেনা। গোলাপের লাল রঙের সঙ্গে রক্তের কী সম্পর্ক সেটাই বোঝার চেষ্টা করছিল

ও। দুটোর রং লাল ছাড়া আর তো কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পায়নি ও। দুটোর প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ আলাদা। ছেলেটাকে অদ্ভুত লেগেছিল ওর।

পরের দিনও কলেজে দেখেছিল ওই দলছুট ছেলেটাকে। ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে বসে বেদনার লালচে দানাগুলোকে মাটিতে ফেলে পিষে চলছে।

দেবসেনা ধীর পায়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বলেছিল, 'কোন ডিপার্টমেন্ট তোমার?'

ছেলেটা বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, 'ফিজিক্স। মানুষকে একটু একা থাকতে দেখলে তোমাদের বড্ড কষ্ট হয় তাই না? তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের হল্লাবাজির দলে না মিশিয়ে ফেলতে পারছ, ততক্ষণ পর্যন্ত অস্বস্তি হয় বুঝি?'

দেবসেনা নিজের হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে বলেছিল, 'দেবসেনা মিত্র। সাইকোলজি, ফার্স্ট ইয়ার। আমিও ভীষণ একলা বাঁচা মানুষ। বলতে পারো নিতান্ত প্রাইভেট পার্সন। তাই একলা মানুষকে দেখলেই বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে করে। মনে হয় আরেকজনকে পেলাম আমার দলে, যে নীরব থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু পাই কই তেমন কাউকে। সবাই তো দলে মিশে যেতেই পছন্দ করে।'

ছেলেটা চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছিল, দেবসেনার কথা শুনে ওর বাড়ানো হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলেছিল, 'শতরূপ ব্যানার্জী। ফার্স্ট ইয়ার ফিজিক্স। তুমিও কি হই হট্টগোল পছন্দ করো না?'

দেবসেনা ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'আমি বন্ধুত্বে গভীরতা পছন্দ করি। শুধু একসঙ্গে সিনেমা দেখা, ঝালমুড়ি খাওয়া, অন্তক্ষরীর বেঞ্চ বাজানোর বাইরেও যে বন্ধুত্ব হয়, সেটা পছন্দ করি। এই যেমন চুপচাপ বসে সূর্যাস্ত দেখা, অথবা পাতা খসার আওয়াজ শোনা কান পেতে।'

শতরূপ একটু সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলেছিল, ‘আর বন্ধুর হাঁড়ির খবর নেওয়া? তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কথা বলা—এগুলো কেমন লাগে তোমার?’

দেবসেনা হেসে বলেছিল, ‘যতটুকু সে বলতে চায় ততটুকুই আমি শুনতে চাই। প্রশ্নবাণে ব্যতিব্যস্ত করা আমার একেবারেই পছন্দ নয়।’

শতরূপ নিজের ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিল, ‘যেন আর কেউ না জানে আমার নম্বর।’

দেবসেনা দাঁড়িয়ে দেখেছিল শতরূপের চলে যাওয়া। আজকের হাঁটার মধ্যে সেই প্রথম দিনের আক্রোশ নেই, বরং পাগুলো যেন একটু এলোমেলো পড়ছে। অল্প অন্যমনস্ক ভাব রয়েছে হাঁটার ছন্দে। দেবসেনা মনে মনে খুশি হল, সাইকোলজির স্টুডেন্ট হিসাবে এটা ওর সাকসেস। একজন মানুষকে সামান্য হলেও ভাবাতে পেরেছে ওর কথা।

তবে শতরূপকে দেখে দেবসেনা সেদিনই বুঝতে পেরেছিল ওর মধ্যে মারাত্মক কোনো সমস্যা আছে। গভীর ক্ষত আছে। পড়াশোনাটা হয়তো করে নিচ্ছে মন দিয়েই, কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপন যে ছেলেটা করে না সেটা ওর চোখের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিই প্রমাণ করে।

প্রায় রোজই ক্যান্টিনে শতরূপ আর দেবসেনা একসঙ্গে বসে টিফিন খেত। ধীরে ধীরে শতরূপের একমাত্র বন্ধু হয়ে উঠল দেবসেনা। শতরূপের মনের মধ্যে জমে থাকা কঠিন বরফটা একটু একটু করে গলতে শুরু করেছিল। কোনো কথায় আচমকা হেসে উঠছিল শতরূপ। হাসিবিহীন রাগী মুখের শিরা-উপশিরাগুলো আবারও ছন্দে ফিরছিল। দেবসেনা বলেছিল, ‘রূপ আমরা কিন্তু ভালো বন্ধু। প্রেমিক-প্রেমিকা নই। এই সম্পর্কে আমার দমবন্ধ লাগে। ওই একটার পর একটা কমিটমেন্ট, রাগ-অভিমান এসব ঠিক ভালো লাগে না। বরং মুক্ত আকাশে যে সম্পর্ক পাখির মতো ডানা মেলতে পারে

সেই সম্পর্কটার নাম বন্ধুত্ব। আমাদের মধ্যে সেটাই থাকবে। তাছাড়া তোকে দেখে আমার অন্য কোনোরকম অনুভূতি অর্থাৎ প্রেম-ভালোবাসা আসে না। মনে হয় তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, ব্যস।'

শতরূপ হেসে বলেছিল, 'আমিও তোর বন্ধু হয়েই থাকতে চাই। প্রেমিক হওয়ার ইচ্ছে আমারও নেই বস।'

বেশ চলছিল ওদের বন্ধুত্বের দিনগুলি। সমস্যাটা তৈরি হল ওরা যখন থার্ড ইয়ারে উঠল। দেবসেনার ধারে কাছে আর কাউকে সহ্য করতে পারত না রূপ। এমনকী ওর ডিপার্টমেন্টের রচনা আর শান্তনু যারা সবসময় দেবসেনাকে সাহায্য করে তাদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করে এসেছিল শতরূপ। ওর একটাই বক্তব্য, 'তোর কী লাগবে বল দেবী, আমি তোকে সব দেব।'

ততদিনে শতরূপের সবকিছু জেনে গেছে দেবসেনা। মাত্র বছর তিনেক আগে ওর মা মারা যান। বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। এত ব্লিডিং হয়েছিল যে শরীর ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও মায়ের ব্লাড গ্রুপের ব্লাড পায়নি ব্লাড ব্যাঙ্কে। মাকে হারিয়ে ওর সব রাগ পড়েছিল বাবার ওপরে। বাবার অবহেলার কারণেই নাকি ওর মা মারা গেছেন, এমন একটা দৃঢ় ধারণা ওর মাথায় বসে গিয়েছিল। মা ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করতেন না, তাই লো প্রেশার আর অ্যানিমিয়ায় ভুগছিলেন বহুদিন ধরে। মা তবুও নিজের অফিস আর বইপত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। ওর দিদি ব্যাঙ্কে ভালো জব করে। আগে সম্পর্ক খারাপ ছিল না রূপের সঙ্গে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পরে দিদিকেও ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দিয়েছে ও। কারণ দিদি এখনও বাবাকে ভালোবাসে। রূপ বাড়ির কারোর সঙ্গেই ভালো ব্যবহার করে না, সেটা ওর দিদিও বলেছিল দেবসেনাকে।

রাতের পর রাত মায়ের ছবির সামনে চুপ করে বসে থাকে শতরূপ।

দেবসেনার ফোন বেজে উঠেছে রাত দুটোয়। চমকে উঠে ফোন রিসিভ করতেই একটা অতি পরিচিত গলার স্বর অপরিচিত ভঙ্গিমায় বলেছে, 'দেবী আমি চললাম রে। নিজের খেয়াল রাখিস। আমায় একেবারে ভুলে যাস না প্লিস।'

ঘুমের ঘোরে চমকে উঠেছে দেবসেনা। 'কোথায় যাচ্ছিস রূপ তুই? কী বলছিস এসব?'

রূপ খানিকক্ষণ ফোনটা কানে চেপে ডুকরে কেঁদে বলেছে, 'মায়ের কাছে যাচ্ছি। মা ডাকছে আমায়। এ বাড়িতে আমার কেউ আপন নেই বিশ্বাস কর।'

দেবসেনা আরও শীতল গলায় বলেছে, 'বেশ, তাহলে চলে যা তুই। আমি যখন তোর কেউ হই না, আমাদের বন্ধুত্ব যখন মিথ্যে, তখন চলে যা। এভাবে বন্ধুত্ব ভেঙে দেওয়ার ইচ্ছে যখন ছিল তখন দায়িত্ব নিয়েছিলিস কেন সম্পর্কের?'

শতরূপ বেশ কিছুক্ষণ শব্দ না করে ফোনটা ধরে রেখেছে, ওর সঙ্গে রাত জেগেছে দেবসেনা। তারপর আচমকাই রূপ বলেছে, 'চল, কাল কলেজে দেখা হচ্ছে।'

রূপ বলে, 'আমার বার তিনেক আত্মহত্যার পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছিস তুই দেবী।'

রূপ ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিয়েছে। পড়াশোনায় মনযোগী হয়েছে। দেবসেনা ওকে আগলে রেখেছিল ওর মায়ের মতো করে, কাছের বন্ধুর মতো করে। না, শতরূপের মধ্যে ও কোনোদিনই ওর প্রেমিককে খুঁজে পায়নি বরং মানসিকভাবে একটু দুর্বল একটা বন্ধুর প্রতিচ্ছবি দেখেছে বারংবার, যার হাতটা শক্ত করে ধরে রাখার দায়িত্ব দেবসেনার। যার একাকিত্বের ভাগীদার হওয়ার দায়িত্বও দেবসেনার। দেবসেনা সে দায়িত্ব পালন করেছে খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই। শতরূপ অনেক স্বাভাবিক হয়েছে। ওর

নিজের ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়ের সঙ্গে পিকনিকে মাইথন গিয়েছিল। দেবসেনা শুনেছে ওখানে গিয়ে ও গান গেয়েছে সকলের সঙ্গে। লেগপুল করেছে বন্ধুদের। নিশ্চিন্ত হয়েছে দেবসেনা। যাক, শতরূপকে ও স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে।

যে যার নিজের নিজের মতো ব্যস্ত থেকেছে জীবনে। আর মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে রূপ বলে না, 'ঘুমাতে পারছি না দেবী, প্লিস হেল্প মি।' আর পাবলিক বাসের মধ্যে ওর হাত টেনে নিয়ে বলে না, 'ছেড়ে যাবি না তো আমায়?'

দেবসেনা কানাঘুষো শুনেছে শতরূপ নাকি প্রেমে পড়েছে। থার্ড ইয়ারের বাংলা ডিপার্টমেন্টের অনুশ্রীর সঙ্গে বেশ কয়েকদিন দেখতেও পেয়েছে ওকে দেবসেনা।

মনে মনে শুধু একটাই কষ্ট হয়েছে, কেন শতরূপ ওকে কিছু বলল না অনুশ্রীর ব্যাপারে! রূপকে ওই ঘন অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে এই আলো ঝলমলে পৃথিবীতে আনার জন্য কম পরিশ্রম তো করতে হয়নি দেবসেনাকে। তারপরেও বেস্ট ফ্রেন্ডের এমন ব্যবহার ওকে বেশ দুঃখই দিয়েছে। তবে রূপ আর ওর মধ্যে কোনো আড়াল নেই, থাকার কথাও নয়। তাই দেবসেনা নিজেই কলেজ থেকে বেরিয়ে রূপের হাত থেকে আইসক্রিমটা কেড়ে নিয়ে নিজে খেতে খেতে বলেছিল, 'কী বস, প্রেমে পড়েছ, মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ আর অভিভাবকের পারমিশন নিলে না?'

রূপ হেসে বলেছিল, 'অভিভাবকটা কে রে?'

দেবসেনা নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে গর্বিত গলায় বলেছিল, 'এই যে আমি। তোর চিরকালীন অভিভাবক।'

রূপ হেসে বলেছিল, 'ওহ্, মাদার ইন্ডিয়া সরি। বাট অনুশ্রী এখনও আমার প্রেমিকা কিনা সেটা বুঝতে পারিনি। দুজনে দুজনের পালস বোঝার পর্বে

বিলং করছি।'

দেবসেনা কিছু শোনেনি। বলেছিল, 'ওসব গুলগাপ্পা অন্য কাউকে দিস। আমার সঙ্গে বৌমার পরিচয় করিয়ে দে আগে।'

দেবসেনার জীবনের সবথেকে বড় ধাক্কাটা লেগেছিল সেদিন।

'ম্যাডাম এই গলির মুখে নামিয়ে দিলে হবে?'

ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথাতে সম্বিৎ ফিরল দেবসেনার। টাকা মিটিয়ে নেমে পড়ল। ওদের বাড়ির সামনের গলিটা একটু সরু তাই বাইরের গাড়ি ঢুকতে চায় না। তাতে অবশ্য পঞ্চানন গলির বাসিন্দারা তেমন ভাবিত নয়। মেইন রোড থেকে এই কয়েকপা তারা হেঁটেই মেরে দেয়। গলির দু'পাশের রাস্তায় বসা ছোট ছোট দোকানগুলোকে উঠিয়ে দেওয়ার কথা কখনই মনে হয়নি এই পঞ্চানন গলির বাসিন্দাদের।

নিজেদের পাড়াতে ঢুকতেই চোখে পড়ল সেই পরিচিত দৃশ্য, বেশ কয়েকজন হাফ প্যান্টের মস্তান ব্যাট-বল হাতে রাস্তাটাকেই বাইশ গজ বানিয়ে বল পেটাচ্ছে। আর পাড়ার নিয়ম অনুযায়ী শুভেন্দু জেঠুর বাড়ির দেওয়ালে বল লাগলেই আউট বলে চিৎকার করছে। চেনা মুখগুলো দেখে এতক্ষণ আটকে রাখা নিশ্বাসটা বেশ জোরেই ছাড়ল দেবসেনা। শতরূপ নামটা এখন তার কাছে একটা বিভীষিকার মতো। এই নামটা ফোনের স্ক্রিনে দেখলেই ওর হৃৎপিণ্ড দ্রুতগামী হয়, একটা চূড়ান্ত বিরক্তি আর ঘৃণা এসে জমা হয় বুক পকেটে।

কেউ একজন পিছন থেকে ডাক দিল, 'দেবসেনা, কী রে, কদিন দেখতে পাইনি কেন রে মা?'

পিছন ঘুরে দেখল একতলার বারান্দায় মিনতিকাকিমা বসে বসে কাকুর ফেলে রাখা বাসি কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন। একটা চোখ কাগজে তো আরেকটা রাস্তায়।

দেবসেনা একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম গো কাকিমা কয়েকদিন। তাই সকালে বেরিয়ে সন্ধেতে ফিরছিলাম। সেইজন্য হয়তো দেখতে পাওনি।'

কাকিমা গলা নামিয়ে বললেন, 'ওই যে রে সেই ফর্সা মতো ছেলেটা, একটু আগেই বাইক হাঁকিয়ে পাড়া জানিয়ে বার দুয়েক ঘুরে গেছে পাড়ার মধ্যে দিয়ে।'

দেবসেনা একটু চমকে উঠেই জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ছেলেটা কাকিমা?'

কাকিমা অবলীলায় বলল, 'ওই যে রে, তোর বন্ধুটা। কী যেন নাম! যে তুই কলেজে পড়াকালীন আসত তোদের বাড়িতে, ওই ছেলেটা।'

দেবসেনা চমকে গেল। শতরূপ ওদের পাড়ায় এসে টহল দিয়ে গেছে? বাড়িতেও গিয়েছিল নাকি? তার মানে, ওকে যখন ফোন করছিল তখন হয়তো এই গলিতেই দাঁড়িয়েছিল শতরূপ। ছি, ভাবতেই আবারও গা'টা গুলিয়ে উঠল ওর। এতটা নীচে কী করে নেমে গেল রূপ! অবশ্য নেমে তো আজ যায়নি, গেছে বেশ কয়েক বছর আগেই। কাকিমাকে কিছু একটা বলতে হবে ভেবেই বলল, 'ও আচ্ছা তাহলে হয়তো অন্য কোনো দরকারে এসেছিল। আমি তো বাড়িতে ছিলাম না।'

কাকিমাকে দ্বিতীয় প্রশ্নের সুযোগ না দিয়েই এগিয়ে এল বাড়ির দিকে।

গেট খুলে ঢুকতেই বাবার গম্ভীর মুখ। মা-ও বেশ বিরক্ত মুখেই বসে আছে ড্রয়িংরুমে। ওকে দেখে আর সময় নষ্ট না করেই বাবা বলল, 'দেবী তুই কি আমাদের একদিনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিবি না? মানে আমাদের অপরাধটা কী যদি একটু বলিস?'

দেবসেনা একটু থমকে গিয়ে বলল, 'কেন কী হয়েছে?'

বাবাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই মা বলল, 'আজ শতরূপ এসে বারচারেক বাইরের গেটের সামনে দিয়ে চক্কর কেটে গেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে

গেটের সামনে হর্ন বাজাচ্ছিল। পাড়ার মোটামুটি অনেকেই জানে শতরূপ তোর বন্ধু ছিল। তারা উঁকিঝুকি দিচ্ছিল। লাস্টবার বাড়ির সামনে এসে যা চেঁচিয়েছিল তোর ওপরে, সেটাও কারোর জানতে বাকি নেই। মানসিক অসুস্থ ছেলেটাকে সুস্থ করার দায়িত্ব দিয়ে তো তোমায় কলেজে পাঠাইনি মা। তাকে তুমি সুস্থ করে তুললে, সে এখন আমাদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে।'

বাবা একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'রমলা, তুমি কি মনে করছ তোমার মেয়ে এতেই শান্ত হয়েছে? দেবদুলাল ফোন করে জানাল, দেবী নাকি এমন একজন কয়েদির ওপরে পেপার্স লিখতে চায় যাকে গত চারবছর ধরে কেউ একটাও কথা বলাতে পারেনি। এমনকী উকিলও না। কেন যে এমন ভয়ঙ্কর নেশা চাপে এই মেয়ের কে জানে!

আমি লোকাল থানায় ওই শতরূপের নামে একটা ডায়রি করে আসব। আজ না হয় অফিস ছুটি বলে আমি বাড়িতে ছিলাম। এরপর তুমি যেদিন একা থাকবে সেদিনও যদি এসে এমন হুজ্জুতি করে তো পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া ঢের ভালো।'

দেবসেনা নিজের রুমে যেতে যেতে হালকা চালে বলে গেল, 'এত সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু হয়নি রূপকে। দু'দিন ইগনোর করলেই ও আর আসবে না। আর অর্জুন রায়কে ভয়ঙ্কর কোনো খুনি ভাবার কোনো কারণ নেই, ভদ্রলোক আদৌ খুনটা করতেই পারেননি। এতদিনে বেকসুর খালাস হয়ে যেতেন হয়তো, কিন্তু কাউকে সহযোগিতা করেছেন না বলেই এখনও জেলে পড়ে আছেন।'

বাবা একটু রাগত স্বরে বলল, 'আমি তো একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না দেবী, অযথা উপযাচক হয়ে এসব ঝঞ্ঝাট তুমি কেন নিজের জীবনে নিয়ে আসছ?'

দেবসেনা একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'বাবা সাইকোলজি সাবজেক্টটা বেছেছিলাম মানুষের মনের দরজা খুলব বলেই।'

নিজের ঘরে ঢুকে ড্রেস চেঞ্জ করে বিছানায় বসল দেবসেনা। আবারও ফোনটা বাজছে। শতরূপের ফোন।

ফোনটা রিসিভ করেই খুব ঠান্ডা গলায় দেবসেনা বলল, 'তুই আজ আমাদের পাড়ায় এসে হিরোগিরি করে গেছিস শুনলাম। তা বেশ। তবে শোন রূপ, আমি বোধহয় আর কোনোদিনই তোর সঙ্গে রাস্তাঘাটে ঘুরতে পারব না রে। কারণ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা নষ্ট করে দিয়েছিস তুই। আরেকটা জিনিস বারবার ভুলে যাচ্ছিস, আমি তোর প্রেমিকা নই। শুধুই বন্ধু ছিলাম আমরা। আজও হয়তো তাই থাকতাম যদি না আমি প্রেমে পড়তাম।'

শতরূপ ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলল, 'প্রেমে পড়েছিস? কার? আমি জানতে পারি আশা করি।'

দেবসেনা শান্ত গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই জানতে পারিস। অর্জুন রায়। পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার।'

শতরূপ রাগী গলায় বলল, 'এটা কীভাবে হয় রে দেবী? তুই তো নিজেই বলেছিলি সম্পর্কে নাকি তোর দমবন্ধ লাগে। তাহলে এখন প্রেমে পড়লি কী করে?'

দেবসেনা বালিশে মাথা দিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে রিল্যাক্স মুডে বলল, 'মন তো। আফটার অল মানুষের মন তো, বদলাতে কতক্ষণ? লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট বলে ইংরেজির ওই কথাটা আমাদের প্রেমের ক্ষেত্রে ভীষণ রকমের সত্যি জানিস তো। এনিওয়ে, অর্জুন মারাত্মক পজেসিভ। তাই এমন হুটহাট এসে হাজির হোস না। ও একেবারেই পছন্দ করে না।'

শতরূপ বলল, 'ও, তার মানে তোর প্রেমিকের মনমর্জির ওপরে আমাদের এতদিনের বন্ধুত্ব নির্ভর করবে বলতে চাইছিস?'

দেবসেনা বলল, 'বলতে চাইছি নয় রে, বলছি। চল এখন রাখছি।'

ফোনটা কেটে দিল দেবসেনা। আচমকা নিজের বলা কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন নিজের কানেই বাজল। অর্জুন রায় কে? একজন জেলের কয়েদিকে আচমকা প্রেমিক বানিয়ে ফেলল কেন দেবসেনা! শতরূপকে নিজের জীবন থেকে সরানোর তো অনেক পদ্ধতি আছে, সেগুলো অ্যাপ্লাই না করে নিজের প্রেমে পড়ার গল্প করতেই বা কেন গেল, আর কেনই বা অর্জুন নামটা এল ঠোঁটের ডগায়।

শতরূপকে কি আদৌ আর সরানোর প্রয়োজন আছে? দেবসেনা তো সেই কবেই বন্ধুত্বের শ্রেষ্ঠ আসনটা থেকে শতরূপকে এক ধাক্কায় নামিয়ে দিয়েছিল। সেই সেদিনই যেদিন ও প্রথম ওর প্রেমিকা অনুশ্রীর সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছিল।

চোখের সামনে আবারও ফুটে উঠল সেই চূড়ান্ত অস্বস্তিকর পরিবেশটা।

ক্যান্টিনে অনুশ্রী বসে ছিল আরও দুজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। শতরূপের সঙ্গে দেবসেনা গিয়েছিল ক্যান্টিনে। ফুরফুরে মেজাজে, রূপকে লেগপুল করতে করতেই।

অনুশ্রীর সামনে রূপ হঠাৎই বলে বসল, 'দেখো অনু যার কথা তোমায় সবসময় বলি। যে আমায় দ্বিতীয়বার জীবন দিয়েছে বলতে গেলে।'

অনুশ্রী হাসি মুখে বলেছিল, 'দেবসেনা, তাই না? তোমার কথা রূপের মুখে এত শুনেছি যে, আমারও আলাপ করার ইচ্ছেটা বেড়েই চলেছিল। রূপের বেস্ট ফ্রেন্ড বলে কথা।'

দেবসেনা অনুশ্রীর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিতেই অনুশ্রী আন্তরিকভাবেই হাতটা ধরেছিল। ঠিক সেই অবস্থায় শতরূপ সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, 'দেবসেনা আমার ব্যাপারে বড্ড পজেসিভ। অনুশ্রী তুমি হয়তো জানো আমরা শুধুই বেস্ট ফ্রেন্ড, তা কিন্তু নয়। দেবসেনা লাভস মি। এটা

আমি ফিল করি গত তিনবছর ধরে। কিন্তু ওকে ঘিরে আমার কোনো ফিলিংস নেই, তাই হয়তো সম্পর্কটা এখনও বন্ধুত্বের আবরণেই আছে। তাই আমি জানি, অনুশ্রীকে দেখে হয়তো দেবসেনা খুব একটা খুশি হবে না, কিন্তু আমি নিরুপায় দেবী।'

দেবসেনা চমকে গিয়েছিল রূপের এমন অস্বাভাবিক ব্যবহারে। সকলে ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছিল। অনু হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল অবজ্ঞায়। রূপ কিন্তু থামেনি। বলেই চলেছিল, 'কতরাত আমরা একসঙ্গে জেগেছি দেবী, তুই আর আমি কথা বলতে বলতে ভোর করেছি। আমি অনুকে ভালোবাসলেও তোকে ভুলিনি বিশ্বাস কর। আমাদের সেই দিনগুলো কিন্তু আমি ভুলিনি। তুই একবারও ভাবিস না অনু আমার জীবনে এসেছে বলেই আমি তোকে নেগলেক্ট করব, কিছুতেই না।' নিজের বুকের বাম দিকে জোরে একটা নাটকীয় ঘুষি মেরে রূপ বলেছিল, 'তুই আমার যেখানে ছিলিস ঠিক সেখানেই আছিস।'

দেবসেনা লজ্জায় কারোর মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। রূপের বলা সমস্ত কথা যে মিথ্যে এটা প্রমাণ করার ইচ্ছেটুকুও অবশিষ্ট ছিল না ওর। গোটা ক্যান্টিনের সকলের হাসি আর করুণার খোরাক হয়েই অবসন্ন পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এসেছিল ও। ফিরে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করেনি ওকে এতটা অপমান করার পরে রূপের মুখটা কেমন হয়েছিল, অনুশ্রীই বা ঠিক কীভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, কিছু দেখতে ইচ্ছে করেনি ওর। ঝাপসা চোখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল।

ফোনে অনেক বন্ধুই বলেছিল, শতরূপ নাকি গোটা কলেজে রটিয়ে বেড়াচ্ছে, অনুশ্রীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক হওয়ায় দেবসেনা প্রবল রাগ করেছে।

শতরূপের এমন ব্যবহারের কোনো হদিশ খুঁজে পায়নি দেবসেনা। বারংবার মনে পড়েছে ওর আর রূপের নিটোল বন্ধুত্বের দিনগুলোর কথা।

শতরূপ খুব ভালো করে জানত দেবসেনা কোনোদিন রূপের প্রেমিকা হতে চায়নি। তাহলে এভাবে ওর বদনাম রটিয়ে ঠিক কী আনন্দ পেল ও!

দিন পাঁচেক কলেজ যায়নি ও, রূপের ফোনও ধরেনি। একটার পর একটা মেসেজ করেছে রূপ, উত্তর দেয়নি দেবসেনা। শেষে রূপ মেসেজ করেছে দশ মিনিটের মধ্যে যদি আমার ফোন রিসিভ না করিস, তাহলে আমি সুইসাইড করব। আমার মৃত্যুর জন্য একমাত্র দায়ী তুই থাকবি দেবী।

আত্মহত্যার প্রবণতা যে রূপের আছে এটা নতুন কিছু নয়। তাই একটু ভয় ভয়েই রূপের ফোনটা রিসিভ করেছিল দেবসেনা। ফোনটা ধরেই প্রায় চিৎকার করে বলেছিল, 'রূপ আমি কি এটা ডিসার্ভ করি? এতদিনের বন্ধুত্বের এই পরিণাম!'

শতরূপ ভীষণ রকমের শীতল গলায় বলেছিল, সবকিছু নিয়ে এত রিয়্যাক্ট কেন করিস রে তুই? আরে অনুশ্রী জেলাস ফিল করবে বুঝলি। ভাববে তোর মতো একটা সুন্দরী আমার প্রেমিকা হতে চায়, এই জেলাসি থেকেই তো আমাদের প্রেমটা আরও গভীর হবে।'

দেবসেনার দু'চোখ দিয়ে নীরবে জল পড়েছিল। নোনতা জলে ভিজেছিল ওর গাল থেকে চিবুক। ইচ্ছে করেই মুছে দেয়নি, মনে হচ্ছিল ভুল মানুষকে বন্ধু ভাবার প্রায়শ্চিত্ত হোক এই চোখের জল দিয়েই। যে নিজের সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনায়াসে বিক্রি করে দিতে পারে ওর এতদিনের লালিত বিশ্বাসকে।

সেদিনই ও ঠিক করেছিল, শতরূপকে ও দূরে সরিয়ে দেবে, এতটা দূরে যেখান থেকে হাজার চেষ্টা করলেও রূপ আর আগের মতো ওকে বন্ধু ভাবতে পারবে না।

তারপরেও শতরূপ নিয়ম করে ফোন করেছে। ওর আর অনুশ্রীর প্রেমের কেমিস্ট্রি বলেছে। দেবসেনা শুধুই শুনে গেছে, কোনোরকম উত্তর দেয়নি।

আস্তে আস্তে রূপের প্রতি ওর ঠান্ডা ব্যবহার দেখে ও নিজেই অবাক হয়ে গেছে। এতটা কঠিন যে দেবসেনা হতে পারে এটা বোধহয় ওর কাছে অজানা ছিল। নিজেকে আবিষ্কার করেছে ও প্রতিমুহূর্তে। নিজেকে চিনতে শিখেছে, বুঝতে শিখেছে যে, ওর নিজের মধ্যে অদ্ভুত একটা শক্তি আছে, যেটা প্রয়োগ করলে রক্তপাত ছাড়াই অনেকে ধরাশায়ী হতে বাধ্য হবে। ঠিক যেভাবে ওর অত্যন্ত শীতল ব্যবহারে রূপ চিৎকার করেছে। রেগে গিয়ে ফোন কেটে দিয়েছে। এক্সাম দিয়ে ফেরার পথে বাসের মধ্যেও সিনক্রিয়েট করেছে রূপ। দেবসেনা একমনে বাসের লোকজনের অভিব্যক্তিগুলো লক্ষ্য করতে করতে ভেবেছে, এরা ঠিক কী ভাবছে এই সময় ওর সম্পর্কে! পাঁচজনের মধ্যে ছোট্ট গবেষণা চালিয়ে বুঝেছে, প্রত্যেকেই পথচলতি একঘেয়েমির মধ্যে একটা চটপটে বিষয় দেখতে পেয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। সেই থোর বড়ি খাড়া জীবনে এক টুকরো উষ্ণ বাতাস।

একটি ছেলে তার গার্লফ্রেন্ডকে উচ্চস্বরে ক্রমাগত আক্রমণ করেই চলেছে, আর তার গার্লফ্রেন্ডটি নিতান্ত বোবার মতো আচরণ করে চলেছে। হ্যাঁ, শতরূপের বলার ভঙ্গিমায় মনে হচ্ছিল দেবসেনা ওর বন্ধু নয়, প্রেমিকা। শুধু প্রেমিকা নয়, বেশ পরাধীন প্রেমিকা যার প্রতিটা মুহূর্তের হিসেব দিতে হয় প্রেমিক নামক পুরুষটিকে। দেবসেনার বেশ মজা লাগছিল বাসের লোকজনের মুখ দেখে। অনেকের চোখে আবার এমনও দৃষ্টি ফুটে উঠল, মিটিয়ে নিলেই হয়। অনেকে ভাবছে, মেয়েটা কি ইচ্ছে করে ইগনোর করছে, নাকি ছেলেটারই দোষ? বেশ কয়েকজনের চোখের ভাষা পড়ে দেবসেনা বুঝল, এরা ভীষণভাবে চাইছে দেবসেনা কিছু বলুক, ঠিক যেভাবে শতরূপ চাইছে। একতরফা বলাতে আর কতক্ষণ ইন্টারেস্ট রাখা যায়! তাছাড়া দেবসেনার এমন নিস্পৃহতা দেখে শতরূপের গলার আওয়াজ কমে আসছিল। আধঘণ্টা পরে দেবসেনা নেমে এসেছিল নিজের স্টপেজে।

শতরূপ বাস থেকেই চেঁচিয়ে বলেছিল, 'যেটা করছিস ঠিক করছিস না।'

দেবসেনা বাঁ-হাতটা তুলে টা-টা দেওয়ার ভঙ্গি করেছিল নির্লিপ্ত মুখে।

এর থেকেই বুঝেছিল, ইগনোর করতে গেলে সহ্য শক্তি বাড়াতে হবে। নিজের মধ্যে আরেকটা ভিন্ন দেবসেনাকে আবিষ্কারের নেশায় ও তখন মনোনিবেশ করেছিল। সেটাতে যে সাকসেসফুল হয়েছে তার প্রমাণ তো শতরূপের আজকের ব্যবহারে পেয়েছে। শতরূপ বুঝেই গেছে দেবসেনা ওকে আর কোনোদিনই বন্ধু ভাববে না।

এরপরে কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। দেবসেনা নিজেকে সরিয়ে এনেছে একটু একটু করে। আচমকাই একদিন অনুশ্রী ফোন করে জানিয়েছে ওদের ব্রেকআপ হয়ে গেছে। কোনো মান-অভিমান হলেই নাকি শতরূপ আত্মহত্যা করার ভয় দেখাত অনুশ্রীকে। দিনদিন ওদের সম্পর্কটা বাতাসহীন দমবন্ধ একটা ঘরে পরিণত হয়েছিল। অনুশ্রী আতঙ্কে থাকত এই বুঝি রূপ রেগে যাবে। এই বুঝি ওর মুড সুইং করবে। কতদিন অনুশ্রী নিজের দিকে ভালো করে তাকাতেই ভুলে গিয়েছিল। শেষে বাধ্য হয়ে শতরূপের সঙ্গে সম্পর্কে বিরতি টেনেছে।

দেবসেনা মনে মনে হেসেছিল। আত্মহত্যার ভয় দেখানোটা এখন রূপের একটা ভয়ঙ্কর নেশায় পরিণত হয়ে গেছে, সেটা ও আগেই টের পেয়েছিল।

দেবসেনা শুধু একটাই কথা বলেছিল, 'প্রাণ খুলে বাঁচ অনুশ্রী।'

অনুশ্রীর সঙ্গে ব্রেকআপের খবর শতরূপ নিজে বলেনি দেবসেনাকে। বরং মিথ্যে করে বলে চলেছিল, 'আজ তো অনুশ্রীর সঙ্গে মুভি দেখতে যাব।' দেবসেনা ঘৃণায় শিউরে উঠেছিল। তার মানে কি রূপ একইরকমভাবে অনুশ্রীর গল্প করে ওর মধ্যে পজেসিভনেস গ্রো করতে চাইছে! খুব ইচ্ছে করছিল, একদিন সকলের সামনে গালে একটা থাপ্পড় মেরে বলতে, 'রূপ আমাদের নির্ভেজাল বন্ধুত্বটাকে তুই এভাবে কেন নীচে নামালি?' না, কিছুই

বলেনি দেবসেনা। ও জানে শতরূপ বদলাবে না। একইরকম সাইকো শয়তান থেকে যাবে। তাই বরফ শীতল ব্যবহারই ওর একমাত্র ওষুধ। সেটা প্রয়োগ করে ফলও পেয়েছে দেবসেনা।

অর্জুনকে নিয়ে বেরোনো খবরের ফাইলগুলো পরপর পড়তে শুরু করল। ইন্দ্রাণীর বয়ানের মধ্যে বড্ড বেশি অসামঞ্জস্যতা চোখে পড়ছে আজ দেবসেনার।

ইন্দ্রাণীর বক্তব্যগুলো লাল কালি দিয়ে মার্ক করছিল দেবসেনা। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে অর্জুনের প্রায় বছর চারেকের সম্পর্ক ছিল। তারপরেও ভদ্রমহিলা একজায়গায় বলছে, 'অর্জুন যে আমায় খুন করে দেবে এমন ভয় আমি আগেই পেয়েছিলাম?' কেন ভদ্রমহিলা এমন অদ্ভুত ভয় পেত?

অর্জুনের অফিস রেকর্ড খুব ভালো। প্রত্যেকে একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, অর্জুন রায় কলিগ হিসাবে অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। যে-কোনো অফিস পার্টিতে খুব হুল্লোড় করতে না পারলেও অংশগ্রহণ করত এবং এনজয় করত। কখনও অফিসে কারোর সঙ্গে ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়নি। কর্পোরেট জগতের লোকজন বলছে ভদ্রলোক নির্বিবাদী। মিশুকে না হোক, বেশ হাসিখুশি স্বভাবের। তাহলে ইন্দ্রাণীর এমন ভয় পাওয়ার কারণটা ঠিক কী?

অর্জুনের বাড়িতে একবার ঢুঁ দিতে হবে কাল সকালেই। হয়তো দিন দুয়েকের মধ্যেই দেবদুলালকাকু ডাকবেন। তার আগেই এই কাজটা সেরে নিতে হবে।

চোখ বন্ধ করতেই অর্জুনের ইনোসেন্ট চোখ দুটো ভেসে উঠল চোখের সামনে। একটু কি বেশিই ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে ও অর্জুনের কেসটা নিয়ে? কেন কে জানে প্রথম যেদিন কাগজে অর্জুনের ছবিটা দেখেছিল, সেদিন থেকেই অদ্ভুত একটা মায়া তৈরি হয়েছিল ছেলেটার জন্য। ওর ওই দু-চোখে

যেন অনেক না বলা কথার বাস। ঠোঁটের পাশের হাসিতেও কিছু লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। সেই কারণেই দেবসেনার আরও বেশি করে আগ্রহ জন্মেছিল ওর ব্যাপারে।

'আসতে পারি?'

বেলটা বার দুই বাজানোর পরে একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা দরজাটা খুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন দেবসেনার দিকে। ভদ্রমহিলার ভ্রুর ভাঁজ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বাড়িতে ইদানীং মানুষের যাতায়াত বেশ কম। তাই একটু দ্বন্দ্বে পড়েছেন। দেবসেনা আবার বলল, 'আসতে পারি? আপনি কি মিসেস অদিতি রায়?'

ভদ্রমহিলা কৌতূহলী গলায় বললেন, 'আপনি কে? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।'

দেবসেনা নির্দ্বিধায় বলল, 'আমি অর্জুনের পরিচিত। বলতে পারেন বন্ধুস্থানীয়।'

মহিলা একটু অপ্রস্তুত গলায় বললেন, 'কিন্তু অর্জুন তো...'

ওঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই দেবসেনা বলল, 'জানি, বছর চারেক হল জেলে আছে। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব বলেই এসেছি আন্টি।'

অদিতিদেবী একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আসুন, ভিতরে আসুন।'

দেবসেনা ভিতরে ঢুকতেই অর্জুনের মা বললেন, 'ওর বাবা তো এখন বাড়িতে নেই। চেম্বারে আছে।'

দেবসেনা হেসে বলল, 'জানি, অংশুমান রায় একজন নামী চিকিৎসক। নিউরোলজিস্ট হিসাবে ওঁর নাম সকলেই জানি।'

অদিতিদেবী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ইদানীং আর আগের মতো চেম্বার করে না। মনে মনে বড্ড ভেঙে পড়েছে মানুষটা। একমাত্র সন্তানের এমন কর্মের দায় তো বাবা-মা হিসাবে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। তবুও

পেশেন্টদের ফোন আসে। ভিড় হয় বলেই বসে সপ্তাহে দিন তিনেক। ভিতরে ভিতরে লজ্জায়, অপমানে মানুষটা ক্ষয়ে গেল একেবারে।'

দেবসেনা ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'আমি অর্জুনকে অনেকটাই চিনি। আমি কাল অথবা পরশু যাব ওর সঙ্গে কথা বলতে। ও কেন এভাবে স্বেচ্ছায় বন্দীজীবন মেনে নিয়েছে, এটা আমাকে জানতেই হবে।'

ভদ্রমহিলার চোখ দুটো কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। মুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে গেলেন দেবসেনার সামনে। বললেন, 'কি মনে হয়, অর্জুন কথা বলবে তোমার সঙ্গে? আমাদের সকলকে তো বিনাবাক্যে ফিরিয়ে দিয়েছে সে। এমনকী তিনটে নাম করা উকিল নিয়ে গিয়েছিলাম, তাদেরও কিছু বলেনি। দেখা করতে গেলেও আমার বা ওর বাবার সামনে আসে না। আমরা ওই দূর থেকে দেখে চলে আসি। ওর ছোটমামা ছিল একেবারে ওর বন্ধুর মতো। সে-ও অনেকবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অর্জুনের ওই এক কথা, 'একবার ছেড়ে দাও আমায়, আমি ইন্দ্রাণীকে খুন করে আসব। কোনো অধিকার নেই ইন্দ্রাণীর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার। এরপরে কে ওকে মুক্ত করবে বলো তো মা?'

দেবসেনা আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আপনি ইন্দ্রাণীকে চিনতেন? আলাপ ছিল?'

অদিতিদেবী ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, চিনতাম তো। প্রায়ই আসত এই বাড়িতে। অর্জুন না থাকলেও আসত। ও-ই ঘর গুছিয়ে রেখে, আমার সঙ্গে গল্প করে বাড়ি যেত। ওদের তো বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। শপিং শুরুর পরে এসব ঘটল।'

দেবসেনা বলল, 'ইন্দ্রাণী এখন কোথায়?'

অদিতিদেবী একটু আক্ষেপের গলায় বললেন, 'আমাদের কপালে ভালো বউ নেই। তাই হল না। ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ওর হাজবেন্ডকে হয়তো

আপনি চিনবেন। অর্জুনের অফিসেই চাকরি করত, এই তো বছর দুয়েক আগে ওর 'বৃষ্টি নামার পরে' বইটা বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছে। রণজিৎ চক্রবর্তী। ছেলেটাও এসেছিল কয়েকবার আমাদের বাড়িতে অর্জুনের সঙ্গে। ইন্দ্রাণীর আর কী দোষ! আমাকে ফোন করে অনেক কেঁদেছিল। বলেছিল, 'আন্টি তোমাকে আমার আর মা বলা হল না। আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।' আমিও বলেছিলাম, 'বিয়ে করে নে তুই। আমার কপালে তোকে বরণ করা নেই।'

দেবসেনা বলল, 'আমি কি একবার অর্জুনের ঘরে যেতে পারি?'

অদিতিদেবী বললেন, 'হ্যাঁ এসো। আমি রোজ যাই সন্ধেতে একবার করে। ওর বাবাও ঢোকে আমাকে লুকিয়ে রাতের দিকে। অফিসের বাইরে বাকি সময়টা তো এই ঘরেই কাটাত।'

দেবসেনাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে অদিতিদেবী চা করতে গেলেন। ঘরটা খুব দ্রুত, ভালো করে খুঁজে ফেলল দেবসেনা। বড় ঝোলা ব্যাগে বেশ কিছু জিনিস ঢুকিয়ে নিল। কাজ মিটে গেলে ক্ষমা চেয়ে ফেরত দিয়ে যাবে না হয়। কিন্তু এখন অর্জুনের মাকে বলতে গেলে অনেকগুলো প্রশ্ন আসবে।

ভদ্রমহিলা চায়ের ট্রে নিয়ে এসে টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন, 'ঘরকুনো, একটা শান্ত ছেলে যে কাউকে খুন করতে যেতে পারে, মা হয়ে এটাই তো আমার কাছে সব থেকে অবিশ্বাস্য লাগছে।'

দেবসেনা চায়ে চুমুক দিতে দিতেই দেখল অদিতিদেবী চোখ মুছলেন। চার বছরে চোখের জল কমেছে। কিন্তু শুকিয়ে যায়নি।

দেবসেনা বাইরে বেরিয়ে এসেই ছুটল। বেশ কয়েকটা অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে ওকে খুব দ্রুত।

'খুব সাবধানে কথা বলবে দেবসেনা। তোমার জেদের কারণে এই বিষয়টাতে রাজি হলাম।' দেবদুলালকাকু নিজের প্যাডে লেখা চিঠিটা ওর

হাতে দিতে দিতে সাবধান করলেন।

বুকের ভিতর লাবডুব শব্দটা যে দ্রুতগতি হয়েছে সেটা বেশ টের পাচ্ছে দেবসেনা। জেলের একজন কনস্টেবল ওর সঙ্গে আছে। দু'দিকের গরাদের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছে বিভিন্ন অপরাধীদের। কেউ চুপচাপ বসে আছে। কেউ গল্প করছে। কেউ উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে কংক্রিটের দেওয়ালের দিকে।

অর্জুনের কারাগারের সামনে গিয়ে থামল কনস্টেবল। বেশ জোরেই বলল, 'অর্জুন রায়, এদিকে এসো। একজন দেখা করতে এসেছে।'

ভিতরের অল্প হলদে আলোয় দেবসেনা দেখতে পেল, অর্জুন কিছু একটা লিখছে ডায়রিতে। ওর ঘরে আর কেউ নেই। ও একাই আছে। বাকি দুজনের নাকি ছুটি হয়ে গেছে।

অর্জুন একবার তাকাল বাইরের দিকে। তারপর নিস্পৃহভাবে আবার ডায়রির পাতায় মনোনিবেশ করল।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড বলল, 'ও তো কারোর সঙ্গে দেখা করে না ম্যাডাম। ওর বাবা, মা, উকিল সবাই এসে ফিরে গেছে। কারোর সঙ্গে কথা বলে না।'

দেবসেনা নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। এই মানুষটাকে সে গত একবছর ধরে চিনেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। বলতে গেলে ওর ধ্যান-জ্ঞান ছিল অর্জুন রায়কে চেনা।

দেবসেনা গার্ডকে ইশারায় থামতে বলে নরম গলায় বলল, 'সেদিন আমি নন্দনে ঢুকেছিলাম তাড়াহুড়ো করে। হাতঘড়ির কাঁটা জানান দিচ্ছিল আমি প্রায় মিনিট পনেরো লেট। ঠিক সেইসময় জুঁই ফুলের গন্ধ এসে ঝাপটা দিল আমার অনুভূতিতে। প্রবল ঝাঁকুনি খেলাম একজনকে দেখে। পরনে হলদে শাড়ি। আঁচলটা একটু যেন বেখেয়ালি, আলগা হাতখোঁপায় জড়ানো একটা

জুঁইয়ের মালা। কানে দুটো ঝুমকো। প্রথম দর্শনেই আমার মতো অকাব্যিক মানুষেরও মনে হল, হাজার বছর ধরে পথ হাঁটছি শুধু তোমারই অপেক্ষায়।

তুমি আমার ভাবনাকে আরেকটু উস্কে দিয়ে বললে, 'বসন্ত উৎসব কি শুরু হয়ে গেছে?' আমি এসেছিলাম নির্জনে একটা সিনেমা দেখব বলে। কিন্তু সেই আসার কারণই আমি ভুলতে বসেছি। অমোঘ আকর্ষণে পিছু নিলাম তোমার। সেটা যে চৈত্র মাস ভুলে গিয়েই সর্বনাশের পথে পা বাড়ালাম। ভুললাম নিজের অস্তিত্ব। তখন শুধুই জুঁইয়ের গন্ধ আর হলদে শাড়ির আঁচলের টানে আমি আমাকে ছাড়া।'

দেবসেনা দেখল, উঠে দাঁড়িয়েছে অর্জুন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ভয় করছে ওর। যদি সাকসেসফুল না হয়। যদি এরপরেও কথা না বলে অর্জুন। তাহলে তো নিজের কাছেই হেরে যাবে ও। হেরে যাবে ওর মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা। শতরূপকে ও আগের অবস্থা থেকে বের করে আনতে পারলেও মানসিকভাবে সুস্থ করতে পারেনি, এই ব্যর্থতা ওকে ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত করে চলে। শতরূপের নোংরা অসুস্থ মনটাকে পাল্টাতে পারেনি বলে নিজেকে ব্যর্থ মনে হয় মাঝে মাঝে, আবার আরেকটা হার দেবসেনার মনোবল ভেঙে দেবে চিরতরে। তাই এই লড়াইয়ে ওকে জিততেই হবে। অর্জুন রায়কে দিয়ে স্বীকার করাতেই হবে কেন সে ইন্দ্রাণীকে খুন করতে গিয়েছিল।

অর্জুন রায় এগিয়ে আসছে ওর দিকে। লোহার রডের ওপরেই দেবসেনার হাতদুটো স্পর্শ করল অর্জুন। দুটো গাল বেয়ে জল পড়ছে। না কামানো দাড়ি ভিজে যাচ্ছে। কথা বলার অভ্যেস নেই বলেই হয়তো ঠোঁটটা নড়ছে শুধু।

দেবসেনা থামল না। বলেই চলেছে, '...যেদিন আমি বুঝলাম, কড়ে আঙুলে আঙুলে ছুঁয়ে গেলে ঝগড়া হয় না, ভাব হয়...সেদিন থেকে রাতের মাধবীলতা ফুলেরও গন্ধ পেলাম আমি। জানো রানি, আমার এই বদলটা শুধু

যে আমি একা অনুভব করতে পারছিলাম, তা নয়। আমার আশেপাশে থাকা অনেক মানুষই টের পেয়েছিল আমার পরিবর্তনটুকু।

অন্যমনস্ক আমিটা ভুলে যাচ্ছিল নিত্যদিনের হিসেব-নিকেশ। শুধু মনে রেখেছিল আমাদের তৃতীয়বার দেখা হওয়ার দিনটাকে। রবিবার মধুসূদন মঞ্চের নাটক দেখা ছাড়া এ পৃথিবীর বাকি সব কাজ আমার কাছে বড় তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল রানি। না, না তুমি শুধু একে ভালোলাগা বলে তুচ্ছ করতে পারো না।' ডুকরে ডুকরে কাঁদছে অর্জুন রায়। ফুলে উঠছে প্রায় ছয় ফিট লম্বা মানুষটার বুকের পেশী। দেবসেনার দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, 'আপনি কে? কী করে জানলেন?'

দেবসেনা বলল, 'আপনার লেখা পড়েছি। আসল পাণ্ডুলিপি পাইনি ঠিকই। কিন্তু আপনি বারবার যেগুলো লিখেছেন আর নীচে বাতিল বলে বাদ দিয়েছেন সেগুলোকে যত্নে তুলে এনেছি আমি। কিন্তু সব বাদ তো দেননি আসল বই থেকে।'

অর্জুন রায় বলল, 'আপনি কে?'

দেবসেনা শান্ত গলায় বলল, 'যদি বলি শুধুই জানতে চাই আমি অর্বাচীনকে, সাহায্য করবেন? নিজেকে অর্বাচীন বলেই তো পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন আপনার উপন্যাসে তাই না? আপনার নায়িকা রানি, আর আপনি শুধুই অর্বাচীন।

আমি কাল সারারাত ধরে পড়লাম আপনার 'বৃষ্টি নামার পরে' উপন্যাসটা।

অর্জুন আচমকা খসখসে আওয়াজে চিৎকার করে বলল, 'ওটা আমার লেখা নয়। আপনি জানেন না। ওটা ইন্দ্রাণীর স্বামী লেখক রণজিৎ চক্রবর্তীর লেখা।'

দেবসেনা দৃঢ় স্বরে বলল, 'আমি জানি ওটা আপনার লেখা উপন্যাস। আপনার আর ইন্দ্রাণীর প্রেমকাহিনি। আমি দেখেছি আপনাদের অ্যালবামটা। নন্দন, প্রিন্সেপ ঘাট, শান্তিনিকেতনের খোয়াইয়ের ধারে আপনাদের অসংখ্য ছবি আছে। ঠিক ওই বর্ণনাগুলোই আছে আপনার 'বৃষ্টি নামার পরে' উপন্যাসে। আপনার ডায়রির পাতায় বেশ কিছু লাইনের নীচে বাতিল লিখে রেখেছিলেন, সেগুলোও পেয়েছি আমি ওই উপন্যাসে হুবহু। এবারে আমায় শুধু বলুন, কেন ওটা রণজিৎ চক্রবর্তীর নামে প্রকাশ পেল? কেন সে লেখক হিসেবে বঙ্কিম পুরস্কার পেল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন আপনি অর্জুনবাবু। বাকি আপনার আর ইন্দ্রাণীর সবটুকু আমার পড়া কমপ্লিট।'

অর্জুন নিজের গালটা মুছে নিয়ে বলল, 'আমি জানি না। আপনি যান এখান থেকে। কিছু বলব না আমি। 'বৃষ্টি নামার পরে' উপন্যাসের লেখক আমি নই। আমি নই।'

গার্ড বলল, 'ম্যাডাম, আপনি এখন আসুন।'

দেবসেনা একপা দুপা করে পিছোতে পিছোতে বলল, 'এমন একজন প্রেমিকা চাই যে নদীর মতো ঘিরে রাখবে আমায়।

এমন একজন প্রেমিকা চাই যে নিজে এলোমেলো হয়েও গুছিয়ে নেবে আমায়।

এমন একজন প্রেমিকা চাই যে ভালোবাসার সমার্থকে বসাবে আমাকে।

এমন একজন প্রেমিকা চাই যার সামনে দোষ করলেই ধরা পড়ার ভয়ে চলবে আমার লুকোচুরি।

রানি তুমি আমার সেই প্রেমিকা হবে? আমার প্রেম আজীবন নতজানু থাকবে তোমার দ্বারে।'

পিছন থেকে অর্জুন ডেকে উঠল, 'দাঁড়ান, যাবেন না।'

দেবসেনা এগিয়ে এসে আবার বলল, 'প্লিস হেল্প মি অর্জুন। আমাকে হারিয়ে দেবেন না। আমি জিততে চাই।'

অর্জুন ফিসফিস করে বলল, 'এমন একজন প্রেমিকা চাই যার চুলে বুনো ফুলের গন্ধ পাব, কাছে যেতে ভয় পাব, পাছে ভেসে যাই!'

দেবসেনা বলল, 'দেখেছেন আপনার 'বৃষ্টি নামার পরে' উপন্যাসে রানিকে অর্বাচীন ঠিক এই কবিতাটাই শুনিয়েছিল। সেই কবিতার শেষ লাইনটা আপনার এখনও মনে আছে।'

অর্জুন বলল, 'ইন্দ্রাণী বলুন। রানি নয়। রানি মরে গেছে।'

দেবসেনা বলল, 'রানি হওয়ার যোগ্যতা ইন্দ্রাণীর কোনোদিনই ছিল না অর্জুনবাবু। কিন্তু ইন্দ্রাণী কেন আপনার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা রণজিৎকে দিল সেটা একটু বলবেন প্লিস?'

অর্জুন বলল, 'জানি না। আমি জানতেও পারিনি কবে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে রণজিতের এমন গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সবটাই ঘটেছিল আমার আড়ালে। ইন্দ্রাণী ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেয়নি আমায়। আমিই ওদের পরিচয় করিয়েছিলাম। রণজিৎ কবিতা লিখতে ভালোবাসত। ইন্দ্রাণী ওর বেশ কয়েকটা কবিতা আবৃত্তি করেছিল। সেই থেকেই অল্প বন্ধুত্ব হয় ওদের মধ্যে। সেটা যে কবে এতটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল আমি জানতাম না বিশ্বাস করুন। আমি ওকে পাগলের মতো বিশ্বাস করেছি। ওকে নিয়ে এঁকেছি আমার প্রথম উপন্যাস। যেটাতে কল্পনার মাত্রা ছিল খুবই কম। ও নিজেও জানত, ওটা আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের দিনপঞ্জি। না, ওটা আমি কোনো প্রকাশককে দিতাম না। বই আকারে প্রকাশিত হত না ওটা। আমার হাতে লেখা ওই পাণ্ডুলিপিটাই হত আমাদের বিয়েতে আমার তরফ থেকে ইন্দ্রাণীকে দেওয়া উপহার। বিশ্বাস করুন, আমি বেচতে চাইনি ওই উপন্যাস। আমি কোনো লেখক নই। শুধুই নিজস্ব অনুভূতিটুকু ডায়রি বন্দি করে

রেখেছিলাম। ইন্দ্রাণীকে প্রথম স্পর্শের মুহূর্তটুকুও খুব যত্নে লিখেছিলাম। সেটাও ইন্দ্রাণী এভাবে বিক্রি করে দিল?' দেবসেনা বলল, 'কিন্তু আপনাদের তো বিয়ে ঠিক হয়েই গিয়েছিল, তারপর ঠিক কী ঘটেছিল?'

গলাটা বোধহয় শুকিয়ে এসেছে অর্জুনের। দীর্ঘ কয়েকবছর পরে ও এত কথা বলছে একসঙ্গে। অর্জুন বলল, 'বিয়ের যে খুব ইচ্ছে ছিল ইন্দ্রাণীর তা নয়। কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা ততদিনে দুই বাড়িতে জানাজানি হয়ে গেছে। তাই নিমরাজি হয়েছিল। শপিংয়ে যাব বলে রেডি হচ্ছিলাম আমি। হঠাৎই ইন্দ্রাণী আর রণজিৎ একসঙ্গে এসেছিল আমাদের বাড়িতে। আমি ওদের দুজনকে দেখে একটু চমকে গেছিলাম। রণজিৎই বলল, 'চল আমার সঙ্গে, তোদের জন্য একটা উপহার আছে।'

রণজিতের গাড়ি করে গেলাম ওর ফ্ল্যাটে। ও আমার হাতে তুলে দিল গাঢ় নীল কভারে মোড়া 'বৃষ্টি নামার পরে' উপন্যাসটা। বলল, 'তোদের বিয়ের উপহার আমার তরফ থেকে।' ওপরে জ্বলজ্বল করছে রণজিৎ চক্রবর্তীর নাম।

আমি বলেছিলাম, 'তুই তো কবিতা লিখতিস, উপন্যাস কবে লিখলি?' বলতে বলতেই প্রথম পাতা উল্টেই চমকে গিয়েছিলাম। এ তো আমার পাণ্ডুলিপি! আমি নাম দিয়েছিলাম, 'যখন বর্ষা নামল'। নামটা পরিবর্তন করে দিয়েছে। হুবহু এক লেখা। পাতার পর পাতা আমার একান্ত নিজস্ব অনুভূতি।

রণজিৎ হেসে বলল, 'কেমন লাগল আমার সারপ্রাইজ? দেখ ভাই, বইটা হট কেকের মতো বিক্রি হচ্ছে মার্কেটে। দশদিনে ফার্স্ট এডিশনের একহাজার কপি শেষ।'

আমি রাগে কাঁপছিলাম। ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'এর অর্থ কি?'

ইন্দ্রাণী একটু ভয় পেয়েই বলেছিল, 'তুমি তো লেখক নও। তুমি তো ডায়রি বন্দি করেই রেখে দিতে। রণজিৎ লেখক। ও প্রকাশ করলে ক্ষতি

কী?'

আমি দেখেছিলাম চোখের সামনে কালো অক্ষরে উড়ছে আমার গোপন অনুভূতিগুলো। বাজারে নাকি বিক্রি হচ্ছে এগুলো। বুঝেছিলাম, ইন্দ্রাণী আমার ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে পাণ্ডুলিপি। ও প্রায়ই এসে ঘর গুছিয়ে দিত। তখনই চুরি করেছে। রাগে অন্ধ হয়ে আমি ওর গলা টিপে ধরেছিলাম। তখনই ও বলেছিল, 'আমি রণজিৎকে ভালোবাসি।'

আমি আরও চমকে উঠে ছেড়ে দিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু খুব চেয়েছিলাম ওকে মেরে ফেলতে। এমন বিশ্বাসঘাতকের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। আমার অফুরন্ত ভালোবাসার ও এভাবে অমর্যাদা করবে আমি কল্পনা করতে পারিনি। ভাবতে পারছেন, আমার সমস্ত অনুভূতিগুলো আর ব্যক্তিগত রইল না। সব বাজারে বিক্রি করে দিল ও।

ওখান থেকে বেরিয়েই ও আর রণজিৎ কেস করে আমার নামে। আমি অ্যারেস্ট হই। আমি বেশ ভালো আছি। আমার বাইরে বেরোনোর ইচ্ছে নেই। ওখানে শুধুই বিশ্বাসঘাতকদের ভিড়। এখানে অন্ধকারে আমি একলা বেশ ভালো আছি। কেউ মিথ্যে করে বলে না, সে আমাকে আজীবন ভালোবাসবে।'

অর্জুন আবার চলে গেল নিজের জায়গায়।

দেবসেনা ফিরে এল নিজের বাড়িতে। অর্জুনকে জেল থেকে জামিন করাতে হবে। এটা ভাবতে-ভাবতেই চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল ওর। স্বপ্নে দেখল শতরূপ হাসছে। বিশ্রীভাবে হাসছে। বলছে, 'একটা জেলে থাকা আসামি যে তার প্রেমিকাকে খুন করতে গিয়েছিল, সে তোর প্রেমিক দেবী? বাহ্, ভালো চয়েস তোর, কংগ্রাচুলেশন। জেল ফেরত আসামি তোর প্রেমিক দেবী?'

শতরূপের বিকৃত হাসিটা দেখে চমকে উঠল ও। ঘুমটা ভেঙে গেল। কানের কাছে অর্জুনের কথার অনুরণন। অর্জুন বলছে, ‘এখানে বেশ ভালো আছি। বাইরে বিশ্বাসঘাতকের ভিড়।’

দেবসেনা ফিসফিস করে বলল, আমি আগামীকাল আবার আসব।

অর্জুন হ্যাঁ বা না কিছু না বলেই নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

দেবদুলালকাকুও যথেষ্ট অবাক হয়েছেন অর্জুন এত কথা বলেছে শুনে। যে ছেলে গত চার বছরে একটাও কথা বলেনি তাকে দিয়ে এত কথা বলাল কী করে দেবসেনা!

মোবাইলের রেকর্ডিং অপশনটা বন্ধ করে দেবসেনা বলল, ‘কাকু এটা হয়তো আমি অন্যায় করলাম। ওঁর পারমিশন না নিয়ে ওঁর কথাগুলো লুকিয়ে রেকর্ড করা আমার অনুচিত হয়েছে। কিন্তু আমি নিরুপায় ছিলাম। হয়তো দেখা গেল পরের দিন আর কথাই বলছেন না। তাই প্রথম সুযোগেই ওঁর কথাগুলো আমি রেকর্ড করে নিয়েছি।’

দেবদুলালকাকু বললেন, ‘কিন্তু দেবসেনা, ও কি উকিলকে এসব বলবে?’

দেবসেনা হেসে বলল, ‘কাকু যদি ইন্দ্রাণী নিজেই এই কেসটা তুলে নেয় তাহলে কি আর এতকিছুর দরকার হবে?’

দেবদুলালকাকু ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, ‘ব্রিলিয়ান্ট।’

স্টুডিওর সামনে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছে দেবসেনা। ইন্দ্রাণীর নাকি কবিতার রেকর্ডিং চলছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হন্তদন্ত হয়ে বেরোল ইন্দ্রাণী। ওকে দেখেই ভিতরে বিজবিজ রাগটা অনুভব করল দেবসেনা। এই অসভ্য মেয়েটা অর্জুনের রানি? এত ভুল মানুষ করে কী করে! অবশ্য শতরূপকে বেস্টফ্রেন্ড ভেবে ভুল তো ও নিজেও কিছু কম করেনি। আসলে মানুষের গোটা জীবনটা একটা শিক্ষাক্ষেত্র। শেষ দিন পর্যন্ত শুধু শিখেই যেতে হয়।

ইন্দ্রানীকে দেখেই অর্জুনের বইয়ের কয়েকটা লাইন মনে পড়ে গেল। ‘কোনো এক তপ্ত দুপুরে যখন তোমার নাকছাবিকে ঘিরে বিন্দু বিন্দু বিরক্তিকর ঘামের উদয় হবে, তখন যদি আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে না দিই সেদিন তুমি রাগ করো রানি। এ তোমায় অধিকার।’

নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে দেবসেনা বলল, ‘হাই ম্যাডাম, আমি এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আপনি তো ভীষণ সুন্দর কবিতা বলেন শুনলাম। আমার একটা অডিওকে একটু সুন্দর করে পাঠ করে দিতে পারবেন? মানে অনেকগুলো অনুষ্ঠানে বাজবে ওই অডিওটা।’

ইন্দ্রাণী একটু ইতস্তত করে বলল, ‘আমি আবৃত্তি বা শ্রুতি নাটক করি। এভাবে আমার গলা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজানো হবে বলতে ঠিক ক্লিয়ার হল না।’

দেবসেনা বলল, ‘চলুন ওই টেবিলে গিয়ে বসি। ওটা বেশ ফাঁকা আছে।’

ইন্দ্রাণী এসে বসল দেবসেনার সঙ্গে। ফেমাস হওয়ার ইচ্ছে মানুষের রক্তে। হিউম্যান সাইকোলজি বলে, মানুষ সবসময় নিজেকে বিখ্যাত ব্যক্তি হিসাবে দেখতে চায়। টাকার থেকেও বেশি মূল্যবান সম্মান। তাই সম্মান পাওয়ার জন্য মানুষ সব করতে রাজি। ইন্দ্রাণীও তার ব্যতিক্রম নয়। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল, ‘এটা কি কোনো কোম্পানির প্রচার?’

দেবসেনা বলল, ‘আপনি আগে শুনেই দেখুন।’

অর্জুনের রেকর্ডিংটা চালিয়ে দিল দেবসেনা। ঠিক একমিনিট শোনার পরেই ইন্দ্রাণী লাফিয়ে উঠল।

‘কে আপনি, কী চান?’

দেবসেনা শীতল গলায় বলল, ‘অর্জুনকে মুক্ত করতে। আর আসল সত্যিটা জানতে।’

ইন্দ্রাণী ঘামছে। চোখ মুখে আতঙ্ক। তবুও স্টেডি থাকার চেষ্টা করে বলল, 'অর্জুন দোষী সাব্যস্ত হয়েই গেছে। ও নিজে স্বীকারোক্তি দিয়েছে ও আমায় খুন করতে গিয়েছিল। আর বৃষ্টি নামার পরে বইটা রণজিতের লেখা। এখন যে কেউ মিথ্যে বললেই তো চলে না!'

দেবসেনা ততধিক শান্ত গলায় বলল, 'যখন বর্ষা নামল'-র কিছু রাফ লেখা হাতে এসেছে আমার। আমি মিডিয়ায় খবর করব। আর অর্জুনের এই মিথ্যে কথাগুলো প্রচার করব চারিদিকে। দেখি কোথায় থাকে আপনার আর পুরস্কার বিজয়ী লেখকের ভাবমূর্তি। অর্জুনের দ্বিতীয় উপন্যাস, 'বরফ যখন উষ্ণ হল' খুব তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছে। দুটো লেখার ধরন যে একইরকম এটা প্রমাণ করতে আমার বিশেষ কষ্ট হবে না।'

দেবসেনা উঠে দাঁড়াল। ইন্দ্রাণী কুঁকড়ে গেছে। মিথ্যে নিয়ে যে লড়াই করা যায় না সেটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে।

ইন্দ্রাণী কাকুতিমিনতি করে বলল, 'আমায় এখন কী করতে হবে?'

দেবসেনা বলল, 'কালকে গিয়ে কেসটা উইথড্র করুন। তারপর ভেবে দেখছি।'

অর্জুন রায় ছাড়া পেয়েছে। ইন্দ্রাণী অর্জুনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আর রাখতে চায় না—এমন একটা বয়ান দিয়েছে। অর্জুন রায়ের মুক্তি পাওয়ার দিনে দেবসেনা যায়নি।

আর দেখা না হওয়াই ভালো। গত সাত-আটদিন অর্জুনের সঙ্গে জেলে দেখা করে আর গল্প করে নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক দুর্বলতা লক্ষ করছে দেবসেনা। ও নিজে কোনো সম্পর্কের বন্ধনে জড়াতে চায়নি কোনোদিন, সেই দেবসেনাই ওর মধ্যে একটা অস্থিরতা টের পেয়েছে। অর্জুনের প্রতি এই অহেতুক দুর্বলতার নাম কি প্রেম? নাকি অন্য কিছু! তাই আর অর্জুনের মুখোমুখি হবে না এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্জুনের মা দেবসেনাকে ফোন

করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। মনে মনে ভেবেছে ভালো থাকুক অর্জুন। আর মায়া বাড়িয়ে কী হবে!

দিনসাতেক পর পর দেবসেনা গিয়েছিল অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে। প্রতিদিনই একটু একটু করে জেনেছে অর্জুনকে। কতটা প্রবঞ্চিত হয়েছে ও, কতটা উজাড় করে ভালোবসেছে ইন্দ্রাণীকে—সবটুকু জেনেছে। ওর রিসার্চ পেপারের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এর বাইরেও যে অচেনা একটা অনুভূতির দোলাচল শুরু হয়েছে ওর মনের মধ্যে সেটার হদিস ও কিছুতেই পাচ্ছে না। অর্জুনের অ্যারেস্ট হওয়ার খবর এত মিডিয়া কভার করেছিল কেন এখন বুঝতে পারছে দেবসেনা। এটা রণজিতের কাজ। যাতে অর্জুন কোনোদিনই গলা তুলে না বলতে পারে ওই উপন্যাসটা ওর লেখা।

অর্জুন বাড়ি ফিরে এসেছে এই খবর ওর মা দিয়েছেন দেবসেনাকে। খুব ইচ্ছে করেছে দেবসেনার অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে। জেলের বাইরে মানুষটা কী করছে, জানতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু অবাধ্য মনকে আর একটুও বিশ্বাস করে না দেবসেনা। একটু একটু করে এই মনে অর্জুন আধিপত্য বিস্তার করছে। তাই এটাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

অর্জুনের নাম শোনার পর থেকে শতরূপ আর যোগাযোগ করেনি। নিজের মনেই হাসল দেবসেনা। যাক অর্জুন ওর একটা উপকারে তো লাগল। শতরূপের ইচ্ছাকৃত বদমাইসিগুলো হয়তো এবার কমল।

নিজেকে নিজের কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে দেবসেনা। কিন্তু বারবার সেই প্রথম দিনের কান্না ভেজা অর্জুনের মুখটা মনে পড়ছে। অর্জুন যখন ইন্দ্রাণী আর ওর প্রেমের দিনগুলোর কথা বলছিল, কেন কে জানে ভিতরে একটা ঈর্ষাজনিত কষ্ট হচ্ছিল। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। দেবসেনা এতদিন ধরে মানুষের মন নিয়ে পড়াশোনা করছে, অথচ নিজের

মনটাই নিজের কাছে বড্ড অচেনা লাগছে। তবুও দিন কাটছিল, সময়ের যেহেতু সময় নেই থামার তাই এগিয়ে চলেছিল নিজের গতিতেই।

নিজের রিসার্চ পেপারগুলো নিয়ে গুছিয়ে বসেছে আজ। প্রায় দিন দশেক নিজেকে সময় দেওয়া হয়নি। কেমন যেন ওলটপালট হয়েছিল সবকিছু।

বাবা অফিস বেরিয়ে যাওয়ার আগেই বলে গেছে, 'অনেক হয়েছে, এবারে পেপারস রেডি করো।'

মা গেছে ছোটমাসির বাড়ি।

বাড়িতে একাই আছে দেবসেনা। নিজের ঘরে বসে ফাইলগুলো খুলেছে। বেলটা বেজে উঠল। মা ফিরবে সন্ধেতে। বাবাও তাই। কে এল? শতরূপ নয় তো? ইদানীং আর ফোন করে না শতরূপ। তাই কিছুটা নিশ্চিন্তে আছে ও। আইহোল দিয়ে বাইরে তাকাল দেবসেনা। বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। ও কি ঠিক দেখছে? নাকি ওর অবচেতন মনে ভাবনার ফসল?

আবারও বেলটা বাজল।

দরজাটা খুলতেই একটু লাজুক মুখে অর্জুন বলল, 'আপনার ঠিকানাটা মায়ের কাছ থেকে পেলাম। আপনাকে একটা থ্যাংকস জানানোর ছিল। আমি আমার পুরোনো কোম্পানি ছেড়ে দিয়েছি। নতুন একটা জব জয়েন করেছি আজকেই। তাই ভাবলাম আপনাকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে আসি।'

দেবসেনা কাঁপা গলায় বলল, 'আসুন প্লিস।'

অর্জুন ওদের সোফায় বসে বলল, 'আর কেউ নেই বাড়িতে?'

দেবসেনা ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, বাবা আর মা দুজনেই বেরিয়েছে।'

অর্জুন হেসে বলল, 'ভয় নেই। জেল ফেরত আসামি হলেও আমি খুনি নই। পৃথিবীর কারোর ওপরে আমার ঘৃণা নেই। এমনকী রণজিতের ওপরেও নেই। শুধু ওই একজনকেই আমি ঘৃণা করি। তাই আমায় ভয় পাবেন না প্লিস। আপনার চোখ-মুখ একটু কেমন যেন লাগছে আজকে। যখন জেলে

যেতেন তখনকার মতো নয়। একটু বোধহয় নার্ভাস হয়েছেন আমায় বাড়িতে দেখে!'

দেবসেনা কী করে বলবে ওকে যে, এই ক'দিনের ওর সমস্ত নিজস্ব মুহূর্ত জুড়ে শুধু অর্জুনেরই আনাগোনা ছিল। অনেক কষ্টে অবাধ্য মনটাকে শাসন করে রেখেছে বলেই হয়তো মুখে তার ছাপ পড়েছে।

দেবসেনা বলল, 'আমি ভয় পাচ্ছি না। আপনি শরবত খাবেন?'

অর্জুন ঘাড় নেড়ে বলল, 'না। আমি আপনাকে একটা জিনিস দিতে এসেছি। বলতে পারেন আবার আমায় আলোর দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনার উপহার মাত্র।'

দেবসেনা বলল, 'উপহার কেন? আমি তো সেভাবে কিছুই করিনি।'

অর্জুন একটা হালকা সবুজ ডায়রি ওর হাতে ধরিয়ে বলল, 'জেলের শেষ সাতদিনের অভিজ্ঞতা লেখা আছে এতে। যদি আপনার রিসার্চের কাজে লাগে, পড়ে দেখবেন।'

উঠে দাঁড়াল অর্জুন। দেবসেনা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে ওই নিষ্পাপ প্রেমিকের চোখের দিকে। খুব ইচ্ছে করছে অর্জুনের হাতটা ধরে বলতে, আরেকটু বসো প্লিস। না কিছুই বলা হল না দেবসেনার। অর্জুন যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনই চলে গেল।

দেবসেনা কচিপাতা রঙের ডায়রিটা খুলল।

প্রথম লাইনেই লেখা আছে, 'অন্ধকার, কী ভীষণ অন্ধকার এই বদ্ধ জীবন। তবুও বেশ ভালো লাগে আমার কারণ বাইরে বেরোলেই আবারও বিশ্বাসঘাতকদের ভিড়। আমি কোনোদিন বেরোতে চাইনি এখান থেকে। কিন্তু সে হঠাৎই এল। আমাকে ছুঁয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। আমাকে জিতিয়ে নিজের জিততে চাওয়ার আকুতি কাঁপিয়ে দিল আমার অন্তরাত্মা। কে ও? আমি তো চিনি না ওকে। অচেনা কারোর জন্য কেউ এমন করে ভাবে?

দেবসেনা, ওর নাম দেবসেনা। আমাকে আবার বাঁচার প্রেরণা জোগাল। নারী শব্দটাতেই তীব্র ঘৃণা জন্মেছিল। মাত্র দু'দিনেই সেই ঘৃণা থেকে হাত ধরে টেনে বের করে আনল আমায়। আমি এখন দেবসেনার হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছি। ও যেদিকে নিয়ে যাবে এই জলে ডোবা তরীকে, সেদিকেই যাব আমি। দেখি না কোনদিকে নিয়ে যায় দেবসেনা আমায়।

দেবসেনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আজ তৃতীয় দিন। আজও আসবে বলেছিল। আমার ভীষণ অস্থির লাগছে। কেন এখনও আসছে না মেয়েটা! তবে কি আমায় ছেড়ে চলে গেল! ওই তো দেবসেনা এসেছে। আকাশনীল রঙের চুড়িদারে ঠিক যেন নরম শরৎ। এগিয়ে আসছে দেবসেনা। আমার হৃৎপিণ্ড এমন দ্রুতগামী কেন হচ্ছে! এ তো শুধু ইন্দ্রাণীকে দেখেই হত। আর তো কখনও কোনো নারীকে দেখে এমন হয়নি। তবে কি আমি দেবসেনাকে...না না, আমি একজন আসামি। দেবসেনা আমায় বাঁচাতে চায় মাত্র।

আজ আমার ছুটি হবে। নিশ্চয়ই দেবসেনা আজ থাকবে। দাড়ি কেটে দিয়েছে আজ। বহুদিন পরে দাড়ি কাটলাম আমি। দেবসেনা দেখে চিনতে পারবে তো!

বাবা, মা, ছোটকাকা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। দেবসেনা তো আসেনি। কষ্ট হচ্ছিল আমার। ভীষণ কষ্ট। ইন্দ্রাণীকে হারানোর থেকেও কয়েকগুণ বেশি। তবে কি দ্বিতীয় প্রেমের অস্তিত্ব আছে এই পৃথিবীতে?'

ডায়রির পাতাগুলো ভিজে যাচ্ছে। আর পড়তে পারছে না দেবসেনা। ওকে নিয়ে লিখেছে অর্জুন। না, এটা বই হিসাবে ছাপা হবে না। এ ওর একান্ত নিজের।

ফোনটা ডায়াল করল দেবসেনা। অর্জুনের মোবাইল নম্বর। ওর ডায়রির শেষ পাতায় লেখা।

ফোনটা রিং হচ্ছে।

'দেবসেনা আমায় তুমি ভুল বুঝো না। আমি দুশ্চরিত্র নই, আমি নারীতে আসক্ত নই। তবে আমার সমস্ত অনুভূতি নিঃশেষ করে দিলাম তোমায়। আমি আজ রিক্ত, শূন্য। ভালোবাসার মতো কিছুই অবশিষ্ট রইল না আমার কাছে। বুঝলাম, যাকে ভালোবাসার পরে নিজের বলে আর কিছুই থাকে না, সেটাই প্রেম।

না না, আমি তোমার কোনো উত্তর চাইনি। তুমি কেন একজন আসামিকে ভালোবাসবে? তবে এই অনুভূতিটুকু লিখতে ইচ্ছে হল। ভালো থেকো দেবসেনা।'

ফোনটা বেজে বেজে কেটে গেল। শেষ লাইনগুলো পড়তে পড়তে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল দেবসেনা।

আবারও ফোন করল ও। অর্জুন ফোনটা রিসিভ করে বলল, 'উঁহু, প্লিস কিছু বলো না। আমি কিছুই চাই না তোমার কাছে। শুধু অপমান করো না প্লিস।'

দেবসেনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'ভালোবাসি, ভালোবাসি।'



বৃষ্টি নামার পরে

'রেশমা, তুমি দিনরাত এই এক কথা বলে যাচ্ছ কেন বলবে? এই পৃথিবীতে তো এমন অনেক নিঃসন্তান বাবা-মা আছে, তারা কি কেউ সুখী নয়? বিয়ের ছয় বছর পেরিয়ে গেছে, বাচ্চা হল না এটাই কি আমাদের জীবনের মুখ্য আলোচনা? ডিউটি থেকে ফিরে তোমায় রোজ মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখলে কি আমার ভালো লাগে বলো?'

পুলিশের ইউনিফর্মটা খুলতে খুলতে আনোয়ার আবারও বলল, 'এত ভালো নজরুলগীতি গাইতে তুমি সেটাও বন্ধ করে দিলে, কেন এমন করছ রেশমা? তোমার চোখে বর্ষার মেঘ দেখলে আমার যে কতটা কষ্ট হয় সেটা তোমায় আমি বোঝাতে পারব না। যতই হোক পুরুষমানুষ তো তাও আবার পুলিশে আছি, তাই হয়তো তোমার ধারণা দুঃখ-কষ্ট কিছুই আমায় ছুঁতেই পারে না।'

রেশমা ব্যালকনি থেকে উঠে রান্নাঘরের দিকে গেল। রাতের রান্না অনেকক্ষণ সেরে রেখেছে। আনোয়ার এই সময় বাড়ি ফিরে আগে এককাপ

ঘন দুধের চা পছন্দ করে। রোজকার মতো আজকেও রেশমা রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাসে জল চাপাল। আনোয়ার বলে, ‘বুঝলে রেশমা, আমরা হলাম খাঁটি বাঙালি। জন্মকর্ম সব এই পশ্চিমবঙ্গে। তাই একদিন ওই শখের রেস্টুরেন্টে বসে ব্ল্যাক কফি উইদাউট সুগার বলতে ভালো লাগলেও আসলে মনটা কড়া করে চা-চা করে। আর সারাদিন থানায় বসে চোর-জোচ্চোরদের সঙ্গে চেঁচামেচি করতে করতে আরেক জোচ্চরের চা খাই আমরা। আমাদের থানার সামনেই লক্ষ্মণের চায়ের দোকান। সে-ই এক ছোঁড়াকে দিয়ে ঘন্টায় ঘন্টায় চা পাঠায় আমাদের। ওই সকালে যে চা পাতা ইউজ করে ওটা দিয়েই রাত অবধি চা খাওয়ায় আমাদের। আমরাও চোর ধরতে ধরতে ওই ঘোড়ার হিসি খেয়ে নিই চাঁদ মুখ করে।’

রেশমা হেসে ফেলত আগে আনোয়ারের কথা শুনে। কলেজে থাকাকালীন আনোয়ার ছিল মুখচোরা একটা ছেলে। পুলিশে ঢোকার পর থেকে যত বাজে ভাষা ব্যবহার করে। রেশমা চোখ পাকালে বলত, ‘বেশ বেশ তোমার ছেলেমেয়ের সামনে বলব না বাবা। এখন থেকেই প্রমিস করছি।’

একটা দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে আবারও বেরিয়ে আসতে চাইছে, জোর করে তাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল রেশমা। সত্যিই তো মানুষটা সারাদিন পরে এসে যদি ওর এমন মুখ দেখে তাহলে তো রাগ হওয়ারই কথা। নিজেকে একটু স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল রেশমা। চায়ের সঙ্গে একটা বিস্কিটের বেশি আনোয়ার কিছু নেয় না এসময়। একটু পরেই রাতের খাওয়া। আনোয়ার বলে, ‘খিদে মেরে লাভ আছে? আমার বউয়ের হাতের রান্না মিস করতে রাজি নই আমি।’

মানুষটা সবসময় রেশমাকে খুশি করতে চায়। এ স্বভাব অবশ্য আনোয়ারের এখন থেকে নয়, সেই কলেজ লাইফ থেকেই। সেই লাজুক ছেলেটা তখন থেকেই রেশমাকে খুশি রাখার ঠেকা নিয়েছিল। সেই রীতি

এখনও চলছে। চায়ের ট্রে-টা সামনে রেখে রেশমা বলল, ‘আজ তোমার আম্মা ফোন করেছিলেন। কোন মাজারে গিয়েছিলেন, একটা তাবিজ এনেছেন। রশিদকে দিয়ে কাল পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন। ওটা শুক্রবার পরতে বললেন।’

আনোয়ার চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, ‘রেশমা, নিজের বাড়ি শিবপুর ছেড়ে এই গ্রামে আমি বদলি কেন নিলাম জানো? এসব থেকে তোমায় সরিয়ে রাখব বলে। এই কবচ, তাবিজ, জলপড়া, তেলপড়া এসব থেকে তোমাকে আগলে রাখতে চাই বলেই ট্রান্সফারের কথাতে একমিনিটও দেরি করিনি সিদ্ধান্ত নিতে।

ভেবেছিলাম হোক গ্রাম, হোক জাঁকজমকহীন জীবন, তুমি তো থাকবে আমার কাছে। আর বাড়ির ওই সকলের বলা একই কথার পুনরাবৃত্তি তো হবে না। কিন্তু দেখো এ বিষয়টা আমার কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। আচ্ছা রেশমা, তুমি যে এই বিক্রমপুরে এসেছ এখানের কিছু দেখেছ তুমি?’

রেশমা অন্যমনস্কভাবে বলল, ‘এটা তো হিন্দু গ্রাম। মোড়ে মোড়ে একটা করে মন্দির আছে। শিবমন্দির, মনসাতলা এসব। আর ওদিকে একটা প্রাইমারি আর হাইস্কুল। লাইব্রেরিতে বই হাতে গোনা। আর কী দেখার আছে?’

আনোয়ার বলল, ‘সে কী! এখানে সন্ধে হলেই যে জোনাকি নামে দেখোনি?

জোনাকির কাছ থেকে এক টুকরো আলো তো চেয়ে রাখতে পারতে আমার জন্য।

ওই যে গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা নদী আছে, নদীর নাম নাকি ব্রজেশ্বর। বর্ষায় বড্ড দামাল হয়। ওই মাতাল নদীটাকে তুমি শান্ত হতেও বলতে পারতে।’

রেশমা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'ভালোবাসলে বুঝি সবসময় একটা সত্যিকে আড়াল করে রাখতে হয়?'

আনোয়ার বলল, 'কোনটা সত্যি রেশমা? আমাদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই বা আল্লা আমাদের সন্তান দিচ্ছেন না। এটাই তো?'

রেশমা বলল, 'আমাদের নয়। আমার সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই। সেটা স্বীকার করতে তোমার এত দ্বিধা কেন?'

আনোয়ার বলল, 'বেশ, মেনে নিলাম তোমার শারীরিক সমস্যা। তাহলে এখন আমায় কী করতে বলছ রেশমা?'

রেশমা জানালার ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দ্বিতীয়বার বিয়ে করো। আমায় তালাক দাও।'

আনোয়ার হো-হো করে হেসে বলল, 'তাই নাকি? আজকাল আমার রেশমার দেখি খুব সাহস হয়েছে। আগে তো একা একা সন্ধের টিউশন থেকে ফিরতে সে ভয় পেত, এখন একা-একাই সে এমন চলতে শিখে গেল যে আমায় ছেড়ে দিতে চাইছে? তা বেশ। উন্নতি হওয়াই তো ভালো।'

রেশমা আনোয়ারের পিঠে হাত রেখে বলল, 'তুমি জানো আমি কেন বলছি।'

আনোয়ার ভাঙা গলায় বলল, 'না রেশমা, আমি সত্যিই জানি না। আমার সেই কলেজের কথা মনে পড়ছে। তখন আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি। বাবার কাছে আবদার করে একটা বাইক কিনেছিলাম। মনে আছে?'

রেশমা অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'সে আর মনে না থাকার কী আছে? ওই বাইকে করেই তো আমায় বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে যেতে। একদিন ছোট কাকার নজরে পড়েছিলাম। সে কী বকুনি বাড়িতে ঢুকেই।'

আনোয়ার বলল, 'এই তো তোমার স্মৃতিও তার মানে তোমার সঙ্গে বেইমানি করেনি। সবই মনে আছে দেখছি। তবুও আরেকটা ঘটনার কথা

মনে করিয়ে দিই।

ওই বাইক চালাতে গিয়েই আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। গাড়ির কাঁচ এসে সোজা ঢুকেছিল ডান চোখে। সে তো এমন অবস্থা যে একটা চোখ হারাতে হবে এটাই ভেবেছিলেন ডক্টররা। আমার মা মাজারে গিয়ে পড়েছিল। বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছিল। কোনোমতে নিজেকে সামলে রেখেছিল। দাদা, দিদিরা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছিল। ছোটবোনটা পর্যন্ত আমার পায়ের কাছে এসে বসেছিল।

আমি ল্যান্ড ফোনে তোমায় ফোন করলাম। তোমার আব্বু ফোন রিসিভ করলেন। আমি যথারীতি কেটে দিলাম। কথা হল না। একমাত্র দীপঙ্করকে ফোন করে জানালাম, রেশমা কলেজে এলে বলিস আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

রেশমা মুখ নীচু করে বসে আছে। স্মৃতির পাতাগুলো এসে যে তাকেও ঝাপটা দিচ্ছে না এমনটা তো নয়। রেশমা জানে এরপর আনোয়ার কী বলবে।

কলেজে যেতেই দীপঙ্কর ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'রেশমা, আনোয়ারের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সেজন্য কলেজ আসছে না।'

দিন তিনেক হল আনোয়ার আসছে না। ফোন করেছিল রেশমা ওদের ল্যান্ডফোনে। ওর দিদি ধরেছিল বলে কেটে দিয়েছে। কথাটা শুনেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল ওর।

দীপঙ্করকে বলেছিল, 'আমি কিছু জানতে চাই না, এখুনি নিয়ে চলো ওদের বাড়ি।'

তখনও রেশমা আর আনোয়ারের সম্পর্কের কথা কেউ জানত না দুই বাড়ি থেকে।

মুসলমান রক্ষণশীল পরিবার ওদের। তাই প্রেম করে বিয়ে করাটা কিছুজনের চোখে রীতিমতো গুনাহ। তবুও সেদিন রেশমার মাথায় এসব চিন্তা আসেনি।

দীপঙ্করের সঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিল আনোয়ারের বাড়িতে।

সবাই ওর দিকে অন্যরকম দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। কলেজে একসঙ্গে পড়লেও বাড়িতে মেয়ে বন্ধু আসা তখনও সেভাবে চল হয়নি আনোয়ারের বাড়িতে।

দীপঙ্করই বলেছিল, 'আমরা এক সঙ্গে পড়াশোনা করি। আনোয়ারের বাইক অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে আমরা ওকে দেখতে এসেছি।'

আনোয়ারের মা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। তিনি রেশমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে বলেছিলেন, 'ওই যে, ওই ঘরে আছে আনোয়ার।'

রেশমা আর দীপঙ্কর ঘরে ঢুকেছিল। আনোয়ারের একটা চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা। অপারেশন করতে হবে বলেছে ডক্টর। দু'দিন পরে ডেট দিয়েছে। ডক্টর বলেছেন, মাত্র ৩০% চান্স আছে চোখ ঠিক হওয়ার। হাতে-পায়েও টুকটাক ছিঁড়ে কেটে গেছে। সেখানেও ব্যান্ডেজ বাঁধা।

রেশমা একটাও কথা বলেনি সেদিন। শুধু চোখ দিয়ে অনর্গল জল গড়িয়ে পড়ছিল। আনোয়ার করুণ হেসে বলেছিল, 'কাঁদছ কেন? আল্লাকে ডাকো যেন চোখটা ফিরে পাই। তবে রেশমা, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

দীপঙ্কর ঘরের অন্য দিকে সরে গিয়ে ওদের একা করার চেষ্টা করেছিল।

আনোয়ার রেশমার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলেছিল, 'আমায় ভুলে যাও। যদি চোখে অন্ধ হয়ে যাই, একটা চোখে দেখতে হবে আজীবন। এমন খুঁতো ছেলেকে বিয়ে করে নিজের জীবনটা নষ্ট করতে তোমায় আমি দেব না, রেশমা। তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও।'

রেশমা নিজের অবাধ্য চোখের জলকে সামলে দাঁত চেপে শুধু বলেছিল, 'সরে যেতে হলে নিজের জীবন থেকেই সরে যাব। আর যদি এ পৃথিবীতে

থাকতে হয় তাহলে তোমার সঙ্গেই পথ চলব।’

আনোয়ার খুব ভালো করে চিনত রেশমাকে। তাই এই মেয়ের জেদ যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটা ও জানত। কিন্তু রেশমাকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে আনোয়ার। তাই এমন এক চোখ অন্ধ ছেলেকে বিয়ে করে ও জীবন কাটাক, এটা কিছুতেই চায়নি ও।

আনোয়ার শক্তভাবে বলেছিল, ‘যেটা বলছি সেটা করো। আমার পক্ষে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আর সম্ভব নয়।’

রেশমা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিমায় বলেছিল, ‘রেখো না। কিন্তু আমায় বারণ করার তুমি কেউ নও। আমি কাকে ভালোবাসব সেটা ঠিক করে দেওয়ার তুমি কেউ নও।’

রেশমা চলে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল, ‘যতদিন বাঁচব তোমার নামেই বাঁচব।’

আনোয়ারের অপারেশনের দিনও হসপিটালের বাইরে ঠায় বসে ছিল রেশমা।

প্রায় একমাস পরে আনোয়ার আবার দেখতে পেয়েছিল স্বাভাবিকভাবে। ভাগ্যের জোরে সেবারের মতো ওর চোখটা বেঁচে গিয়েছিল। এমনকী পুলিশের চাকরির সময়েও ভিশন নিয়ে প্রবলেম হয়নি।

কলেজে এসেই রেশমার খোঁজ করেছিল আনোয়ার। কিন্তু রেশমা ওকে এড়িয়ে চলছিল। আনোয়ার ক্যান্টিনে দাঁড়িয়ে ওকে রাস্তা আটকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন?’

রেশমা গম্ভীর মুখে বলেছিল, ‘একা বাঁচতে বলেছিলে, তোমার থেকে সরে যেতে বলেছিলে, তাই করেছি।’

আনোয়ার হেসে বলেছিল, ‘তাহলে ফারুক আর দীপঙ্করের কাছ থেকে রোজ আমার খবর নিতে কেন?’

রেশমার স্পষ্ট জবাব, 'সে তো আমি ভালোবাসি বলে।'

আনোয়ারের প্রায় একমাস সময় লেগেছিল মেয়ের অভিমান ভাঙাতে। তখন থেকেই ওরা জানত, যাই ঘটে যাক ওদের জীবনে, ওরা একসঙ্গেই বাকি পথটুকু হাঁটবে।

আনোয়ার বলেছিল, 'রেশমা, আমরা একদিন প্যারিসের সেইন নদীর তীরে একসঙ্গে হাঁটব। ভালোবাসার শহরে গিয়ে উদযাপন করব আমাদের ভালোবাসা।'

আনোয়ার চোখের স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়েই রেশমা বলেছিল, 'তুমি আমার সঙ্গে থাকলে কৃষ্ণনগরের জলঙ্গীই আমার কাছে সেইন বা রাইন নদী হয়ে উঠবে।'

রেশমা শুধু বলার জন্য বলেনি, সত্যিই যে আনোয়ারকে নিয়ে রেশমা গর্বিত সেটা ওর প্রতিটা পদক্ষেপে বুঝিয়ে দিত।

রেশমার চোখদুটো আজ আবার অবাধ্য হয়েছে। আনোয়ার চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, 'মনে পড়ল আমাদের শপথের কথা? নাকি এখন আর এ গ্রামের ব্রজেশ্বর নদী তোমার চোখে রাইন বা সেইন নদী নয়?'

রেশমা বলল, 'তুমি কেন বুঝতে পারছ না, বলো তো? তোমাদের সব আত্মীয় আমায় ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন, কিছু খবর আছে কিনা। আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। তুমি জানো তোমার বাবা, মা দত্তক সন্তান নিতে দেবেন না। তাহলে আর একটাই তো উপায় বেঁচে থাকল, তাই না?'

আনোয়ার বলল, 'না, আরেকটা উপায়ও বেঁচে আছে। আমরা দুজনে মিলে সুন্দর করে বাঁচব। যাক গে, আমি এবার একটু টিভি দেখি। তুমি তোমার গল্পের বইয়ে মন দাও। ফালতু আলোচনা করে সন্ধেটা নষ্ট করে দিও না। এই বিষয়ে বাড়ির কারোর কথা আমি শুনতে চাই না রেশমা। তুমি

যদি রাজি থাকো, তাহলে দত্তক আমি নিতেই পারি। আর তাছাড়া ডক্টরের ওষুধ তো চলছেই। দেখা যাক না আর কয়েক বছর।'

টিভির রিমোট প্রেস করল আনোয়ার। রেশমা বুঝল আর এসব শুনতে আগ্রহী নয় ও। ঘরে গিয়ে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা 'কাঁচের দেওয়াল' বইটি খুলল। গল্পের বই পড়ার নেশা ওর ছোট থেকেই। আনোয়ার এখনও ওর এই নেশাটাকে বেশ প্রশ্রয়ে আর আদরে বাঁচিয়ে রেখেছে। রেশমার প্রতিটা জন্মদিনে, বিবাহবার্ষিকীতে ওকে একগাদা করে বই উপহার দেয়। এছাড়াও লাইব্রেরির কার্ড তো ওর আছেই। এখানে এসেও ওর কার্ড করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখনও এখানের লাইব্রেরিতে যাওয়া হয়নি। সত্যি বলতে কী, এই জায়গাটা ঠিক ভালো লাগেনি রেশমার। শহরে মানুষ হওয়া মেয়ে। সন্ধে হলেই গ্রামটা যেন কেমন নিশ্চুপ আর অন্ধকার হয়ে যায়। সেই আলোজ্বলা সন্ধে নেই। মাল্টিপ্লেক্স নেই। বড় বড় মল নেই। শপিংয়ের নামে ঘুরে বেড়ানো নেই।

রেশমা জানে, আনোয়ারেরও যে এই গ্রামে থাকতে ভালো লাগছে, তা নয়। শুধুমাত্র রেশমাকে বাড়ি থেকে, চেনা গণ্ডি থেকে সরিয়ে আনবে বলেই এখানে পোস্টিং নিয়েছে ও। বিক্রমপুর নামেই মফস্‌সল, গ্রাম বললেই ঠিক হবে। ওই হাটতলা আর বাস স্ট্যান্ডের কাছটা একটু জমজমাট। বাকি চারিদিকে চাষের জমির ধূ-ধূ প্রান্তর।

আর একটা সৌন্দর্য হারানো নদী গোটা গ্রামটা জুড়ে আধিপত্য বিস্তারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকালে তবুও তার কৌলিন্য কিছুটা ফেরত আসে। কিন্তু শীত গ্রীষ্মে লোকে ব্রজেশ্বরকে নালা বা ড্রেন ভেবে লাফ দিয়ে পেরিয়ে যায়। এতটাই পলি আর পানা জমেছে নদীর বুকে যে, জলধারণের ক্ষমতা হারিয়েছে। ঠিক ওর মতো সন্তান ধারণের ক্ষমতা না থাকা নারী।

এই গ্রামের নিস্তব্ধতা রেশমার একাকিত্বকে আরও একটু বাড়িয়ে দেয়। শিবপুরের বাড়িতে আনোয়ারের পরিবারে অনেক লোক। ওর কাকারাও পাশের বাড়িতেই থাকেন। আনোয়ারের দাদা, বউদি তার দুই বাচ্চা সব মিলিয়ে জমজমাট পরিবার। দোতলা বাড়িটা যেন সারাদিন কথা বলছে। কিছুদিন অন্তর অন্তরই আনোয়ারের বাইকে চেপে রেশমা চলে যেত বাপের বাড়ি। সেখানে দু'দিন পাখির মতো ডানা মেলে আবার ফিরে আসত। আনোয়ারের বাড়ির সবাই রেশমাকে এমনিতে মেয়ের মতোই ভালোবাসত। কিন্তু যেহেতু ওর দাদার দুই মেয়ে, আর বাড়িতে কোনো ছেলে নেই, তাই সবাই হয়তো আশা করেছিল রেশমার একটা ছেলে হোক। কিন্তু হাজার ডাক্তার, জলপড়া, তাবিজ পরেও বাচ্চা কোলে এল না রেশমার। রোজ রোজ বাড়ির লোকজন আর পাড়ার সবাই বলতে শুরু করল, 'অমুক ডাক্তার দেখাও আনোয়ার। আমার পিসির বৌমারও বাচ্চা হচ্ছিল না। শেষে ডক্টর চক্রবর্তীর ওষুধ খেয়ে কাজ হল। এখন ওর ছেলে তো নার্সারিতে ভর্তিও হয়েছে।'

এমন কত ডাক্তার বদলে গেল রেশমার জীবনে। কত নতুন নতুন ওষুধ জমল ওর পেটে। কিন্তু প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক ওর পিরিয়ড হয়ে গেল। মিস করল না একবারও। সকলের কথা শুনে রেশমার কেমন পাগল পাগল লাগত। সবাই গর্ভবতী হয়, ও হয় না কেন! মাঝরাতে ঘুমন্ত আনোয়ারকে বিছানায় ফেলে চুপিচুপি ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ও।

সকালে হারমোনিয়াম নিয়ে বসত রেশমা। ওর গান শুনতে খুব ভালোবাসে আনোয়ারের বাবা। শ্বশুরমশাইয়ের রাশভারী ব্যাপার ছিল না। বরং যেন বাবা মেয়ের মতোই ছিল ওরা। অমন একখানা বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে খুব কষ্ট হয়েছিল রেশমার। কিন্তু ওই বাড়িতে থাকলে আত্মীয়স্বজন

বাড়িতে ঢুকেই রেশমাকে নানা পরামর্শ দিতে শুরু করত। দমবন্ধ হয়ে আসত ওর। মনে হত সবাই বুঝি ওকে নিয়ে আড়ালে ব্যঙ্গ করে। রাত জেগে জেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। হারমোনিয়ামের রিডে ধুলো জমছিল। এসব দেখেই আনোয়ার ওকে নিয়ে বদলি হয়ে চলে এল এই বিক্রমপুরে। কিন্তু এই গ্রামের নিস্তব্ধতা যেন ওকে আরও বেশি করে বুঝিয়ে দিচ্ছে ওর অক্ষমতার কথা। আনোয়ার প্রায় সারাদিন ডিউটিতে থাকে। একা একা বইপত্র পড়ে দিন কাটায় রেশমা।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশিক্ষণ কাটাতে ইচ্ছে করে না। পুরোনো বান্ধবীরা সকলেই আছে ওর ফ্রেন্ড লিস্টে। সকলেই স্বামী-সন্তানের সঙ্গে ছবি দেয়। কেমন যেন একটা না পাওয়ার কষ্ট ওর মনে ক্রমাগত রক্ত ঝরিয়েই চলে। সুপর্ণার ফুটফুটে গোলাপি ফ্রক পরা মেয়েটার জন্মদিনে সুপর্ণা ছবি পোস্ট করেছিল মেয়ের। কমেন্ট বক্সে ও আশীর্বাদ আর আদর লিখতে গিয়েও থেমে গেছে। যদি সুপর্ণা কিছু মনে করে এই ভেবে। অনেকক্ষণ বাচ্চাটার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত একটা হিংসে হচ্ছিল সুপর্ণার ভাগ্যকে। তারপর নিজেই অফলাইন হয়ে গিয়েছিল। ওর দৃষ্টিতে যেন কোনো শিশুর ক্ষতি না হয়ে যায়, এই ভেবেই ফোনটা সরিয়ে রেখেছিল। ও কি হিংসুটে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন? কে জানে, হয়তো তাই!

আবারও বইয়ের পাতায় মন দেওয়ার চেষ্টা করল রেশমা। রশিদ ভাইয়া কাল যে তাবিজটা আনবে সেটাতে কি আদৌ কাজ হবে? নাকি সেই আগের মতোই বৃথা যাবে?

রেশমা যখন ইলেভেনে পড়ত তখন ওর ছোট পিসি একবার বলেছিল, এক ফকির সাহেব আছে, খুব ভালো গুনতে পারে। গুনে বলে দেবেন রেশমার জীবন কেমন কাটবে আগামীতে।

রেশমা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলেছিল, 'আমার জীবন কেমন কাটবে সে শুধু আমি ঠিক করব। আমার জীবনের মালিক আমি। ওসব তাবিজ, কবজে কিছু হয় না।'

সেই রেশমা কীভাবে যেন বিজ্ঞান ছেড়ে এসবে ভরসা করতে শুরু করল। ওর সচেতন মন বলে এসবে কিছু হবে না। কিন্তু ওর দুর্বল মন যেন এসবকেই আঁকড়ে ধরতে চায়।

বাইরে দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে রেশমা বেরিয়ে এল ড্রয়িংরুমে। দেখল আনোয়ার ড্রেস পরে রেডি।

রেশমা অবাক হয়েই বলল, 'এখন কোথায় যাবে?'

আনোয়ার কোমরে বেল্ট লাগাতে লাগাতে বলল, 'আর বলো না, এখুনি থানা থেকে ফোন এল, বেনেপাড়ায় নাকি কীসব গণ্ডগোল বেঁধেছে। বেনেপাড়ায় লোক ক'ঘর থাকে, তার আবার ঝামেলা!'

রেশমা বলল, 'খেয়ে বের হও। কত রাত হবে তার ঠিক নেই।'

কথা বলতে-বলতেই টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিল রেশমা। ঘড়ির কাঁটা ন'টার ঘর ছোঁয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে।

একটু চিন্তিত মুখেই তড়কায় ডুবিয়ে রুটিটা মুখে ভরল আনোয়ার। অন্যদিন হলে মুখে খাবার দিয়েই তৃপ্তির আওয়াজ করে বলে, 'আহা! ফাইভ স্টারকে হার মানাবে আমার রেশমার হাতের রান্না।'

রেশমা কখনও কখনও খেতে গিয়ে দেখে নুন কম, বা ঝাল নেই। তাতেও আনোয়ারের মুখের হাসিটা মেলায় না। বলে, 'ও এক-আধদিন একটু এদিক ওদিক না হলে বুঝব কী করে তুমি রক্তমাংসের মানুষ!'

আজ অমন কোনো প্রশংসা পেল না রেশমার অভ্যস্ত কান। একটু যেন অন্যমনস্কভাবেই মুখে খাবারটা ঢোকাচ্ছে আনোয়ার।

রেশমা বলল, 'মন দিয়ে খেয়ে নাও আগে।'

আনোয়ার বলল, 'বুঝলে রেশমা, এই গ্রামে লোক কম বাস করতে পারে, কিন্তু এ গ্রামে প্রায় ঝামেলা বাঁধে। বিশেষ করে ওই বেনেপাড়ায়। ক'দিন আগেই দুটো কলেজ পড়ুয়া ছেলে মাথা ফাটিয়ে থানায় এসেছিল। কারণটা কী জানো?'

রেশমা কৌতূহলী হয়ে বলল, 'কী কারণ?'

আনোয়ার বলল, 'একটি ছেলে নাকি আরেকজনের গার্লফ্রেন্ডের ছবিতে লাভ দিয়েছে ফেসবুকে। তাই অমন মারপিট। গোঁয়ার লোকজন এখানে। এখন আবার গিয়ে দেখি ক'জন হাত-পা ভাঙল! সব দোষ তো হবে প্রশাসনের। নিজেরা গণ্ডগোল লাগিয়ে রাখবে, এখন বোঝো ঠ্যালা।'

আনোয়ার বেরিয়ে গেল। রেশমাকে বলল, 'আমি চাবি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ঘুমিয়ে পোড়ো, রাত জেগে থেকো না।'

রেশমা টেবিল মুছে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। জোৎস্নার আলো অল্প অল্প জানালায় এসে পড়ছে। হাওয়াকে যেমন দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায় মাত্র, ঠিক তেমনই রেশমার এই হাসিমুখের আড়ালেই লুকিয়ে থাকে তীব্র যন্ত্রণা যা শুধু অনুভব করা যায়। গাছের পাতাগুলো এলোপাথাড়িভাবে দুলছে। এ ওর গায়ে যেন হেসে গড়িয়ে পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে রেশমার মনে পড়ে যায় প্রাইমারি স্কুলের বন্ধুদের কথা। শৈশবের সেই দিনগুলো কী সুন্দরই না ছিল। চোখদুটো জুড়িয়ে আসছিল মিষ্টি হাওয়ায়। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল রেশমা। কখন ঘুমিয়ে গেছে বুঝতেও পারেনি। ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। দেখল আনোয়ার পাশে ঘুমাচ্ছে। কখন এসে শুয়েছে টের পায়নি ও। নাইট ল্যাম্পের আলোয় টেবিলের ওপর তাকিয়ে চমকে উঠল। ওখানে কী ওটা!

লাইট জ্বালালে আনোয়ারের ঘুম ভেঙে যাবে। কিন্তু কৌতূহল দমন করাও মুশকিল। সকাল অবধি অপেক্ষা করা আরও সমস্যার। সারারাত ঘুম আসবে

না।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামল রেশমা। টেবিলের ওপর রাখা জিনিসটা হাতে নিয়েই ড্রয়িংরুমে এল। লাইট জ্বালতেই দেখল একটা পিতলের বেশ বড়সড় মূর্তি।

হিন্দু পাড়ায় বাড়ি ছিল রেশমাদের। প্রচুর হিন্দু বন্ধুও ছিল। তাই এটা যে হিন্দুদের ঠাকুর, বেশ বুঝতে পারল রেশমা। কৃষ্ণ নয়, এটা গোপাল। হাতে ছোট্ট একটা নাড়ু নিয়ে মিচকে হাসিতে মুখ ভরিয়ে রেখেছে। ঠিক যেন ছোট্ট ছেলে মাকে লুকিয়ে নাড়ু চুরি করে পালাচ্ছে। মূর্তির গায়ে চাপ চাপ কাদা লেগে আছে। একে আনোয়ার পেল কোথায়! বাথরুমে নিয়ে গিয়ে শ্যাম্পু দিয়ে ভালো করে ধুতেই চকচক করে উঠল। একমাথা কালো মিনে করা চুল। হাতে নাড়ু, লালচে ঠোঁটে মুচকি হাসি। ছোট্ট গোপালকে গামছা দিয়ে ভালো করে মুছিয়ে দিল রেশমা। যত্ন করে রেখে দিল টেবিলের ওপর। একটা পা মুড়িয়ে বসে আছে গোপাল।

তবুও ঘুম নেই ওর চোখে। আনোয়ার হঠাৎ গোপাল ঠাকুর কেন নিয়ে এল বাড়িতে! এই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি হচ্ছে না ওর। বরং প্রশ্নের পর প্রশ্ন জমছে ওর মনে। আনোয়ার জাতি-ধর্ম এত মানে না ঠিকই, একটু বেশিই লিবারেল। কিন্তু তাই বলে হিন্দুদের ঠাকুরকে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করবে এমন তো নয়। তাছাড়া কোরান অনুযায়ী ওরা মূর্তি পুজোয় বিশ্বাসী নয়। তাহলে? এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল রেশমা।

হঠাৎই স্বপ্ন দেখল, একটা ছোট্ট বাচ্চা ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে। যার এক হাতে একটা সাদা রঙের নাড়ু। মাথার কাছে চুলটা ঝুটি করে বাঁধা। ঘুমের মধ্যেই ছটফট করছিল রেশমা, এই বাচ্চাটাকে কোথায় যেন দেখেছে? ঠিক এমনই চুল বাঁধা, এমনিই মিষ্টি হাসিটা!

ধড়ফড় করে উঠতেই চোখে রোদ পড়ল। পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছে আনোয়ার। চোখ মেলে তাকাতেই দেখল ওর স্বপ্নে দেখা ছোট্ট ছেলেটা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। টেবিলের ওপর বসে আছে। ওই গোপালকেই দেখল রেশমা এতক্ষণ ধরে!

আনোয়ার পাশে নেই। সম্ভবত বাথরুমে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে ছ'টা বাজে। মাঝরাতে কিছুক্ষণ জেগে থেকে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল রেশমা। তাই হয়তো টের পায়নি। ও রোজ সাড়ে পাঁচটায় ওঠে। তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমের দিকে গেল। আনোয়ার বেরোতেই ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই গোপাল তুমি কোথায় পেলে?'

আনোয়ার দরজা খুলে গেটে গুঁজে রাখা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বলল, 'একটু চা দাও। বড় গল্প। চা খেতে খেতে বলছি।'

রেশমা চা নিয়ে এসে বসল।

আনোয়ার চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কাল বেনেপাড়ায় একটা বাড়ির কাজ শুরু হয়েছে। পিলার তুলে বাড়ি করবে। উঠোনে একটা পাতকুয়া ছিল। সেটা ঢাকা পড়েছিল। খুঁড়তে খুঁড়তেই ঢঙ করে আওয়াজ হয়। শ্রমিকটা একটা লোহার বাক্স তুলে এনেছে। এখন যে জায়গাটা বেচেছে আর যে কিনেছে তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। যার জায়গা ছিল সে বলে ওটা নাকি তার কোনো পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। আর যে জায়গা কিনে বাড়ি করছে সে বলছে ওটা এখন আমার সম্পত্তি। এই নিয়ে মারদাঙ্গা শুরু হয়েছিল।

শেষে সরকারের সম্পত্তি বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়। কারণ, এগুলো যার সম্পত্তি তিনি আর বেঁচে নেই। ওয়ারিশহীন সম্পত্তি বলেই থানায় আনা হয়েছে। বিশেষ কিছু নেই। কয়েকটা তামার অচল পয়সা, একটা ঘুণ লাগা কাগজ, এসব ছিল বাক্সে। সঙ্গে এই গোপাল মূর্তি। আমাদের থানার মুখার্জীবাবু বললেন, ওঁদের বাড়িতে নাকি প্রতিষ্ঠিত গোপাল আছে। তাই

দ্বিতীয় মূর্তি নিয়ে যেতে পারবেন না। এদিকে সুবীর বলল, দাদা বিয়ে করিনি। এই ঠাকুরকে নাকি উপোস রাখতে নেই। নিয়ে গিয়ে কোয়ার্টারে কোথায় রাখব? তারপর এতদিনের পুরোনো ট্রাঙ্ক থেকে বেরিয়েছে দেখে কেউ নিতে চাইল না। বাধ্য হয়ে আমিই নিয়ে এলাম। থানায় নাকি রাখা যাবে না। দেখি এখানে তো প্রচুর হিন্দু মন্দির আছে। দিয়ে আসব কোথাও একটা।'

রেশমা অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'আমরা রাখতে পারি না? ঈশ্বর না আল্লা জানি না। ছোট্ট বাচ্চারা যেভাবে থাকে সেভাবে রাখতে পারি না আমরা?'

আনোয়ার দেখল রেশমার চোখ দুটো সজল হয়েছে। এই গোপালমূর্তিকে তো থানার স্টাফরা বাড়িতে কেউ নিয়ে যেতেও চাইল না। রেশমার যদি মন ভালো থাকে, তাহলে থাকুক না, ক্ষতি কী?

আনোয়ার বলল, 'বেশ, রাখো তবে।'

রেশমা বলল, 'আমি আমার বান্ধবী নয়নাকে ফোন করে জেনে নেব গোপাল কী কী খায়। ওদের বাড়িতে ধুমধাম করে গোপাল পুজো করত আমার মনে আছে।'

আনোয়ার আর কথা না বাড়িয়ে ডিউটি বেরোবার জন্য রেডি হল।

রেশমা ফোনে জানল, গোপালের ভোগে তুলসী দিতে হয়। গোপাল লাড্ডু খেতে ভালোবাসে। দোলনায় দুলতে পছন্দ করে।

রেশমা মার্কেটে গিয়ে একটা ছোট্ট অন্নপ্রাশনের হার কিনল। রকমারি সব পোশাক কিনল। আর একটা সুন্দর কাঠের দোলনা আর রুপোর মুকুট কিনে বাড়ি ফিরল। সঙ্গে চকলেট থেকে লাড্ডু কিছু বাদ গেল না। রেশমার যেন এখন অনেক কাজ। এতটুকু অবসর নেই।

তুলো দিয়ে গোপালের বিছানা বানাতে হবে। বালিশ বানাতে হবে। নতুন পোশাক পরাতে হবে।

আনোয়ার রাতে বাড়ি ঢুকেই দেখল রেশমা হাসছে। আর হেসে হেসেই বলছে, 'দেখবে এসো, গোপালকে কেমন সাজিয়েছি আজকে।'

গলায় সোনার হার, মাথায় ছোট্ট মুকুট পরনে সাদা জড়ির পোশাক, দোলনায় দুলছে গোপাল। সামনে বেশ কিছু চকলেট রাখা।

আনোয়ার বলল, 'তোমার গোপালের থেকে একটা চকলেট পাওয়া যাবে রেশমা?' রেশমা ধমক দিয়ে বলল, 'কী হ্যাংলা গো তুমি? একটা বাচ্চার চকলেট নেবে? আচ্ছা নাও একটা। আমার গোপাল বড় শান্ত ছেলে।'

আনোয়ার একটা চকলেট মুখে দিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকল। রেশমার যেন কথা শেষ হয় না। গল্প করেই চলছে। ঠিক যেন সেই কলেজের রেশমা। বকবক করে মাতিয়ে রাখত একসময়। আনোয়ার ওকে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। চোখের নীচে এখনও নির্ঘুম রাত কাটানোর গভীর কালি। চামড়ায় অযত্নের চিহ্ন তীব্র। শুধু চোখ দুটোতে আজ কষ্টের ছাপ নেই, বরং বেশি হাসি রয়েছে।

আনোয়ার ওকে টেনে নিজের কোলের কাছে বসিয়ে বলল, 'তো গোপাল কি তার মায়ের সেই সুন্দর রূপটা দেখতে পাবে? সেই যে মিষ্টি দেখতে রেশমাকে তো তারও দেখা দরকার। না হলে গোপাল ভাববে, এ মা! আমার মাকে দেখতে বড্ড পচা।'

রেশমা হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ তুমি। আজ থেকে আমি ভালো করে খাব, খুব ঘুমাব।'

চা খেতে খেতে আজ অনেক গল্প হল রেশমার সঙ্গে। আনোয়ার অবাক হয়ে দেখছিল পিতলের মূর্তিটাকে। একটা প্রাণহীন মূর্তি এভাবে তার রেশমাকে বদলে দিতে পারে? তাহলে ওকে বাড়িতে এনে লাভই হয়েছে।

রেশমা বলল, 'জানো একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আমি স্বপ্নে দেখলাম গোপাল আমায় মা বলে ডাকছে। আমার কানের কাছে এখনও সেই ডাক শুনতে পাচ্ছি যেন।'

আনোয়ার রেশমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার এই হাসি মুখটুকু দেখব বলেই তো আমার লড়াই।'

রেশমা আলতো করে আনোয়ারের বুকে মাথা রেখে বলল, 'গোপালকে কখনও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না প্লিস।'

আনোয়ার হেসে বলল, 'ভুলে যাচ্ছ কেন তোমার কর্তা পুলিশ। তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার গোপালের প্রোটেকশনের দায়িত্ব আজ থেকে আমার।'

বেশ কাটছিল রেশমার দিনগুলো।

হারমোনিয়ামের ধুলো ঝেড়ে বহুদিন পরে আজ গান নিয়ে বসেছে রেশমা। আসল উদ্দেশ্য গান শুনিয়ে গোপালকে ঘুম পাড়ানো। দিনরাত খাটিয়ে মারছে ছেলেটা রেশমাকে। এই স্নান করানো, পোশাক পরানো, চারবার করে খাওয়ানো, তারপর দোলনায় দোল দেওয়া। রোজ ফুলের মালা গেঁথে পরানো। সময় যেন কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে রেশমার। আজ গোপালকে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াবে ভেবেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসল। টিউনিং করাতে হবে এটাকে। বেশ কিছু স্বর বসে গেছে।

তবুও রেশমা গাইছিল,

'ওরে নীল যমুনার জল!

বল রে মোরে বল কোথায় ঘনশ্যাম—

আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম।

আমি বহু আশায় বুক বেঁধে যে এলাম—

এলাম ব্রজধাম।'

গান গাইতে গাইতে রেশমার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বুকের সব জমে থাকা বরফ যেন ধীরে ধীরে গলছে। ওর কোলে শুয়ে আছে গোপাল।

আনোয়ার কখন এসেছে বুঝতেও পারেনি। বিভোর হয়ে গাইছিল রেশমা।

আনোয়ার ঢুকে বলল, 'যাক, অনেকদিন পরে গান শুনতে পেলাম।'

রেশমা মুখে আঙুল দিয়ে ইশারায় বলল, চুপ করতে। গোপালকে দেখিয়ে বলল, 'সবে ঘুমাল। চুপ করো একদম।'

আনোয়ার বেশ বুঝতে পারছে রেশমা গোপালকে নিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। গোপালের মধ্যেই ও নিজের সন্তানকে খুঁজে নিয়েছে। লোকে দেখলে হয়তো রেশমাকে পাগল বলবে। হয়তো এটা আনোয়ারের আটকানো দরকার ছিল। কিন্তু রেশমার মুখের হাসির থেকে মূল্যবান আর কিছু নেই। মাত্র দশ দিনের মধ্যে ম্যাজিকের মতো রেশমার চোখের নীচের সেই কালি গায়েব। মুখটা যেন ক'দিনেই চকচক করছে। ঠোঁটের কোণে সবসময় তৃপ্তির হাসি। এসব দেখেই আনোয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেশমা যাতে ভালো থাকবে তাতে ভালো থাকুক। ও কোনোরকম বাধা সৃষ্টি করবে না।

রেশমা তার গোপালকে শুইয়ে এসে খাবার সাজাল টেবিলে। খাওয়া-দাওয়া করে দুজনেই শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। কাল ভোরে বেরোতে হবে আনোয়ারকে। একটা বিশেষ কাজ আছে। ওসি আসবেন।

হঠাৎই একটা চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল আনোয়ারের। কারা যেন খুব জোরে জোরে ওর বাড়ির দরজা ঠুকছে। জানালাতেও ঢিল জাতীয় কিছু ছুঁড়ছে। ঠিক বুঝতে পারল না আনোয়ার। রেশমা ঘুম চোখেই ছুটে গিয়ে গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

আনোয়ার দরজাটা খুলতেই দেখল প্রায় জনা পঁচিশেক লোকজন হাতে লাঠি নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে কিছু বলে চলেছে। ঘুমের ঘোরে ছিল আনোয়ার। তাই প্রথমে বুঝতেই পারেনি ঝামেলাটা ঠিক কী নিয়ে?

তারপর একজনকে দেখে চিনতে পারল। সেদিন যার বাড়ি খুঁড়ে ট্রাঙ্ক পাওয়া গেছে, সে-ও দলে আছে। একজন বছর পঞ্চাশের লোক বললেন, 'দেখুন অফিসার, আপনি পুলিশ বলে আমরা এখনও আপনার বাড়িতে

আগুন ধরিয়ে দিইনি। না হলে সেটাই করা উচিত ছিল। আমাদের এটা হিন্দু গ্রাম। চারিদিকে মন্দির-বিগ্রহ সব আছে। এমনকী আমরা বুড়ো বটকেও দেবতাজ্ঞানে পুজো করি। আমাদের গ্রামের নদীর নাম কেন ব্রজেশ্বর জানেন? প্রতিবার চরকের সময় ওই নদীতে শিবলিঙ্গ নিজে ওঠেন। সেখানে আপনি বিধর্মী হয়ে এত বড় অনাচার করেন কী করে?' আনোয়ার কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, 'তো আমার অপরাধটা ঠিক কী যদি বলেন? আপনাদের কোন দেবদেবীকে আমি অসম্মান করেছি? এই তো দু'দিন আগে আপনাদের চণ্ডীতলায় মেলা বসেছিল। যাতে কোনোরকম ঝামেলা না হয় তাই আমি দুজন কনস্টেবল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। নির্বিঘ্নে আপনাদের সব অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে। তাছাড়া আমরা একই রাজ্যের মানুষ। আমার জন্মকর্ম সব এখানে। তাই ছোট থেকে দুর্গাপুজো, কালীপুজো দেখে এসেছি। এতে সমস্যা কোথায়?'

লোকটি চেঁচিয়ে বলল, 'তাই বলে আমাদের ইষ্টদেবতা আপনার বাড়িতে থাকবেন, এটা তো আমরা মেনে নেব না।'

আনোয়ার বুঝল, ওদের পরিচারিকা করবীই রটিয়েছে কথাটা। না হলে গোপালের কথা এদের জানার কথা নয়। আনোয়ার পিছনে তাকিয়ে দেখল ঘরের মধ্যে রেশমা দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। বুকের কাছে চেপে ধরে আছে গোপালের মূর্তিটাকে। খুব অসহায় লাগছে আনোয়ারের। সামান্য এটুকু চেয়েছিল রেশমা সেটুকু দেওয়ার ক্ষমতা নেই ওর! কেমন ভালোবাসে ও রেশমাকে? ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, গোপালকে কেউ কেড়ে নেবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে যেভাবে গ্রামের সবাই ক্ষেপে উঠেছে ওর ওপরে তাতে জাতপাত নিয়ে অশান্তি শুরু হবে। ওসির কানে যাবে। মুশকিলের শেষ থাকবে না। এ দেশে সব থেকে বড় ইস্যু ধর্ম। কিছু ছেলে পিছনে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে দু'বেলা হয়তো পেট

ভরে খেতে পায় না। মানুষের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষার থেকেও এ দেশে ধর্ম বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন পুলিশে থেকে এটা ভালো করেই জানে আনোয়ার।

তবুও রেশমার রক্তশূন্য মুখটার দিকে তাকিয়ে ভাবল একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। আনোয়ার বলল, 'দেখুন, হতে পারি আমরা অন্য ধর্মের। কিন্তু ওই গোপাল মূর্তিকে আমার স্ত্রী অত্যন্ত যত্নে রেখেছে। কোনো অসম্মান করা হয়নি।'

গোটা চারেক লোক ঝাঁপিয়ে উঠে বলল, 'আমাদের ইষ্টদেবতা একটা মুসলমান বাড়িতে থাকতে পারেন না। রাখবেন আপনাদের আল্লাকে আমাদের মণ্ডপে? মসজিদে ঢুকতে দেন আমাদের? উদার কথাবার্তা শুধু বলতেই ভালো লাগে। ওসব শুনব না। আমাদের মূর্তি ফেরত দিন। আমরা ব্রজেশ্বরের জলে শুদ্ধ করে তাঁকে নিয়ে যাব।'

রেশমা বুকে চেপে ধরে আছে গোপালকে।

আনোয়ার এগিয়ে গিয়ে বলল, 'রেশমা, এরা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে। দিয়ে দাও ওদের গোপালকে। আমি তোমায় অন্য গোপাল কিনে দেব।'

রেশমা বলল, 'না, আমি দেব না। গোপাল আমায় ছাড়া খায় না, গান না শুনে ঘুমায় না। আমায় মা ডাকে। আমি দেব না ওকে।'

আনোয়ার দেখল রেশমার মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে নিজের কান্না থামাতে চাইছে। কষ্ট হচ্ছে আনোয়ারের। কিন্তু এই আক্রোশের মুখে আর কোনো রাস্তা নেই। আনোয়ার শান্তভাবে রেশমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আমি তোমায় এনে দেব, দেখো। একটু বিশ্বাস রাখো আমার ওপরে।'

রেশমা ঘাড় গোঁজ করে বলল, 'আমি বাজারে দেখেছি সব গোপালের হাতে কমলা রঙের লাড্ডু থাকে। একমাত্র আমার গোপাল নারকেল নাড়ু

হাতে রয়েছে। আমি কালকে সারা দুপুর ধরে নারকেল কুরে নাড়ু বানিয়েছি। ওগুলো খাবে কে?'

আনোয়ার হাঁটু মুড়ে বসে হাত দুটো বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইল রেশমার কাছে। এভাবেই প্রথম রেশমাকে কলেজ চত্বরের ফাঁকা গাছতলায় প্রোপোজ করেছিল। তখন অবশ্য জানত না জীবনটা এতটা জটিল মোড়ে এসে থামবে।

রেশমা আনোয়ারকে এতটা ভেঙে পড়তে কখনও দেখেনি। তাই হয়তো একটু হকচকিয়ে গিয়েই গোপালকে দিয়ে দিল ওর হাতে। আর কথা না বলে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল রেশমা।

আনোয়ার সোনার হার, মুকুট এগুলো খুলে নিল গোপালের শরীর থেকে। হয়তো মুসলমান পরিয়েছে তাই এগুলোও অপবিত্র বলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। আনোয়ার যখন বেশ ছোট তখন ওদের পাশের বাড়ির এক কাকিমা অষ্টমীর ভোগ দিয়েছিল ওকে। ও খিচুড়ি খেতে ভালোবাসে বলে কলাপাতায় নিয়ে খাচ্ছিল, তখনই আনোয়ারের পিসি এসে হাত থেকে প্রসাদটা নিয়ে জলে ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'মুসলমানের ছেলে হয়ে হিন্দুদের প্রসাদ খাস? তোর তো জাহান্নামেও ঠাঁই হবে না।'

আনোয়ার এই জীবনে বুঝতেই পারল না, মানুষগুলোর মধ্যে আলাদা কী আছে?

গোপালকে নিয়ে দিনরাত রেশমা মেতে ছিল। ক'দিনের মধ্যেই গোপাল যেন ওদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিল। ফেরত দিতে গিয়ে আনোয়ারের বুকটাও ধড়ফড় করে উঠল। মনে হল যেন নিজেদের কাউকে অন্যের হাতে তুলে দিল।

ওরা গোপালকে নিয়ে চলে গেল।

রেশমার দরজা বন্ধ। জানালার ফাঁক দিয়ে আনোয়ার দেখল রেশমা গোপালের দোলনায় কাছে বসে আছে। এই মুহূর্তে রেশমার যা মনের অবস্থা, ভালোমন্দ কিছু আবার না করে বসে। কোনো পশু-পাখি এনে দিলে কি ভালো থাকবে রেশমা? আজকেই বাজার থেকে গোপাল কিনতে সাহস হচ্ছে না ওর। তাছাড়া রেশমার বক্তব্য অন্য গোপালের সঙ্গে ওর গোপালের পার্থক্য আছে। বড্ড অসহায় লাগছে আনোয়ারের। আজ বুঝতে পারছে প্রেমিক হওয়া বড্ড কঠিন। রেশমার কান্নাভেজা চোখ, রক্তশূন্য মুখ দেখে নিজের হাজার কষ্ট হলেও ভেঙে পড়লে চলে না। আনোয়ার ওদের ভালোবাসার গল্পটা অন্যরকম ভাবে আঁকবে ভেবেছিল।

ভেবেছিল নদীর ধারে একটা ছোট্ট বাড়ি থাকবে। বাড়ির চারপাশে বেশ কিছু কৃষ্ণচূড়া গাছ। গরমে রঙিন হয়ে থাকবে ওদের বাড়ির চারপাশ। ছাদে উঠলে নদীর ঠান্ডা হাওয়ায় রেশমার আঁচল উড়বে। অথবা ওই অবাধ্য হাওয়াকে বশ করে ভিজে চুল শুকিয়ে নেবে রেশমা। ঝগড়ার দিনে আনোয়ার ওই ছাদেই মাদুর বেছাবে। মাঝরাতে চুপিচুপি নেবে আসবে রেশমার পাশে। কখন আলগোছে ওকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়বে টের পাবে না রেশমা। বাড়ির উঠোন জুড়ে জ্যোৎস্না এসে পড়বে। ওখানে বসেই ওরা দুজন নামাজ পড়বে। ভাত ফোটার গন্ধে চাইচাই খিদে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকবে আনোয়ার। রেশমার ঘামে ভেজা মুখের প্রেমে পড়বে ও বারংবার। সেই নিকানো উঠোন, জোৎস্নাভেজা রাত্রি, সেই হাসিখুশি রেশমা সব যেন কেমন হারিয়ে গেল। ওর কল্পনার ছবিটাও যেন ধূসর রঙে আবছা হয়ে গেল।

আনোয়ার বেশ কয়েকবার ডাকল রেশমাকে। দরজা খোলার আওয়াজ নেই। সারা রাত সোফায় বসে থেকে থেকে ভোর হয়ে এল। আবার একটা কর্মব্যস্ত দিন শুরু হবে আনোয়ারের। কিন্তু রেশমার কাছে আজ ওর থাকা

দরকার। এদিকে ওসির সঙ্গে মিটিং আছে। বাধ্য হয়েই পোশাক পরে রেডি হল। হঠাৎই দরজাটা খুলে গেল। কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যাওয়ার পরে ছোট গাছগুলো যেমন বিধ্বস্ত হয়ে যায় ঠিক সেরকম লাগছে রেশমাকে। মুখে কোনো কথা নেই। চোখদুটো রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।

চুপচাপ বাথরুমে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পরে দুটো টোস্ট আর চা এনে টেবিলে রেখে চলে গেল বেডরুমে।

আনোয়ার বলল, 'তুমি খাবে না?'

রেশমার কোনো উত্তর নেই। অভিমান জমে আছে ঠোঁটের কোণে। ও হয়তো ভাবছে কেন ওকে দিয়ে দিতে হল গোপালকে? রেশমা বোঝে না, এ পোড়া দেশে একটা ভাইরাল ফিভারে সবাই কাবু, সেটা হল ধর্ম। মুসলমানের ঘরে হিন্দুদের ঠাকুর থাকতে পারে না এই ইস্যু যে কতদূর যেতে পারে ওর কোনো ধারণাই নেই।

কথা না বাড়িয়ে খেয়ে নিয়ে ডিউটি বেরিয়ে গেল আনোয়ার। দেখল গোপালের নারকেল নাড়ুর কৌটো নিয়ে বসে আছে রেশমা। ভাবতে ভাবতেই বাইকে স্টার্ট দিল, একটা পশু পুষলে কেমন হয়? সেটা নিয়ে তো আর কেউ কিছু বলতে পারবে না।

ওসি-র সঙ্গে মিটিং চলাকালীন আনোয়ারের মন পড়েছিল রেশমার দিকে। কী যে করছে একা একা। এমন প্রফেশনে আছে যে একটা দিন ও রেশমার সঙ্গে কাটাতে পারল না।

লাঞ্চ ব্রেকে ফোন করল রেশমাকে। ফোনটা বেজে বেজে কেটে গেল। হোয়াটসআপের লাস্ট সিন সেই কাল রাতে।

এই কঠিন রেশমার কাছে আনোয়ার বড্ড অসহায়। এই সময় ও কারোর কথা শোনে না। রেশমার অভিমানকে বড্ড ভয় পায় আনোয়ার।

থানা থেকে বাড়ির দিকে যেতে যেতেই দেখল শিব মন্দিরের সামনে বেশ জটলা। অন্যদিন হলে বাইক দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করে আনোয়ার, 'কী? সব ঠিক আছে তো?' আজ মনটা এতটাই বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে ইচ্ছে করল না। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে কী করে? শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে একজন নিঃসন্তান মহিলার কাছ থেকে সন্তানজ্ঞানে আদর করা গোপালকে কেড়ে নিতে যারা পারে তাদের কুশল সংবাদ নিতে আর ইচ্ছেই করল না আনোয়ারের। কয়েকজন ওকে দেখেই ছুটতে ছুটতে এল। বাইকের স্পিড কমাল আনোয়ার। দু-তিনজন বেশ ভয়ার্ত গলায় বলল, 'আমাদের ক্ষমা করবেন স্যার। ম্যাডাম আমাদের সাক্ষাৎ দুর্গা প্রতিমা।'

আনোয়ার কিছুই বুঝল না। কে ম্যাডাম? রেশমার কথা বলছে? মুসলমান ঘরনিকে দুর্গা প্রতিমা বলার কারণটাই বা কী? এই গ্রামে চাষীবাসি, ব্যবসাদার থাকলেও মানসিকতার দিক দিয়ে এরা বড্ড পিছিয়ে আছে। কুসংস্কার এদের ঢেকে রেখেছে। সেখানে এমন উক্তির কারণ জানতে আনোয়ার বেশ জোরেই বাইকটা চালাল।

বাড়ির সামনে এসে আরও অবাক হয়ে গেছে। বেশ কিছু লোক বারান্দায় বসে খাচ্ছে। রেশমা আর করবী আরও দুজন মহিলা মিলে তাদের পরিবেশন করছে।

একটু চমকে উঠল আনোয়ার। রেশমার মুখে হাসি ধরছে না।

আনোয়ার ঢুকতেই রেশমা হেসে বলল, 'গোপাল ফিরে এসেছে গো। আমায় ছেড়ে এক বেলাও থাকতে পারেনি সে। এই যে এঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন, এঁরাই ফেরত দিয়ে গেলেন। তাই আমি ওদের আজ একটু মিষ্টি খাওয়ালাম।'

আনোয়ার দেখল লুচি, আলুরদম, ছোলার ডাল, মিষ্টি এসব রয়েছে পাতে। আনোয়ারকে দেখে সবাই ক্ষমা চাইল। কিন্তু তবুও বিষয়টা বোধগম্য

হল না। শুধু রেশমার কষ্ট বা কান্না দেখে এরা গোপালকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল এটা হতে পারে না। আনোয়ার করবীকে ডাকল।

করবী এসে তার নিজস্ব ঢঙে বলতে শুরু করল, ‘আর বলবেন না দাদাবাবু, ওই সমর চাটুজ্জে তো গোপালটা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছিল। শেষে সবাই বলেছিল আপাতত ওদের বাড়িতেই রাখা হবে। তারপর মন্দির গড়ে তাতে থাকবে গোপাল। ভোর রাতে সমর চাটুজ্জে গোপাল নিয়ে নিজেদের ঠাকুরঘরে রাখলেন। তার দু’ঘণ্টার মধ্যে সমর চাটুজ্জের মায়ের রক্ত বমি হল। সবাই বুঝল পাতকুয়োতে কেন গোপাল ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ও অপয়া গোপাল গো। তাই ভয়ে ভয়ে সমর চাটুজ্জে গোপাল বৌদিমনিকে ফেরত দিয়ে গেছে।’

আনোয়ার মনে মনে বলল, কুসংস্কার মাঝে মাঝে বেশ ভালো ফল আনে। ভাগ্যিস সমর চাটুজ্জের মায়ের বমি হল, তাই তো রেশমা গোপাল ফেরত পেল।

রেশমা তার গোপালকে ঘুম পাড়িয়ে আনোয়ারের পাশে এসে শুয়ে পড়ল।

ঘুমন্ত রেশমার দিকে তাকিয়ে আনোয়ার মনে মনে বলল, একটু ক্ষমতা দাও আল্লা যেন এই মুখটাতে হাসিটুকু চিরস্থায়ী করতে পারি।

রেশমার কপালে চুমু খেতেই দু’হাত দিয়ে আনোয়ারকে জড়িয়ে ধরে রেশমা বলল, ‘ক্ষমা করো। আমি মাঝে মাঝে বড্ড অবুঝ হয়ে যাই।’

আনোয়ার বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল রেশমাকে। নতুন করে আঁকতে শুরু করল সেই ধূসর হয়ে যাওয়া ছবিটাকে।



ভালোবাসা রয়ে যায়

‘কী গো, তুমি কি তাহলে এমন হাত-পা গুটিয়ে নেবে? এমন নির্লিপ্ত থাকো কী করে বলো তো? অভি আর নিশা ডিসিশন নিয়ে নিয়েছে ওরা ডিভোর্স নেবে। বাবা হয়ে তোমার কি একবারও ওদের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়? সেরকম বড় কোনো ইস্যু নিশ্চয়ই নয়। ঝগড়া তো হয়নি এ ক'দিনে। তোমাকে তো দুজনেই মানে-টানে, একটু দেখো না শেষ চেষ্টা করে।’

চিরন্তন দত্ত ল্যাপটপ থেকে চোখ তুলে স্থিরভাবে তাকালেন স্ত্রীর দিকে। বরাবরের নির্ঝঞ্ঝাট নির্বিবাদী মানুষ। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। আর হয়তো বছরখানেক চাকরি আছে। তারপর রিটায়ার করবেন। তনুশ্রীকে বিয়ে করেছেন সেই চব্বিশ বছর বয়সে। আজ অবধি পাড়ার লোক কেউ চিরন্তনের গলার চিৎকার কেমন হয় শুনতে পায়নি। তনুশ্রী একাই চেঁচিয়ে ঝগড়া করেছেন কখনও সখনও, কিন্তু চিরন্তন চিরকালের শান্ত, ধীর-স্থির মানুষ। কিন্তু তাই বলে বোরিং নন মোটেই। খুবই হুল্লোড়ে। পাড়ার ক্লাবের সভাপতি উনি। পাড়ার ছেলেরা চিরুজেঠু বলতে অজ্ঞান। ক্লাবের সরস্বতী

পুজো থেকে দুর্গা পুজোর নতুন নতুন প্ল্যান সব এই চিরুজেঠুর মাথা থেকেই আসে। তাই পাড়ায় খুব পপুলার। কিন্তু আজ অবধি কারোর সঙ্গে জোর গলায় কথা বলেননি। যাকে যা বলার শান্ত মেজাজে বলেছেন। তাতে কাজও হয়েছে।

একমাত্র ছেলে অভিরূপ আবার বাবার ঠিক উল্টো। অভিরূপ ফিন্যান্সে খুব ভালো চাকরি করে। ব্যবহারও খুব ভালো। কিন্তু রাগলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায় সেই ছোট থেকে। তনুশ্রী চাইল্ড সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তেমন কাজ হয়নি। মেধাবী, নম্র ভদ্র ছেলেটা রাগলে যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে যায়। তখন মা হয়ে নিজের সন্তানকেই চিনতে পারেন না তনুশ্রী।

চিরন্তন শান্ত গলায় বলেছেন, 'তনু, সব মানুষকে একই সরলরেখায় ফেলে দাগ টানলে তোমার দাগটা হয়তো সোজা সরল হবে ঠিকই, কিন্তু যাদের দিয়ে তুমি দাগটা কাটলে তারা কিছুদিনের মধ্যেই ওই দাগ থেকে বেরিয়ে যাবে। তখন তোমার ওই সরলরেখা বেঁকেচুরে যাবে। তার থেকে যাদের মেলাতে পারছ না তাদের একই দলে ফেলো না। পরে তুমিই মুশকিলে পড়বে। তার থেকে বরং হিসেব না মেলা অঙ্কগুলোর জন্য আলাদা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারো। অভি ঠিক তেমনই হিসেব না মেলা অঙ্ক। তাই ও যাতে না রাগে সেটা খেয়াল রেখো। আর কেন অভি রেগে যাচ্ছে তার কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরই।'

অভির সঙ্গে নিশার প্রেমটা সেই স্কুল লাইফ থেকে। তিনদিন অন্তর ব্রেকআপ হয়েছে। আবার দুজনে দুজনকে মিস করেছে, আবার প্যাচআপ হয়েছে। ওদের সম্পর্কের যা বয়েস তাতে বোধহয় তিন দিয়ে গুন করলে ব্রেকআপ কতবার হয়েছে সেই সংখ্যাটা পাওয়া যাবে। কোনও সম্পর্কে যে এতবার ব্রেকআপ হতে পারে সেটা বোধহয় কল্পনাতীত। তার থেকেও

আশ্চর্যজনক হল, এরা আবার নিজেদের ইগো ছেড়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছে। এমনকী বিয়ে অবধি গড়িয়েছে ওদের সম্পর্কটা। মাত্র এক বছর হল বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে মাঝে-মাঝেই বেশ ঝাঁঝালো ঝগড়া শোনা যায় এদের। তখন তনুশ্রীই গিয়ে মধ্যস্থতা করে ঝামেলা মেটান। কিন্তু এবারের ঝামেলাটা যে ঠিক কী, বুঝতে পারেনি তনুশ্রী। কোনো ঝগড়া নেই, মান-অভিমান নেই, নালিশ, অভিযোগ কিছু নেই। হঠাৎই দুজনে অফিস থেকে ফিরে ড্রয়িংরুমে বোমাটা ফাটাল, 'আমরা ডিভোর্স চাই। এটা আমরা দুজনে খুব ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা এর মধ্যে একেবারেই ইন্টারফেয়ার করবে না। শুধু একই ছাদের নীচে থাকি বলে জানিয়ে দিলাম। নিশা ডিভোর্স ফাইল করেই বাপের বাড়ি চলে যাবে।'

এই কথাটা শোনার পরে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে গিয়েছিলেন চিরন্তনবাবু। তনুশ্রী তো রীতিমতো ফুঁপিয়ে কান্নাকাটি করতে শুরু করেছিলেন।

নিশা এবং অভি দুজনেই চলে গিয়েছিল। এই ক'দিন অভি গেস্টরুমে থাকছে। এই ফ্ল্যাটে তিনটে বেডরুম। একটা আত্মীয়স্বজন না এলে একেবারেই ব্যবহার হয় না। তনুশ্রী দেখলেন, নিশাই পরিষ্কার চাদর নিয়ে গিয়ে ওই ঘরের ডিভানে পেতে দিল। জলের বোতল ভরে ওই ঘরে রেখে এল। এমনকী অভির কিছু পোশাকও ওই ঘরের আলমারিতে গুছিয়ে দিয়ে এল। সবই চোখের সামনে দেখলেন তনুশ্রী, কিন্তু ঠিক কী কারণে ওরা ডিভোর্স চাইছে, সেটা জানা গেল না। নিশাকে তনুশ্রী আজ থেকে চেনেন না। সেই স্কুলের সময় থেকে অভির সঙ্গে এই বাড়িতে আসছে। মেয়ের থেকে কিছু কম নয় ও। ওরা মুখ খুলছে না দেখে বাধ্য হয়েই রাত্রে নিশার ঘরে গিয়েছিলেন তনুশ্রী। দেখলেন নিশা নিজের সব জিনিস আলমারির একটা লম্বা তাকে গোছনোর চেষ্টা করছে। যাতে চট করে ট্রলিতে প্যাক করে নেওয়া যায়।

তনুশ্রী নিশার পাশে বসে ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, ‘আমাকেও বলবি না ঠিক কী হয়েছে?’

নিশা হালকা করে তনুশ্রীর কাঁধে মাথা রেখে বলল, ‘ডিভোর্সটা তোমার ছেলের সঙ্গে হবে মামনি, তোমার বা বাবাইয়ের সঙ্গে নয়। তোমাদের কাছে আমি আসব মাঝে-মাঝেই।’

তনুশ্রী বলল, ‘কারণটা জানতে চাইছি। অভির রাগের সঙ্গে তো তুই ক্লাস নাইন থেকে পরিচিত। তাই শুধু ওর রাগটা যে কারণ নয় সেটুকু আমি বুঝেছি। আসল কারণটা আমায় বলবি? তোদের ঝগড়ার সময় আমি তো সবসময় অভিকে বকেছি। তোকে তো কোনোদিন বকিনি বল। কারণ আমি জানতাম মাথা গরম অভিই করে, তুই নিজেকে সামলাস। আজকেও আমায় বল মা, ঠিক কী হয়েছে?’

নিশা বলল, ‘এটা জানতে চেয়ো না মামনি। নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাব। আর তো মাত্র সাতদিন আছি এ বাড়িতে, এ ক’দিন এসব থাক।’

তনুশ্রী বলল, ‘তোর বাবা-মা জানেন? হ্যাঁ রে, আমি কী উত্তর দেব জয়িতাকে? তোর বাবা যখন জিজ্ঞেস করবে, তনুশ্রীদি ঠিক কী হয়েছিল ওদের মধ্যে যে আপনারা মেটাতে পারলেন না, তখনই বা কী বলব?’

নিশা বলল, ‘কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না তোমায়। নিশ্চিন্তে থাকো।’

নিশা আর কথা বাড়াতে চায়নি। তনুশ্রীও প্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে নিরুপায় হয়ে অভির ঘরে গেছেন।

অভি ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে আছে, হাতও কি-প্যাডে, কিন্তু অন্যমনস্ক।

তনুশ্রী ছেলের এলোমেলো চুলে আঙুল ডুবিয়ে বলেছেন, ‘হ্যাঁ রে অভি, তুই অনেক বড় হয়ে গেছিস না? আগে তো মাকে কোনো কথা না বললে তোর ঘুমই আসত না। আর এখন মাকে কিছু বলতেই চাস না।’

অভি একটু সতর্ক হয়ে বলেছে, 'এখনও তো সব বলি মা। তোমাকে তো বললাম, একটা নতুন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি। আর প্রজেক্ট ম্যানেজারও আমিই। তাই কাজের খুব প্রেশার থাকবে সামনের পাঁচ মাস।'

তনুশ্রী নিরুপায় হয়ে বললেন, 'নিশার সঙ্গে ডিভোর্স কেন দরকার হল?'

অভি বলল, 'সেটা তুমি নিশাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। আমার তো ডিভোর্সের দরকার ছিল না। নিশাই জানিয়েছে সে আর থাকতে চায় না।'

তনুশ্রী অবাক হয়ে বলেছেন, 'কিন্তু কেন বলেছে নিশা এ কথা। কী করেছিস তুই?'

অভি বলল, 'ওটা বরং তুমি নিশার কাছ থেকেই জেনে নিও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেমে এসেছেন তনুশ্রী। তারপরেই চিরন্তনের দ্বারস্থ হয়েছেন। আজ অবধি তনুশ্রীর কোনো আবদার চিরন্তন রাখেননি, এমন হয়নি। আজ প্রথম কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে আছেন।

তনুশ্রী আবারও বললেন, 'কী গো, তুমি ওদের একবার ডেকে কথাও বলবে না? আর কারণটা ঠিক কী সেটা তো জানবে নাকি? বাবা হয়ে কিছু কর্তব্য তো করো।'

চিরন্তন বললেন, 'আজ নয় কাল কথা বলব। যদিও ওদের দুজনের সিদ্ধান্তের ওপর আমার কিছু বলাটা একেবারেই উচিত নয়, তবুও একটু কথা তো বলতেই হবে। আসলে কী জানো তনু, ঝগড়া হলে ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিত না। ক্ষতটা বোধহয় গভীরে। তাই এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হল না। ঝগড়া তো ওদের আজ থেকে হচ্ছে না। এটা বিষয় নয়।'

নিশা আজ ওদের বেডরুমে একা শুয়ে আছে। অভির ল্যাপটপের আলো চোখে লাগছে না। অভির সিগারেটের উৎকট গন্ধ এসে নাকে লাগছে না। অভির ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালার আওয়াজ নেই। নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত রাত্রি। তবুও ঘুম আসছে না নিশার। চোখ বন্ধ করলেই অভির ক্লাস ইলেভেনের মুখটা

মনে পড়ছে। ক্লাস নাইনে ওরা একই টিউশনে পড়তে ঢুকেছিল। টিউশনের সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বললেও নিশার সঙ্গে কথা বলত না অভি। কারণটা অবশ্য নিশা কোনোদিন জানতে চায়নি। এমনিতেই ছোট থেকে ও কম কথা বলা মানুষ। অভি ছিল ওদের ব্যাচের সব থেকে হই-হুল্লোড়ে ছেলে। ও না এলে মধুসূদন স্যার বলতেন, 'আজ ব্যাচটা বড্ড ফাঁকা লাগছে বুঝলি। বিচ্ছুটা আজ আসেনি না।'

তবে অভির রাগ ছিল মারাত্মক। একবার ব্যাচের কোনো একটা ছেলে ওর ফ্যামিলিকে অপমান করে গালাগাল দিয়েছিল। অভি ছেলেটাকে মেরে ওর নাক ফাটিয়ে দিয়েছিল। এমন রগচটা মুডি টাইপ ছেলে নিশার পছন্দের তালিকায় কোনোদিনই ছিল না। ও বরাবরই শান্ত নদীর মতো। গতিহীন নয়, বর্ষার দামালপনা নেই ওর মধ্যে। নিজেকে জাহির করার ইচ্ছেও ওর কোনোদিনই ছিল না। অভির ঠিক কী কারণে ওর ওপরে রাগ সেটা অবশ্য ও জানত না। অভি পড়াশোনাতেও ভালো ছিল। বয়েস স্কুলের ফার্স্ট সেকেন্ড হত। নিশা ওদের গার্লস স্কুলে দশের মধ্যে অবশ্যই থাকত। তাই অভির কথা বলার যোগ্য নয় এমনটাও নয়। তবুও অভি নিশাকে দেখলেই বিরক্ত হত। নিশা এর কারণ জানার চেষ্টাও করেনি।

একদিন অভি টিউশনে আসেনি। সেদিন মধুসূদন স্যার গল্পের ছলে বলে ফেলেছিলেন, 'আজ ভাগ্যিস অভি আসেনি, না হলে নিশার প্রথম অঙ্ক করে ফেলায় যথেষ্ট রাগ করত।'

বন্ধুরা হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ স্যার, অভির ধারণা মেয়েরা অঙ্ক পারে না। মেয়েরা আর্টস পড়বে। সায়েন্স ওদের বশের নয়। নিশা অঙ্কে ভালো বলেই অভির রাগ।'

রাগের কারণটা শুনে আরও বিরক্ত হয়েছিল নিশা। কোন মধ্যযুগে বাস করে এই ছেলে যে, মেয়েরা আর্টস পড়বে ভাবনা নিয়ে বসে আছে? মাদাম

কুরি কি ছেলে নাকি?

অভির ব্যাপারে এত দিন নিস্পৃহতা ছিল। এবারে রীতিমতো রাগ আর বিরক্তি মিশে অদ্ভুত একটা অনুভূতি জন্ম নিল।

অঙ্কের ব্যাচে মধুসূদন স্যার এক্সাম নিলেন একদিন। অভি আর নিশা একই নম্বর পেল। নিশা নিরুত্তাপ। কিন্তু অভি যে বেশ অখুশি সেটা ওর চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। এভাবে একই ব্যাচে একই টাইমে পড়াশোনা করেও ওদের মধ্যে সামান্যতম কোনো কথা হল না কোনোদিন। ওরা মাধ্যমিক পাস করে গেল। ইলেভেনে একই স্কুলে ভর্তি হল। নিশা সায়েন্স নিয়েই ভর্তি হল। অভি স্কুলেও নিশাকে চিনেও চেনে না ভান করে থাকে। নিশারও কোনো সদিচ্ছা নেই ওর সঙ্গে ভাব করার। এরকম অবস্থায় একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল স্কুলে।

স্যার অভিকে বোর্ডে ডেকেছিলেন অঙ্ক কষতে। অভি কোনো কারণে ভুল পদ্ধতিতে অঙ্কটা এগোচ্ছিল তাই অনেক চেষ্টা করেও মেলাতে পারল না। স্যার এরপরে নিশাকে ডাকলেন বোর্ডে। নিশা অঙ্কের একেবারে শেষ ধাপে এসে চকটা টেবিলে রেখে দিয়ে বলল, 'স্যার পারছি না।'

ঠিক সেইসময় অভি বলল, 'আমি কমপ্লিট করে দিচ্ছি।'

নিশার করা অঙ্কটা জাস্ট আরেকটা স্টেপ করতেই উত্তর মিলে গেল। মোটামুটি ক্লাসের সবাই সেদিন বুঝতে পেরেছিল নিশা ইচ্ছে করেই আগের স্টেপে অঙ্কটা ছেড়ে দিয়েছিল।

স্কুল ছুটির পরে চৌমাথায় আইসক্রিমের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল অভি। নিশাকে দেখেই বলল, 'আমি কি জিততে চেয়েছিলাম তোর কাছে?'

নিশা একটু থেমে বলল, 'আমি হারলে কেউ যদি আনন্দ পায়, পাক না। তাছাড়া কেউ কেউ মেয়েদের কাছে হেরে গেলে জীবন বৃথা মনে করে। আমি মনে করি তাদের জিতিয়ে দেওয়া উচিত।'

অভি হেসে বলেছিল, 'আমার সম্পর্কে হোমওয়ার্ক কমপ্লিট দেখছি। আর কী কী জানিস আমার সম্পর্কে?'

নিশা বলেছিল, 'আগে আইসক্রিম খাওয়া, তারপর বলব।'

দুজনে আইসক্রিম খেতে খেতে হাঁটছিল। এতদিনের পরিচিত হয়েও কথা না বলার বাঁধন সেদিন আলগা হয়ে গিয়েছিল।

নিশা বলেছিল, 'কারোর একজনের ধারণা যে মেয়েরা অঙ্ক পারে না, তাদের সায়েন্স নিয়ে পড়ার অধিকার নেই। কেউ একজন রেগে গেলে মারমুখী হয়। আর দীপান্বিতা একজনকে প্রপোজ করেছিল, তাকে সে বলেছে তার নাকি অঙ্ক পারে না এমন মেয়ে পছন্দ নয়। আগে যেন নিশার কাছে গিয়ে ভালো করে অঙ্ক শিখে আসে।'

অভি লজ্জা পেয়ে বলল, 'এটা তো চকলেট বলে দিল, কুলফির টেস্ট পাচ্ছি কেন বল তো?'

নিশা বলল, 'ওই যেমন অঙ্ক করতে পারে এমন মেয়ে তুই সহ্য করতে পারিস না, আবার অঙ্ক পারে না এমন মেয়ের প্রেমে পড়বি না। এমনই অদ্ভুত কম্বিনেশন আছে এই আইসক্রিমে। চকলেট আর কুলফির মিশ্রণ।'

অভি হেসে বলেছিল, 'তোকে এতদিন খুব শান্ত মেয়ে মনে হত। এখন তো দেখছি, বিচ্ছুটি।'

নিশা ওর দিকে অপলক তাকিয়ে বলেছিল, 'তোকেও তো মনে করতাম তুই খুব অহংকারী। এখন দেখলাম, জিতিয়ে দিলে তুই মিশতেও পারিস।'

নিশার বাড়ির কাছাকাছি এসে অভি বলেছিল, 'আমার জন্য অমন লাস্ট স্টেপে গিয়ে অঙ্ক ছেড়ে দিবি না। তুই পারলে আমারও কেমন একটা গর্ব হয় রাগের সঙ্গে সঙ্গে।'

নিশা মুচকি হেসে বলেছিল, 'ঠিক চকলেট আর কুলফির রেয়ার কম্বিনেশন।'

এরপর থেকে অভি নিশাকে দেখলে কেমন একটা লজ্জা পেত। বলতে চাইত অনেক কিছু কিন্তু নিশা সামনে দাঁড়ালে সব গুলিয়ে যেত। 'কী রে কেমন আছিস? খুব পড়াশোনা করছিস?' এর বাইরে আর কিছু বলা হয়ে উঠত না।

উচ্চমাধ্যমিকের ঠিক আগে আগেই টিউশন থেকে ফিরছিল নিশা। হঠাৎই অভি ওর সামনে সাইকেল থামিয়ে দাঁড়ায়। অভি কিছু জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও নিশা হেসে বলেছিল, 'ভালো আছি রে। এক্সামের প্রিপারেশন মোটামুটি ভালোই।'

অভি তখন বলেছিল, 'না, আজ এসব কথা জিগ্যেস করতে দাঁড়াইনি। অন্য একটা কথা বলার ছিল।'

নিশা উৎসুক হয়ে বলেছে, 'বল কী বলবি?'

অভি অন্যদিকে তাকিয়ে বলেছে, 'সব যে আমাকেই বলতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? তুইও তো বলতে পারিস। বুঝিস না যে তা তো নয়।'

নিশা হাসি চেপে বলেছিল, 'কী বুঝি রে? তুই আমাকে দেখলে কথা হারিয়ে ফেলিস এটা আমি বুঝি। কিন্তু তার কারণটা কী সেটা বুঝি না।'

অভি বলেছিল, 'কারণটা আর কী? যে কারণে তুই বোর্ডে অঙ্ক করতে করতে থেমে গিয়ে হেরে যাস, সেটাই ধরে নে।'

নিশা শান্ত স্বরে বলেছিল, 'আমি তোকে সর্বত্র জয়ী দেখতে চাই। কিন্তু তোর কথা আটকে যাওয়ার কারণটা আমি কী করে জানব বল?'

অভি বলেছিল, 'দ্যাখ বস, ওই হাঁটু গেড়ে প্রোপোজ করা আমার দ্বারা হবে না। তবে তুই জেনে রাখ, অনেক কিছু বলতে গিয়েও থমকে যাই।'

নিশা বলেছিল, 'তুই যতদিন থমকে আছিস ততদিন আমার মনের মধ্যে বিনা রঙে একটা ছবি আঁকা হয়ে চলেছে। ভয় করে তোকে কোনোদিন অন্য

কারোর হাত ধরে দেখব না তো। তার থেকে তোর চুপ করে থাকা ঢের ভালো। আমার মনে আঁকা হয়ে যাক ওই ছবির শেষাংশ।'

অভি বলল, 'আর যদি দেখিস ছবি শেষ হওয়ার পরে আমি অন্য কারোর হয়ে গেলাম, তখন?'

নিশা হেসে বলেছিল, 'তখন ওই ছবিটাকে খুব বকব, খুব কাঁদব।'

অভি বলেছিল, 'বুঝেছি। তোকে আর কাঁদতেও হবে না, বকতেও হবে না।'

নিশা তবুও না বোঝার ভান করে বলেছিল, 'কেন রে?'

অভি চোখটা বন্ধ করে বলেছিল, 'আমার অঙ্ক জানা মেয়েটাকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে তাই।'

এই বলে আর দাঁড়ায়নি অভি। ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। নিশা সেদিন একা বসে ছিল মদনমোহন দীঘির পাড়ে। গাছ থেকে গুলঞ্চ পড়ে দীঘির পাড়টা সাদা আর হলুদে মাখামাখি হয়েছিল। সেদিকে আনমনে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল নিশার। বারবার অভির লজ্জা পাওয়া মুখটা মনে পড়ে হাসি পাচ্ছিল। অত রাগী দাপুটে ছেলেও তাহলে লজ্জা পায়! নিশার ইচ্ছে করছিল গাছের প্রতিটা পাতায় অভির নাম লিখতে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। এর আদৌ কোনো নাম আছে কিনা জানা নেই নিশার। দু'বছর আগেও যে ছেলেটা ওকে দেখলে এড়িয়ে যেত, রেগে যেত, সে আজ ওকেই চায়। এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই ভাবনার জগতে ডুবে গিয়েছিল নিশা।

চুপিচুপি পা টিপে টিপে নিশার দরজায় চোখ রাখল অভি। নিশার ঘরের লাইট নেভানো। তার মানে, ঘুমিয়ে পড়েছে নিশা। আজ হয়তো বেশ শান্তিতেই ঘুমাচ্ছে মহারানি। অন্যদিন তো ওর ল্যাপটপের আওয়াজ, ওর সিগারেটের গন্ধে নিশার বিরক্তি উৎপাদন হয়। আজ একলা ঘরে বেশ

ভালোই আছে। দু'দিনের মধ্যে তো নিজের বাড়িতে চলে যাবে নিশা। বাড়িতে যাবে নাকি কোথাও ফ্ল্যাট ভাড়া করবে সেটা অবশ্য জানে না অভি। তবে ডিভোর্স ফাইল করলে সেপারেশনে থাকতে হবে এটা বেশ জানে। ওর মতো অপদার্থের সঙ্গে আর কাটাতে হবে না নিশাকে, এটাই তো অনেক। এই বাড়ি থেকে চলে গেলেই শান্তি পাবে। অভি কী করবে না করবে ভাবার তো দরকার নেই ওর। অভি একাই অহেতুক কষ্ট পাচ্ছে। আজ নিশ্চিন্তে মুভি বা ওয়েব সিরিজ দেখতেই পারত। ল্যাপটপে আলো জ্বলছে বলে কেউ বিরক্ত করার নেই। কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারছে না এসবে। এত সহজে এত বড় একটা কথা বলে দিল নিশা! একেবারে ডিভোর্স চায়। ওকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে না নিশার?

না, হবে না বোধহয়। কিন্তু আগে হত। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে অভির ম্যালেরিয়া হয়েছিল, প্রায় মাসখানেক অসুস্থ ছিল। তখন নিশার কষ্ট হত। তাই রোজ চিঠি লিখে পাঠাত পবিত্রকে দিয়ে। প্রতিটা চিঠি আজও যত্ন করে জমিয়ে রেখেছে অভি।

বেডরুম ছাড়ার সময় নিজের ওই টুকরো স্মৃতি জমা রাখার বক্সটাও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে এই রুমে।

বক্সটা খুলতেই কত কিছু চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিশার দেওয়া কুমার শানুর সিডি, পেন সেট, হাত ঘড়ি। ঘড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তবুও ফেলেনি অভি।

হালকা সবুজ খামে ভরে চিঠি পাঠাত নিশা যেহেতু অভির প্রিয় রং সবুজ।

একটা চিঠি খুলল অভি। তাতে লেখা আছে,

'ফোন করেছিলাম তোমায়। আন্টি বললেন, তুমি ঘুমাচ্ছ। তোমার ঘুমন্ত মুখটা খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল আমার। রাগি রাগি অভি ঘুমালে কেমন লাগে দেখার লোভ হচ্ছিল। আর কতদিন পরে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে বলো

তো? তুমি অসুখকে বলো, কেউ একজন তোমায় দীর্ঘদিন না দেখে অসুস্থ হয়ে পড়ছে তো। এক কাজ করো। তোমার অসুখকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তখন তুমি সুস্থ আর আমি অসুস্থ। দেখবে কেমন লাগে! মনে হবে এই কলেজ ক্যাম্পাস, এই ক্যান্টিন, ওই টিউশন সব সব শূন্য। বুঝবে মিস করা কাকে বলে। ওহ, তুমি তো সব সময় জিতবে তাই না। তাই এক্ষেত্রেও তোমাকে আমিই মিস করছি। বুঝতে পারছি তোমায় ছেড়ে থাকা কতটা কঠিন।

অভি তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি সাত দিন তিন ঘণ্টা পনেরো মিনিট। প্রতিটা মুহূর্তে আমি অনুভব করেছি, তোমার অনুপস্থিতির কষ্ট। এভাবে আর কতদিন?

জানো অভি, আজ ছাদে উঠেছিলাম। দেখলাম, শরতের মেঘ আঁকিবুকি কাটছে আকাশে। ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম, ওই ছোপ ছোপ মেঘগুলোতে তোমার ছবি ফুটে উঠেছে। তোমার চোখ, তোমার নাক, তোমার ঠোঁট...একটা গোটা অভি আমার বিকেলের আকাশ জুড়ে।'

চিঠিতে বা আদর করে ওরা একে অপরকে 'তুমি' বলত তখন। তুই-তুমি ওদের সম্পর্কে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছিল। কখনও প্রেমিক সত্ত্বায় তুমি এসে জুড়ে বসত, কখনও বন্ধু সত্ত্বায় তুইয়ের অধিকারবোধ।

তখন নিশা ওকে মিস করত।

এখন আর করে না। এর মধ্যে অবশ্য ওদের ব্রেকআপ হয়েছে বারবার।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের থার্ড ইয়ারে নিশার বন্ধু সৌতিককে নিয়ে খুব ঝামেলা করেছিল অভি। অভি বলেছিল, সৌতিক নিশার প্রতি দুর্বল হয়তো নিশা সেটা বুঝেও বোঝে না। নিশা কিছুতেই মানতে চায়নি অভির কথা। ও বলেছিল, সৌতিক ওর ভালো বন্ধু মাত্র। সৌতিক ওদের দুজনের সম্পর্কের কথা জানে তারপর হঠাৎ দুর্বলতা কেন দেখাতে যাবে। কিন্তু নিশার ব্যাপারে

চূড়ান্ত পজেসিভ অভির চোখে ধরা পড়েছিল সৌতিকের নিশার প্রতি আগ্রহ। এই নিয়ে সমস্যা থেকেই ব্রেকআপ করেছিল নিশা। বলেছিল এমন সন্দেহবাতিক মানুষের সঙ্গে নাকি ও থাকতে পারবে না।

প্রায় মাস দুয়েক কথা বলেনি নিশা অভির সঙ্গে।

বহুবার ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও জেদ ধরে বসেছিল। শেষে অভি মনখারাপ করে প্রায় দিনসাতেক কলেজ যায়নি। তখনই নিশা ফোন করে বলেছিল, 'ন্যাকামি না করে কলেজ আয়। তোর মতো হাড়বজ্জাত ছেলে আমি জীবনে দেখিনি। অসভ্য আর হিংসুটে তুই।'

নিশার মুখে এসব শুনলে অভি বুঝতে পারত বরফ গলেছে। আবার ওদের ভাব হত। এভাবে কত তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে নিশা ব্রেকআপ করত অভির সঙ্গে।

অভি হাজার ঝগড়া করলেও কখনও ব্রেকআপ করেনি। কিন্তু নিশা বলত, এরকম বদরাগি, মুডি ছেলের সঙ্গে নাকি জীবন কাটানো সম্ভব নয়। তারপরেও ওরা ছাদনা তলায় বসেছে। নিশার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়েছে। সাতপাকে ঘুরেছে। অভি ভেবেছিল, আর কোনোদিন ঝগড়া হলেও নিশা ওকে ছেড়ে যেতে পারবে না। কিন্তু আজ যেটা হল সেটা অভির কল্পনার বাইরে ছিল। একেবারে বাবা-মার সামনে দাঁড়িয়ে ডিভোর্সের কথা বলে দিল নিশা। এই ভাবতে ভাবতে আরো একটা চিঠি খুলল অভি।

এটা সম্ভবত নিশার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পরে ও লিখেছে।

'অভি,

তুই হয়তো ভাবছিস গতকাল তুই এসে সরি বললি আর আমায় করা সব অপমানগুলো মুহূর্তে বাতাসে মিলিয়ে গেল। না রে, মানুষের মনটা এতটাও সরল পথে চলে না। আমি হাজার চেষ্টা করলেও কিছুতেই তোর বলা ওই কথাগুলো ভুলতে পারছি না। চেষ্টা করছি আমিও। কারণ তোকে

ভালোবাসি। তোকে মিস করি। তোকে ছেড়ে থাকাটা কষ্টকর। কিন্তু তোর বলা কথাগুলো তোর বলা সরির মতো অতটা হালকা নয় বলেই হয়তো বেশ জমিয়ে বসেছে আমার মনের মধ্যে।

কী অবলীলায় বলে দিলি—এত সেজেগুজে মুভি দেখতে এসেছিস কেন? আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও তোকে দেখবে বলে? কেন রে আমি একা দেখলে বুঝি তোর ভালো লাগে না?

কে জানে কথাগুলোতে তোর পজেসিভনেস, ভালোবাসা এসবকে ছাপিয়ে গিয়ে তীব্র অপমানটুকুই আমার গায়ে এসে লাগল। তোর জন্য করা সাজগোজ, মুভি, তোর আনা পপকর্ন—সব মূল্যহীন হয়ে গেল মুহূর্তে। তবুও সিন ক্রিয়েট করতে ইচ্ছে করেনি। অভি, আমায় একটু সময় দে। সরি বলে তুই সব মিটিয়ে দিতে চাস, আমিও চাই। কিন্তু আমার মনের ক্ষতটার একটু সময় লাগবে প্রলেপ লাগাতে। সেটুকু সময় আমাকে দে প্লিস।'

অভির মনে পড়ে গেল, তখন বেশ কিছুদিন নিশা কথা বলেনি ওর সঙ্গে। কোনো রাগ অভিমান নয়, শুধু চুপ করে ছিল। একটা ঠান্ডা ব্যবহার করে যাচ্ছিল অভির সঙ্গে। অসহ্য হয়ে উঠেছিল অভির জীবনটা। নিশা ঝগড়া করছে না, রাগ নয় শুধুই শীতলতা। যে শীতলতার প্রতিটা বরফের টুকরো এসে সজোরে তিরের মতো বিঁধেছিল অভির গায়ে।

এখনও ঠিক একই পরিস্থিতি। নিশা ভীষণ রকমের শান্ত। কোনো কথা নেই। ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোন ঘরে থাকবে এই তিনদিন? বেডরুমে নাকি গেস্টরুমে?'

অভি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কোথায় থাকতে চাও?'

নিশা শান্ত গলায় বলল, 'যেটায় তুমি থাকবে না সেটায়।'

তারপর অভিই বলেছে, ও গেস্টরুমে থাকবে। তাই অভির যাবতীয় জিনিসপত্র এনে গেস্টরুমে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়ে গেছে নিশা। কোনো

অবহেলা নয়, কোনো বিরক্তি নয়, নিখুঁত ভাবে সব করে দিয়েছে ও।

অভি অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। কেমন যেন অসহায় লাগছিল ওর। নিশার এমন ঠান্ডা ব্যবহারের সামনে ও ঠিক কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না।

ওকে পায়চারি করতে দেখেই বোধহয় বাবা উঠে এসেছে। ওর পিঠে আলতো করে হাত রেখে বলল, 'ঘরে চল।'

ঘড়ির কাঁটা জানান দিচ্ছে মধ্যরাত অতিক্রম করেছে প্রায় ঘন্টাখানেক আগেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। কয়েকটা রাত চরা পাখি আর রাত জাগা কুকুরের হঠাৎ বিকট আওয়াজে ডেকে ওঠা ছাড়া এ তিলোত্তমা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।

অভির জীবনে এর আগেও যত সমস্যা এসেছে বাবাকে ও পাশে পেয়েছে। মা একটু স্পর্শকাতর। কেঁদে ফেলে কথায় কথায়। কিন্তু বাবা অত্যন্ত বাস্তববাদী বলেই বাবার সঙ্গে সব বিষয়ে কথা বলা সম্ভব হয়।

চিরন্তনবাবু অভির দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, 'যাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবলে তোমার কষ্ট হচ্ছে তাকে তুমি মন থেকে দূরে সরাতে পারোনি এটুকু নিশ্চিত। কখন মানুষ ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নেয় জানো? যখন তার ছায়াটাও অসহ্য লাগে কোনো কারণে। যখন সম্পর্কের অবনতি ঘটতে ঘটতে সেটা পলকা হয়ে যায় তখন কোনো আঘাত ছাড়াই সেটা ভেঙে পড়তে চায়। সেইসময় মানুষ বোঝে এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে গেলে শুধুই তিক্ততা আসবে। আর তাই দুজনে সিদ্ধান্ত নেয় ডিভোর্সের। কিন্তু অভি তুমি তো কষ্ট পাচ্ছ, নিশাকে ছেড়ে থাকতে হবে ভেবে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছ। তাহলে তোমাদের সম্পর্কের সুতোটা তো এখনও পলকা হয়নি, ছিঁড়েও যায়নি। হঠাৎ এমন সিদ্ধান্তের কারণটা কী? নিশাকে আমি সেই স্কুলবেলা থেকে দেখছি। তোর জন্মদিনের পার্টিতে আসত মিষ্টি, শান্ত একটা মেয়ে।

অন্যদের মতো হুল্লোড়ে নয় কিন্তু বেশ মিশুকে। তাছাড়া নিশা খুব ধীর-স্থির। এতদিনের চেনা যদি ভুল না হয়ে যায় তাহলে এটুকু নিশ্চিন্তে বলতে পারি ও ভাঙতে আসেনি এবাড়িতে, বরং ও গড়তেই এসেছে। এমন একটা মেয়ে আচমকা এরকম একটা কঠিন ডিসিশন কেন নিল অভি?'

অভি চুপ করে জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। অন্ধকার আকাশের চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারছে ও। লজ্জা করছে না। অন্ধকারের এই এক সুবিধে, আলোর মতো প্রকট নয় বলে অপরাধগুলোকে এক নিমেষে চিহ্নিত করে দিতে পারে না। আপাতত অন্ধকারকে বড্ড আপন মনে হচ্ছে অভির। বাবার করা প্রশ্নগুলো সূর্যের তীব্র আলোর মতো। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে গলাটা কেঁপে গেল অভির। অভি সামলে নিয়ে বলল, 'তোমরা তো চিরটাকাল আমার দোষ দেখে গেলে। নিশাকে গিয়ে কেউ প্রশ্ন করেছ কেন সে ডিভোর্স চায়? নাকি এই সম্পর্কের সব দায়িত্ব শুধুই আমার?'

চিরন্তনবাবু ছেলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। অভির অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে বাবা যেন সবটা পড়ে নিচ্ছে। অভির যে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে সেটা বুঝতে পেরেই চিরন্তন বললেন, 'বেশ বলো না তবে। যদিও কারোর পার্সোনাল বিষয়ে ইন্টারফেয়ার করা আমি একেবারেই পছন্দ করি না, করতামও না। তোমাদের সিদ্ধান্তকেই গুরুত্ব সহকারে মেনেও নিতাম। কিন্তু ওই একটা মানুষের কাছে আমি একটু দায়বদ্ধ, সেটা হল তোমার মা। তোমার মাকে যেদিন বিয়ে করে এনেছিলাম, সেদিন কথা দিয়েছিলাম আমার সাধ্যমতো তার সব কথা আমি রাখার চেষ্টা করব। এতদিন সেই চেষ্টা করেওছি। তনুশ্রী এতটাই ইমোশনাল তোমাদের ব্যাপারে যে, তার ধারণা কথা বললেই বিষয়টা মিটে যাবে। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম তনুকে যে, এটা শুধু রাগ বা ঝগড়া নয় তাহলে মিটে যেত হয়তো। কোনো কারণে নিশা খুব গভীরে আঘাত পেয়েছে। তাই অত শান্ত

মেয়েটা এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। কিন্তু তোমার মাকে তো তুমি চেনো, তার অভিমান তো সহজে কমে না। তাই শুধু তোমার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তোমাদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলতে এসেছিলাম আমি। এটা অত্যন্ত অন্যায় বুঝেও এসেছিলাম। আসলে তনু কাঁদছে এটা মেনে নেওয়া আমার জন্য আবার বড্ড অসহায়তার। যাই হোক অভি, রাত অনেক হল। ঘুমিয়ে পড়লেই ভালো হয়, কাল তো অফিস আছে সকলেরই।'

বাবা যেমনভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবেই চলে গেল।

অভি বলতে চেয়েছিল সবটুকুই, কিন্তু বলা হল না কিছুই। বাবা বারংবার নিশার সাইড নিচ্ছিল বলেই বলতে ইচ্ছে করল না। নিশা যেন কোনো দোষ করতেই পারে না এমন ধারণা নিয়েই বসে আছে সবাই। এদের বলবেই বা কী!

লাইট অফ করে ঘুমানোর চেষ্টা করল অভি। স্বপ্ন দেখল না সত্যিই নিশা এসেছিল ওর ঘরে, ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারল না। তবে উত্তরের জানালাটা ভোরে উঠে দেখল বন্ধ আর ওর গায়ে একটা পাতলা ঢাকা দেওয়া।

অভির ঠান্ডা লাগার ধাত বলে নিশা বরাবরই একটু সচেতন থাকে। বর্ষাকালের জোলো হাওয়া যাতে না লাগে সেজন্যই কি ও এসে বন্ধ করে দিয়ে গেছে জানালাটা? নাকি মা এসেছিল? অভি যে বন্ধ করেনি সেটা ওর স্পষ্ট মনে আছে।

অন্যদিন চায়ের কাপ দুটো নিশাই নিয়ে আসে। চা খেতে খেতে টুকিটাকি কথা হয়। আজ মা এসে চায়ের কাপটা ধরিয়ে দিয়ে গেল বিশেষ কথা না বলে। বাড়ির আবহাওয়ায় গুমোট ভাব। বর্ষার মেঘের মতো গুমরে যাচ্ছে যেন। বৃষ্টি নামলেও গুমোট কাটছে না। নিশা এল না আজ চা নিয়ে। অভির জীবনের পরিবর্তন শুরু হল আজ সকাল থেকে। অভ্যস্ত জিনিসগুলো থেকে বেরোতে হবে ওকে। নিশা আর ওর শার্ট-প্যান্ট-টাই, ওয়ালেট-ঘড়ি রেডি

করে রাখবে না। একসঙ্গে একই গাড়িতে অফিসও হয়তো যাবে না। অভির কেমন বিস্বাদ ঠেকল চা-টা। ঠিক সেই কলেজের দিনগুলোয় যখন নিশার সঙ্গে ব্রেকআপ হয়েছিল, বা কোনো কারণে কথা বন্ধ হত তখন নিকোটিনের স্বাদটাও ওর বিশ্রী লাগত। অভ্যাসবশে খেত হয়তো কিন্তু আনন্দের বদলে বিরক্তি উৎপাদন হত। আজও অভির অনুভূতিগুলো একই আছে একটুও বদলায়নি নিশার ব্যাপারে। শুধু নিশার অনুভূতিগুলোই বদলে গেছে ওর ব্যাপারে। তাই এত সহজে একটা ছোট্ট ব্যাপারে বলে দিত পারল, 'আমাদের ডিভোর্স দরকার অভি। এভাবে হয় না।'

আজকের সকালটা অন্যদিনের থেকে বড্ড আলাদা। অদ্ভুত একটা একাকীত্ব যেন ঘিরে ধরছে ওকে। জোর করে উঠে দাঁড়াল অভি। ওদের বেডরুমের দিকে তাকিয়ে দেখল নিশা রেডি হচ্ছে অফিসের জন্য।

ড্রয়িংরুমে রোজকার দৃশ্য। মায়ের ছোটাছুটি বাবাকে অফিস পাঠানোর আগে। যত্ন করে টিফিনবক্স ভরে দিচ্ছে, বাবার হাতে ঘড়িটা অবধি দিয়ে দিচ্ছে। ছোট্ট থেকে এই দৃশ্য দেখে আসছে অভি। এদের অনেক ঝগড়া হয়েছে, অভিমান হয়েছে তবুও সব ভুলে কী সুন্দর দুজনে দুজনকে বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। যদিও বাবা বলে বাবার কাছে নাকি সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মায়ের অভিমান। অভির বুকটা ভারী হয়ে এল। ওদের সম্পর্কটা কেন বিয়ের পরে দীর্ঘস্থায়ী হল না? প্রেম যখন করেছে তখন তো ওর কত দোষ ক্ষমা করে দিয়েছে নিশা, তাহলে আজ কেন এভাবে নিষ্ঠুর হল ও। এখন অভি কী করবে!

নিশার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও তো পারবে না। কারণ গতকাল যখন নিশা বলেছিল, আমার ডিভোর্স চাই, তখন অভিও রাগ দেখিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমারও মনে হয় এটাই সঠিক পন্থা।'

নিশা একটু যেন চুপ করে গিয়েছিল। অভি তখন আরও জোর দিয়ে বলেছিল, 'এভাবে কথায় কথায় ঝগড়া আমারও একঘেয়ে হয়ে গেছে। আমিও মুক্তি চাই।'

কী অদ্ভুত তাই না! চেনা গলির মোড়, চেনা চায়ের দোকান, চেনা নিজের ঘরের অন্ধকার কোণ, চেনা গানের সুর, ভীষণ চেনা মানুষটাকে রোজ দেখতে দেখতে বড্ড একঘেয়ে হয়ে যায় মন। খুব ইচ্ছে করে স্বাদ বদল হোক। কিন্তু দু'দিন এই পরিচিত সবকিছু ছেড়ে পাহাড়ে বেড়াতে গেলেই মনে হয়, অনেক হল অপরিচিতর সঙ্গে ভাব করা, এবার ফিরতে হবে। বড্ড মনকেমন করে সেই চির চেনা একঘেয়ে জিনিসগুলোর জন্য। আসলে অভ্যস্ত চোখ বেশি দিন অন্যকিছু সহ্য করতে পারে না। অভিরও একই অনুভূতি হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে ও যেন পাহাড়ের কোনো অচেনা বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে নিশা নেই। অভির মনকেমন করে উঠল, ভিতর থেকে কেউ যেন বলে উঠল ফিরে চল তোর বড্ড চেনা মানুষটার কাছে।

ঠিক তখনই ঝেঁপে বৃষ্টি নামল।

কোনোমতে ব্রেকফাস্ট সেরে গাড়ির চাবিটা হাতে নিয়ে বেরোতেই দেখল নিশা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মোবাইলে উবের ট্র্যাক করছে। বাবা বৃষ্টির আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। উবের ক্যানসেল করে দিচ্ছে বৃষ্টির জন্য।

অভি খুব সাবধানে বলল, 'গাড়ি বের করছি এসো। না হলে অফিস পৌঁছাতে দেরি হবে।'

কথা না বলে গাড়িতে উঠে বসল নিশা। না রোজ যেখানে বসে সেই সিটে নয়। আজ পিছনে বসেছে ও। দূরত্ব বেড়েছে ওদের সম্পর্কের সেটাই যেন বেশি করে প্রকট হচ্ছে নিশার এই পিছনের সিটে বসা দেখে।

প্রতিদিনের মতোই এফএম-টা অন করল অভি।

কেউ একজন কবিতা বলছে ভরাট গলায়...

"ঠিক সময়ে অফিসে যায়?
ঠিক মতো খায় সকালবেলা?
টিফিনবাক্স সঙ্গে নেয় কি?
না ক্যান্টিনেই টিফিন করে?
জামাকাপড় কে কেচে দেয়?
চা করে কে আগের মতো?
দুগগার মা ক'টায় আসে?
আমায় ভোরে উঠতে হত
সেই শার্টটা পরে এখন?
ক্যাটকেটে সেই নীল রঙটা?
নিজের তো সব ওই পছন্দ
আমি অলিভ দিয়েছিলাম
কোন রাস্তায় বাড়ি ফেরে?"

সম্ভবত এটি জয় গোস্বামীর কবিতা। বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ। গাড়ির মধ্যে ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতায় কবিতার লাইনগুলো যেন আরও বেশি অস্বস্তি দিচ্ছিল অভিকে। তাড়াতাড়ি পাল্টে দিল চ্যানেল।

নিশা বলল, 'অভি ভালো থাকিস। তোর কোনো দোষ নেই। আমি তো জানতাম তুই এরকমই। কিন্তু ইদানীং আমারই বয়েস বেড়েছে তাই কিছু জিনিস আর আগের মতো মেনে নিতে পারি না রে, সরি। তাই ডিভোর্সের ডিসিশন নিলাম। চিন্তা করিস না, কোনো খোরপোষ তোকে দিতে হবে না। আমি এমনই মিউচ্যুয়াল ডিভোর্স নেব। আমরা দুজনেই চাকরি করি তাই তোর কাছ থেকে শুধু মেয়ে হওয়ার সুবিধা নেব, এমন নয়।

শোন না, তোর সব দরকারি ফাইল আমাদের আলমারির ডান দিকের লকারে গুছিয়ে রেখেছি। আর তোর মোজা, রুমাল এগুলো নীচের তাকে

থাকল।'

অভির কান্না পাচ্ছিল। বলতে ইচ্ছে করছিল, 'প্লিস নিশা, ওই ভুল আর কখনও করব না। আমায় ছেড়ে যাস না প্লিস। তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।' কিন্তু বলতে গিয়েও বলা হল না। শুধু বলল, 'বেশ।'

নিশা বলল, 'বাপির সঙ্গে কথা হয়েছে ফোনে। পরশু ফিরে যাব ওই বাড়িতে। তাহলে আগামীকাল চল কোর্টে গিয়ে ফাইলটা করে আসি।'

অভি ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ চল।'

অভি আচমকাই বলল, 'আরেকবার ভেবে দেখা উচিত আমাদের দুজনেরই।'

নিশা একটু থমকে গিয়ে বলল, 'সম্পর্কটা কিন্তু কম দিনের নয় অভি। এরপরেও যদি তুই আমায় বিশ্বাস না করতে পারিস, তাহলে সেই সম্পর্কটার গভীরতা যে এক চুল বাড়েনি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত। অফিসে থাকাকালীন আমিও তোকে বহুবার ফোন করে পাইনি, কই আমি তো তোকে কোনোদিন বলিনি যে তুই কোনো মহিলা কলিগের সঙ্গে কফি খেতে গেছিস। আর যদি গিয়েও থাকিস তাতেই বা কী? অথচ আমি অফিসে মিটিংয়ে থাকলে, কোনো কারণে তোর ফোন রিসিভ না করতে পারলেই তুই বলতে শুরু করিস, 'বসের রুমে ছিলিস? প্রাইভেট কথা হচ্ছিল বুঝি? ফোন রিসিভ করলি না কেন?' এগুলো কী অভি? দয়া করে স্কুলের মতো এগুলোকে পজেসিভনেস বলে হালকা করার চেষ্টা করিস না। এই বয়েসে এসে এগুলো মানায় না বুঝলি!'

অভি বলল, 'পজেসিভনেসের কোনো বয়েস হয় না। তাছাড়া তুই সুন্দরী। আর তোর বসকে আমার মোটেই পছন্দ নয়। তাই জিজ্ঞাসা করেছি। এতে এত রিয়্যাক্ট করার কী আছে বলবি? আরে তুইও তো আমার প্রতি একটু

পজেসিভ হতে পারতিস? আমি কি বলেছি, আমায় তুই এতটাও বিশ্বাস করে ছেড়ে দে?'

নিশার জাস্ট বিরক্ত লাগছিল। এই বয়েসে এসে এমন স্কুল-কলেজের প্রেম মোটেই পোষাচ্ছে না নিশার। একটু তো ম্যাচিওরিটি দরকার অভির। সবকিছুর একটা বয়েস আছে। পজেসিভনেস নয় এটা, এটাকে সন্দেহবাতিক বলে। অনেক সহ্য করেছে অভির এসব রাগ-অভিমান, আর নয়। এবার বুঝুক অভি ওকে ছাড়া।

নিশা নেমে গেল অফিসে। অভি চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'ফেরার সময় নিয়ে যাব।'

নিশা বলল, 'আমি উবের করে নেব। তোকে আসতে হবে না।'

অফিস থেকে বাড়ি ঢুকেই অভি দেখল নিশা বসে আছে ড্রয়িংরুমে। ওর চোখে জল। মা রীতিমতো কাঁদছে। বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে বই হাতে। অভি কিছু বোঝার আগেই নিশা বলল, 'মা চলে যাচ্ছে। এই বাড়িতে বাবার সঙ্গে আর থাকতে চায় না।'

অভি আরেকটু হলেই সোফার পায়ায় হোঁচট খেত। মা দু-একবার ঝগড়া করে একদিন কথা বন্ধ রেখেছে বাবার সঙ্গে, সেই অবধি ঠিক ছিল। কিন্তু একেবারে ছেড়ে চলে যাবে মানেটা কী?

মায়ের সামনে একটা ট্রলি ব্যাগ রাখা। নিশা মাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করছে কোনো একটা ব্যাপারে। কিন্তু মা কিছুতেই বুঝতে চাইছে না। মায়ের একটাই কথা, 'তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে এখনও এত সন্দেহবাতিক পুরুষ হয় কী করে? আমি আর ওর সঙ্গে ঘর করতে পারব না নিশা। তুই আমায় দিয়ে আসবি চল।'

অভি বাবার সামনে বসে বলল, 'কী হয়েছে? কী করেছ তুমি মায়ের সঙ্গে?'

চিরন্তনবাবু রেগে বললেন, 'তোমার এটা কেন মনে হল যে, আমিই দোষী তোমার মা নয়? জিজ্ঞাসা করো তোমার মাকে সে কী করেছে!'

অভি বলল, 'এ তো মহা মুশকিল! এই বয়েসে এসে কীসের এত ইগো গো? বলো কী হয়েছে?'

নিশা মাকে বোঝাচ্ছে, 'শোনো রাগ করো না। বাবা তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসে— এটা তো তুমি মানবে। তাই হয়তো মজা করেই বলেছে।'

তনুশ্রী বললেন, 'কীসের মজা রে নিশা! অরবিন্দদা আজ এত বছর এই ক্লাবের সেক্রেটারি। প্রতিবছর আসেন বাড়িতে চাঁদা নিতে। এসেই বলেন, এক কাপ কড়া করে চা খাব তনুশ্রীর হাতের। এতে দোষ কোথায়? আরে, বলতে পারেন না? তোর বাবা বলে, সবার নাকি বাড়িতে গিয়ে চাঁদা তোলে না অরবিন্দ। সব জায়গায় ক্লাবের ছেলেদের পাঠায়। একমাত্র আমাদের বাড়িতেই নাকি আমার হাতের চা খেতে আসে। আর আমি নাকি এটা প্রশ্রয় দিই। এলেই গদগদ হয়ে হেসে চায়ের সঙ্গে টা দিই। তুই বল নিশা, এই অপবাদ কেন সহ্য করব আমি? আমি ডিভোর্স নেব।'

অভি আর নিশা চুপচাপ চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। নিশার ঠোঁটে অস্বস্তি। অভির চোখে কৌতুক। নিশা বলেছিল না বয়েস হলে পজেসিভনেস কমে যায়! আর ভালোবাসা থাকলে এই হিংসুটেপনাও থাকবে। বাবার উনষাট বছরেও আছে।

অভি বিচারকের ভূমিকায় বসে বলল, 'দেখো এসব করে লোক হাসিও না। ডিভোর্সের ইস্যু এটা হতে পারে না।'

চিরন্তনবাবু বললেন, 'তোকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি তোদের ডিভোর্সের ইস্যু কী? তাহলে তুই এত বড় বড় কথা বলছিস কেন? তোরা নিজের ঘরে যা।'

তনুশ্রী বাড়ির দরকারি চাবি নিশার হাতে দিতেই নিশা জড়িয়ে ধরল মাকে। বলল, 'শোনো মা, তোমায় একটা কথা বলি, ছোট্ট কারণে আমরা কেউই ডিভোর্স নেব না, বরং ওই অরবিন্দকাকুকে ডেকে তুমি ডিনার করিয়ে ছাড়বে এবার থেকে। যাদের সমস্যা হবে তারা বুঝে নেবে। আসলে যত বয়সই হোক পুরুষমানুষ বদলায় না।'

অভি বলল, 'একদম ঠিক। আমরা উজাড় করে ভালোবাসতে পারি। তাই লক্ষ রাখতে হয় অনেক বেশি।'

নিশা কোনো কথা না বলে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। অভিও পিছন পিছন গিয়ে বলল, 'এই যে মহারানি, তাহলে বুঝলে তো ভালোবাসা, পজেসিভনেস এসবের কোনো বয়েস হয় না। এটাকে সন্দেহবাতিক বলে না। নিজের জিনিস আগলে রাখা বলে।'

নিশা বিরক্ত মুখে বলল, 'আসলে ভুলটা তো আজ করিনি রে। ওই মধুসূদন স্যারের টিউশনে ঢুকেই মস্ত বড় ভুল করেছিলাম। আজীবন এই ভুলের বোঝা আমাকে এভাবেই বয়ে বেড়াতে হবে। অসহ্য রকমের বিরক্তিকর একটা মানুষ।'

অভি আচমকা ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'প্লিস সহ্য করে নে। তুই ছাড়া আমার সব কিছু বর্ষার মেঘের মতো থমথমে হয়ে যায়।'

চিরন্তনবাবু বললেন, 'বেশ কড়া করে চা করো দেখি এককাপ। যেমন অরবিন্দর জন্য করলে।'

তনুশ্রী হেসে বললেন, 'এই জন্যই তোমায় পাড়ার সবাই ডাকে তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য। তুমি কী করে জানলে যে ওদের এটাই প্রবলেম?'

চিরন্তনবাবু বললেন, 'দোষটা যে অভির সেটা আগেই বুঝেছিলাম। আজ সকালে নিশাকে ফোনে বলতে শুনলাম, 'আরে ওই আধবুড়ো বসের কাছেও ঘেঁষতে দেবে না অভি। এমন হলে চলে বল? সেই স্কুল থেকে একটুও

বদলালো না। তখনই বুঝলাম সমস্যাটা আসলে কোথায়? নিশাকে এসব বলার জন্যই মেয়েটা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে। অভির যে কবে বুদ্ধি হবে কে জানে!

তবে একটা কথা কিন্তু সত্যি, তোমাকে অরবিন্দ খুব মন দিয়ে দেখে, বুঝলে।' তনুশ্রী ফিক করে হেসে বললেন, 'বেশ, তাহলে ওকে একদিন ডিনারে নিমন্ত্রণ করি।'

চিরন্তনবাবু বললেন, 'আসলে এরা এখনও জানে না যে একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। এদের সম্পর্কের সুতোটা বড্ড মজবুত করে বাঁধা। এমন বন্ধনে ডিভোর্স হয় না। ডিভোর্স কেন, বিরহও সহ্য হয় না। ভাবছি কাল থেকে অভিকে একটু বউয়ের মন ভোলানোর উপায় শেখাব।'

তনুশ্রী চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওহ এতদিনে বুঝলাম এসব তাহলে আমাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা মাত্র!'

চিরন্তনবাবু হেসে বললেন, 'পারলে এ গিঁট খোলো দেখি।'

নিশা-অভির ঘরে গান বাজছে...

'আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে

আছো তুমি হৃদয় জুড়ে।

আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে

আছো তুমি হৃদয় জুড়ে।'



সাত দিন পরে

'প্রথমে একটা কথা বলুন তো, আপনি নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী জবটা পেয়েছেন তো? নাকি ধরে কয়ে? মানে, বাবার মুখে এতদিন শুনছিলাম হেভি ব্রিলিয়ান্ট একজন আসবে। ইয়া বড় রেলের অফিসার। এত কম বয়সে এমন উন্নতি নাকি লোকজন চাক্ষুষ করেনি। আমার তো মনে হল, এসব জাস্ট ঢপের গল্প।'

সৌরিশ অপলক তাকিয়ে আছে আহেলী নামক মেয়েটার দিকে। প্রথম দর্শনে কোনো মেয়ে যে এত কথা বলতে পারে, এটাই যেন ওই কাছে বিস্ময়। তাও আবার পাত্রপক্ষের কাছে। পাশের ঘরে যতক্ষণ বসেছিল, ততক্ষণ তো বেশ শান্ত নম্র হয়েই বসেছিল। 'একলা কথা বলতে চাই' বলে নিজের ঘরে এনেই কথার তুবড়ি ছোটাতে শুরু করল আহেলী।

সৌরিশ বরাবরই ভীষণ শান্ত স্বভাবের। এত কথা বলায় পারদর্শী নয়। তবুও শান্তভাবে বলল, 'আমার অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের সবকিছুই তো বায়োডাটার সঙ্গে ছিল। আপনি দেখেননি? তাহলে সেগুলোকে আচমকা মিথ্যে মনে হওয়ার কারণ?' আহেলী বলল, 'সামান্য ইশারা বুঝছিলেন না

বলে ব্রিলিয়েন্সি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলাম। বয়েজ স্কুলে পড়েছেন, তাই না?’

সৌরিশ বলল, ‘আমি মিশনের ছাত্র।’

আহেলী হেসে বলল, ‘বুঝেছি। দূর দূর তক কল্পনা করতে পারেননি যে, কোনো মেয়ে ইশারায় আপনাকে ডাকছে আলাদাভাবে একটু কথা বলার জন্য। এনিওয়ে এটা কী প্রথম মেয়ে দেখতে এলেন, নাকি অভিজ্ঞতা আছে? এসিটা একটু বাড়িয়ে দেব? ঘামছেন কেন? আরে মলেস্ট করব না আপনাকে। দুটো কথা বলেই ছেড়ে দেব।’

নিজের কাজের জায়গায় এনাফ সাকসেসফুল সৌরিশের স্মার্টনেস নিয়ে কোনো কথা হবে না। কিন্তু মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে হলে ও একটু সমস্যায় পড়ে।

খেয়াল করে দেখেছে, মহিলাদের বলা হয় এক, আর ওরা বোঝে আরেক। নিজের মা, মাসিমনি, মাসির মেয়ে অঙ্কিতা সবাই এই একই গোত্রের। অন্যের কথা শোনার প্রয়োজন নেই। নিজেরাই নিজেদের মতো করে যুক্তি সাজিয়ে নিয়ে কখনও হেসে গড়িয়ে পড়ছে, আবার কখনও দুঃখে কেঁদে ভাসাচ্ছে। তাই মহিলামহলের যুক্তিতর্ক থেকে বরাবরই দূরে থেকেছে সৌরিশ।

বাবা বলে, ‘দু’দিকে ঘাড় নাড়িয়ে গেলাম আজীবন। তবেই এ সংসারে সুখ দেখতে পাস সৌর। না হলে দেখতিস তোর মায়ের অযৌক্তিক যুক্তির ঠ্যালায় আমাদের পোঁটলা বেঁধে হিমালয় যাত্রা করতে হত। একটা কথা সার বুঝে নিয়েছি, মেয়েদের বোঝাতে গেছ তো তোমার যাবতীয় শিক্ষা বৃথা। ওরা যেটা বলবে, সেটাকেই অন্তত ওদের সামনে ঠিক বলো, তাহলে গ্রীষ্মকালের দাবদাহের মধ্যেও শান্তির বৃষ্টি। বিয়ের পর থেকে আমি এই মতাদর্শ অবলম্বন করে কাটিয়ে দিলাম। ওই জন্যই তোর মা বলে, ‘সৌরর

বাবার মতো মানুষ হয় না।' আর তোর মেসোকে দেখ ঝগড়া করে করে হেরে গো-হারা হয়ে কাটিয়ে দিল। আজ অবধি তোর মাসির কাছে ঝগড়ায় শেষ রক্ষা করে জিততে পারেনি, তবুও নিজের যুক্তি খাটাতে গিয়ে নাকানিচোবানি খায়। এত বলি, 'বাসুদেব, যা পারবে না, তাতে শক্তিক্ষয় করো কেন?' কিন্তু কে শোনে কার কথা!'

বাবা, মেসো এসব বিজ্ঞ মানুষদের পরাস্ত হতে দেখে দেখে সৌরিশ মহিলাদের একটু ভয়ই পায়। ত্রিশ বছর বয়সে ও একবারই প্রেমে পড়েছিল, তাও একতরফা। মেয়েটাকে কোনোদিন প্রোপোজ করে উঠতে পারেনি। সাহসে কুলায়নি। যদি রাস্তার মাঝে টেনে থাপ্পড় কষিয়ে দেয়, তাহলে গুড বয় সৌরিশের ইমেজের ফালুদা হয়ে যাবে। সেই ভেবেই আর এগোয়নি। দূর থেকেই দেখতে পেত মাধুরীকে। পাড়ার লোক বলত, নিজেকে মাধুরী দীক্ষিত মনে করে। কিন্তু মাধুরীর নিজেকে নিয়ে ওই অল্প অহংকারটাই সৌরিশকে আকর্ষণ করেছিল। মাধুরী নিজেকে ঠিক কী মনে করত জানা নেই সৌরিশের। তবে মনে হত, ও নিজের জগতে মত্ত থাকে। আশেপাশে কে কী করছে তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। মাধুরীর হাঁটার মধ্যে বন্ধুরা একটা দম্ভ খুঁজে পেত। সৌরিশ পেত আত্মবিশ্বাস। এত কিছুর পরেও স্বতন্ত্র স্বভাবের মাধুরীকে প্রোপোজ করা হয়ে ওঠেনি ওর। পড়াশোনা ছাড়া জীবনে আর কী করেছে ও, সেটা সৌরিশ নিজেও জানে না। সৌরিশ মানেই বই মুখে বসে থাকা আর ভালো রেজাল্ট আর গুরুজনদের উদাহরণ। 'দেখেছিস? সৌরিশকে দেখে শেখ।'

বড্ড একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল ওর জীবন। তাই হয়তো নিজের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের প্রতি ওর একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল। হয়তো নিজে হতে পারবে না বলেই আকর্ষণ ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় দেখেছে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে বসে তুমুল আড্ডা দিয়েছে, সিগারেট ফুঁকেছে, ড্রিংক

করেছে, স্ল্যাং ইউজ করেছে যথেচ্ছ। আর সৌরিশ রয়ে গিয়েছিল শুধুই ভালো ছেলে হয়ে। জীবনে এই একটা তকমা যাতে ওর কাছ থেকে কেউ না নিয়ে নেয়, তারই চেষ্টা ও চালিয়ে গেছে। ত্রিশ বছর বয়সে এসে বুঝেছে, স্কুল লাইফ, কলেজ লাইফ কোনোদিন আর ফিরবে না। তাই যারা নিজেদের কোনো বেড়াজালে না জড়িয়ে মুখোশহীনভাবে জীবনটাকে এনজয় করতে পারে তাদের সৌরিশ ভিতরে ভিতরে একটু হিংসাই করে।

আহেলী চোখের সামনে তুড়ি বাজিয়ে বলল, 'এই যে স্যার... রূপকথার জগতে অনেক কিছু আছে আমি শুনেছিলাম ঠাকুমার কাছে। তাই ওই জগতে প্লিস ভেসে যাবেন না। ওখানে ভেসে গেলে আপনাকে আমার আসল কথাটাই বলা হবে না। তাই প্লিস, এই জগতে মাত্র পাঁচ মিনিট বিচরণ করুন।'

সৌরিশ অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, বলুন।'

আহেলী বলল, 'দেখুন আমরা হলাম নিতান্ত মিসম্যাচ। আপনি হলেন গিয়ে জেন্টলম্যান, মশা মারতে গেলেও জেসাসের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলবেন, 'হে প্রভু আমায় ক্ষমা করুন। এই মশাটি দীর্ঘক্ষণ ধরে আমায় কামড়ে কামড়ে হাত ফুলিয়ে দিল, তাই আমি বাধ্য হয়ে ঈশ্বরের সন্তানকে হত্যা করতে প্রস্তুত হলাম।' এইরকম টাইপের মানুষ। আমি হচ্ছি সম্পূর্ণ তার অপজিট। মশা উড়ছে দেখলে আমার ঘরে ঢোকার অপরাধে তাদের উঠে গিয়ে মেরে আসি।

আপনি হচ্ছেন, ভিড় ট্রেনে ওঠার আগে 'এক্সকিউজ মি, সাইড প্লিস' বলা পাবলিক। আর আমি হলাম, 'গেটটা ছেড়ে দাঁড়া শুয়োরের দল' বলা পাবলিক। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এটা হল পারফেক্ট মিসম্যাচ। ঠিক এই কারণেই আপনাকে এঘরে ডেকে আনলাম। ওঘরে গুরুজনরা ছিলেন। ওদের সামনে এসব বললে হার্টফেল করার সম্ভাবনা ছিল ওদের। কিন্তু তাই বলে

তো আমি আপনাকে ঠকাতে পারি না। আসল আমিটা কী বস্তু সেটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। দেখুন আমি ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল না হতে পারি, কিন্তু লয়্যাল ছিলাম বস। জীবনে টুকলি না করেই পাশটাশ করে এই চাকরিটা করছি। হতে পারে স্যালারি কম। হতে পারে প্রাইভেট ব্যাঙ্ক। তবুও নিজের চেষ্টাতেই পেয়েছি। তাই একজন সৎ নাগরিক হিসেবে আমার মনে হল সত্যিটা ক্লিয়ার করা উচিত।'

সৌরিশ বলল, 'এর আগে আপনাকে আর কতজন পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছিল?' আহেলী আঙুল গুনে বলল, 'আপনারা পাঁচ নম্বর।'

সৌরিশ বলল, 'তাদেরকে কি আপনি রিজেক্ট করেছেন, নাকি, আপনার সঙ্গে স্বভাবের মিসম্যাচ হয়ে তারা বাতিল করেছে?'

আহেলী একটু চমকে উঠে বলল, 'আরে না না। হাতের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে? আমি কাউকে বাতিল করিনি বিশ্বাস করুন। কিন্তু কোনো শান্ত-ভদ্র ছেলে কেন আমার মতো ঠোঁটকাটা পাবলিককে বিয়ে করবে বলুন তো? এই আলাদাভাবে নিজেকে চেনাতে এসেই বাতিল হয়েছি সবগুলোর কাছে। আপনি ভাবতেই পারেন তাহলে কেন নিজের আসল স্বভাবটা সকলের সামনে আনছি! ওঘরে যেমন ভদ্র হয়ে ছিলাম তেমনই তো থাকতে পারতাম। ওই যে বললাম, স্বভাবে আমি ভীষণ লয়্যাল। আমি চাই না বিয়ের পরে কেউ আঁতকে উঠুক। দেখুন, যার যা স্বভাব সেটা ফুটে উঠবেই তার আচরণে। মুখোশ ব্রাইডাল মেকআপের মতোই ধুয়ে যাবে। তখন শুরু হবে আসল অশান্তি। তার থেকে সব ক্লিয়ার হয়ে যাওয়া ভালো। আমি এরকমই। মোটেই ওয়াইফ মেটিরিয়াল নই। এবারে নিশ্চয়ই আপনি ওঘরে গিয়ে সকলের সামনে বলে দেবেন, মেয়ে আমার পছন্দ নয়।' একটু দুঃখ দুঃখ গলা করে আহেলী বলল, 'এটাই আমার ভবিতব্য বুঝলেন। বাবা বাজারের সেরা ছেলেদের ধরে আনছে, সরি, মানে সম্বন্ধ আনছে আর কী। আর

আমার এই চঞ্চল টাইপ স্বভাবের জন্য সবাই চলে যাচ্ছে রিজেক্ট করে দিয়ে। বিশ্বাস করুন, আমার গাইতে ইচ্ছে করে...বাবা আমার কি বিয়ে হবে না?'

সৌরিশ ফিক করে হেসে বলল, 'এইটুকু আলোচনার মধ্যে আপনি নিজেকে অন্তত দশবার লয়্যাল বলেছেন। অথচ এখনও অবধি সত্যিটা বললেন না, এটা কি ঠিক করলেন?'

আহেলী একটু কাঁচুমাচু করে বলল, 'সত্যি বলতে? আর কোন সত্যির কথা জানতে চাইছেন? দেখুন স্মোক আমি রেগুলার করি না। কালেভদ্রে কোনো বন্ধুদের পার্টি থাকলে ওই দু-এক টান।'

সৌরিশ আরেকটু চওড়া হেসে বলল, 'যাই হোক, আমার কিন্তু আপনাকে ভীষণ পছন্দ হয়েছে। সত্যি বলতে কী, এত স্পষ্ট কথা আমিও হয়তো বলতে পারতাম না। যার এমন সৎ সাহস আছে তাকে আমি স্যালুট করি। আরেকটা কথা জানেন তো, বিপরীত মেরুর আকর্ষণ থাকে সব থেকে বেশি। যেহেতু আমরা দুজনে দুই মেরুর, তাই আশা করা যায় আমরা জমিয়ে সংসার করব। এখন বলুন, আপনার আদৌ আমাকে পছন্দ হয়েছে তো? মানে আমি একটু শান্ত স্বভাবের। কথা কম বলে সব কিছু এনজয় করা পাবলিক। আপনার মতো এতটা উচ্ছল হয়তো নই, কিন্তু তা বলে বোরিংও নই। চিন্তা করবেন না, আপনি একটু গড়েপিটে নিলে চলে যাব মার্কেটে। একেবারে অচল পয়সা নই। যাই হোক, আহেলী এখন চলুন, আমরা পাশের ঘরে যাই। ওরা হয়তো আমাদের মতামতের জন্য ওয়েট করছে।'

আহেলী প্রায় কঁকিয়ে উঠে বলল, 'আপনি কি এখনই আপনার মত জানিয়ে দেবেন নাকি? আপনি বরং বলুন মিনিমাম দিন সাতেক সময় লাগবে। আরে, আপনি সেন্ট্রালের জব করেন, দেখতে শুনতে মন্দ নয়,

ভালো ফ্যামিলি। মেয়ের বাবার কাছে একটু দেমাক নেবেন না? তাই কখনও হয়? বলুন দিন সাতেক পরে জানাবেন।'

সৌরিশ বলল, 'দিন সাতেকের মধ্যে আপনার বয়ফ্রেন্ড রাজি হবে আপনাকে বিয়ে করতে? কত দিনের সম্পর্ক আপনাদের?'

আহেলী একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, 'তিন বছরের।'

সৌরিশ বলল, 'যে ছেলে তিন বছরে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, সে সাতদিনের মধ্যে নিয়ে নেবে আপনার মনে হয়? বেশ, আমি সাত দিন পরেই আমার মতামত জানাব আপনার কথা মতো।'

আহেলী বলল, 'আপনি কী করে বুঝলেন আমি এনগেজড?'

সৌরিশ বলল, 'ধরে-কয়ে নয়, রেজাল্টের এক নম্বর দাগটা আমায় অর্জন করতে হয়েছে ম্যাডাম। তাই ব্রেনটা পুরো ফাঁকা নয়।'

আহেলী মাথা নীচু করে বলল, 'সরি। বাবাকে বলতে পারছি না আমাদের সম্পর্কের কথা। বাবা কিছুতেই মেনে নেবে না প্রদীপ্তকে। আসলে প্রদীপ্ত খুব বড় চাকরি করে না। ছোট একটা চাকরি করে। ওই জন্যই বাবা রাজি হবে না। আর বাবাকে বলার সাহস নেই আমার। আজ অবধি বাবা আমার জন্য যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগুলো সব আমার ভালো করেছে। তাই বাবার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার জন্য বাবার নেওয়া সিদ্ধান্তই শেষ কথা। বাবাকে কোনোভাবেই কষ্ট দিতে পারব না আমি। তাই কিছু বলতেও পারছি না। এদিকে প্রদীপ্তকেও ভালোবাসি। কী যে সমস্যায় আছি! পাত্রপক্ষ ক্যানসেল করে দিলে একটু নিশ্চিন্ত হই। হয়তো বাবা বিরক্ত হয়ে বলবে, 'অলি তোর কোনো পছন্দ থাকলে বল।' তখন আমি প্রদীপ্তকে সামনে এনে দাঁড় করাব। এই আশাতেই আছি।'

সৌরিশ বলল, 'বুঝলাম। আমার কপালেও দেখছি বিয়েটা নেই। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট হয়ে গিয়েও কেঁচিয়ে গেল। যাক গে, আর কী করা যাবে।

বেশ, আমি সাতদিন পরে আপনাকে রিজেক্ট করছি আপনার কথা মতো।'

আহেলী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, 'আপনি সত্যিই ভালো মানুষ। আমরা বন্ধু হতে পারি?'

সৌরিশ বলল, 'সে হতেই পারি। কিন্তু মুশকিলটা অন্য জায়গায়। আমি অকারণে দুর্বল হয়ে পড়ব আপনার প্রতি। তার থেকে বরং দূরত্ব ভালো। বেস্ট অফ লাক। আপনি আর প্রদীপ্ত ভালো থাকবেন।'

সৌরিশ আর আহেলী বাইরে বেরিয়ে এল। আহেলীর বাবা-মা বেশ প্রত্যাশা নিয়ে তাকালেন সৌরিশের দিকে। অদ্ভুত একটা মনখারাপ করছে সৌরিশের। আহেলীকে প্রথম দর্শনেই ভালো লেগেছে বলে নয়, আহেলীর কথাবার্তা শুনে ওর প্রেমে পড়ে গেছে বলেও নয়, ওর বাবা আসার পর-পরই বলেছিলেন, 'সৌরিশকে জামাই হিসাবে পেলে শুধু অলির নয়, আমাদের জীবনটাও নিশ্চিত হয়। বড্ড আদরে মানুষ করেছি কিনা মেয়েকে। যার তার হাতে দিতে মন সয় না।'

অয়ন পালের কথাগুলো শুনে কেমন একটা গিলটি ফিলিংস হচ্ছিল। সৌরিশের যদি আহেলীকে পছন্দ না হত, বা আহেলীর না হত তাহলে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু একটা মিথ্যা বলার দায়িত্ব ও কাঁধে নিয়েছে, তাই বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু আহেলী যে ওই প্রদীপ্ত নামের ছেলেটাকে বেশ ভালোবাসে সেটা বোঝা গেল ওর পাত্রপক্ষের সামনে নিজেকে খারাপ প্রতিপন্ন করার আকুল ইচ্ছে দেখে। বাবা-মেয়ের মধ্যে এভাবে পড়ে গিয়ে সৌরিশের বেশ সমস্যা হচ্ছে।

সৌরিশের মা বললেন, 'ঋষি, মেয়ে পছন্দ হয়েছে? বাকি অয়নদাকে তোর বাবা বা মামারা চেনেন। অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। ফ্যামিলি খুবই ভালো। আহেলী মেয়েটাও বেশ মিশুকে। তোর আপত্তি না থাকলে আমরা কথা এগোব।'

সৌরিশ মাকে আস্তে আস্তে বলল, 'দিন সাতেক সময় দাও মা। এটা আমার সারা জীবনের সিদ্ধান্ত। একটু ভাবা দরকার।'

সৌরিশের মা কেমন একটা সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ভাব তাহলে। আমরা অয়নদাকে ওই কথাই বলছি না-হয়।'

আহেলী বেরিয়ে আসার সময় এগিয়ে এসে সবার কান বাঁচিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ বড্ড ছোট্ট শব্দ। আমি কৃতজ্ঞ রইলাম আপনার কাছে। আমার ফোন নম্বরটা দিলাম, কখনও কোনো প্রয়োজনে বন্ধু ভেবে ফোন করতে পারেন।'

সৌরিশের অদ্ভুত একটা কষ্ট হচ্ছে। কেমন যেন শূন্যতা। আচমকা মনে হল, প্রদীপ্তর আগে যদি আহেলীর সঙ্গে দেখা হত সৌরিশের, তাহলে বেশ ভালো হত। মেয়েটা যেন পাহাড়ি নদীর মতো ঝকঝকে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তলদেশের পাথরগুলোও পরিষ্কার দেখা যায়।

কেন কে জানে আহেলী অন্য কাউকে ভালোবাসে জানার পরও, ওকে রিজেক্ট করার পরেও, আহেলীর ওপর ওর রাগ হচ্ছে না।

সৌরিশ ফিরে এসেছে, হাতে সাতদিন সময় আছে আহেলীর। এবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। সবাই সৌরিশ নয় যে, আহেলীর কথা শুনে ওকে রিজেক্ট করে দেবে। কেউ কেউ তো এভাবে ডেকে এনে অপমান করার জন্য আহেলীর বাবাকে অবধি অপমান করতে ছাড়বে না। মেয়ে বিয়ে করতে চায় না, আর পাত্রপক্ষকে ডেকে এনে ইয়ার্কি হচ্ছে বলে হয়তো চূড়ান্ত অপমান করে দিল ওর বাবাকে! বাবার অপমান কিছুতেই সহ্য হবে না আহেলীর। এবারে ডিরেক্ট প্রদীপ্তকে এনে বাবার সামনে দাঁড় করানোর সাহস জোগাড় করতে হবে ওকেই। প্রদীপ্তর দিক থেকে যে এক পা-ও এগোবে না, সেটা ও ভালোই জানে। ইনফ্যাক্ট, মেট্রোতে যেদিন প্রদীপ্তর সঙ্গে ওর প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিন ওর পার্স পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। সেটাও হাতে তুলে নিয়ে ওকে ডাকবে কিনা চারবার ভেবেছিল প্রদীপ্ত। সেই

অবস্থাতেই প্রদীপ্তর হাতে নিজের পার্স দেখে চমকে উঠেছিল আহেলী। এমন ভদ্র পোশাকের পকেটমারকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, হল্লা করা উচিত ভেবেই রেডি হচ্ছিল আহেলী। তখন খুব সংকোচের সঙ্গে প্রদীপ্ত বলেছিল, ‘ম্যাডাম, আপনার পার্সটা নীচে পড়ে গিয়েছিল। এই নিন।’

আহেলী বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ‘এখুনি তো ধোলাই খাওয়াবার ব্যবস্থা করছিলাম। কোন গ্রহে বাস করেন যে, পার্স ফেরত দিতে এত সংকোচ!’

প্রদীপ্ত মাথা নীচু করে বলেছিল, ‘বুঝতে পারছিলাম না কী বলে ডাকা উচিত।’ আহেলী মুচকি হেসে বলেছিল, ‘আপনারা আছেন বলেই এই নীলগ্রহটা মঙ্গলে পরিণত হয়নি।’

দু’দিন পরে আবারও মেট্রোতে দেখা হয়েছিল প্রদীপ্তর সঙ্গে। চোখাচোখি হতে হালকা হেসে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল প্রদীপ্ত। লাজুক লাজুক ছেলেদের দেখে বেশ মজা লাগে আহেলীর। চিরকালের ডাকাবুকো মেয়ে ও। স্কুল-কলেজ সব জায়গায় নেতৃত্ব দেওয়া পাবলিক। স্যারদের কাছে ও নালিশ করতে যেত, পিছনে থাকত লম্বা বাহিনী। কলেজে তিনবছর ইউনিয়ন করেছিল। থার্ড ইয়ারে জিএস হয়েছিল। সুতরাং বরাবরই ও নেত্রী গোছের।

আহেলী এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, ‘লজ্জা পাচ্ছেন কেন আমায় দেখে?’

প্রদীপ্ত অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, ‘কই না তো!’

আহেলী হেসে বলেছিল, ‘আরে সেদিন তো আপনাকে থ্যাঙ্কস জানানো হয়নি। এমনকী কফি অবধি খাওয়ানো হয়নি। আজ চলুন আপনাকে কফি খাওয়াই। আপনি সেদিন পার্সটা না তুললে চোপাট হয়ে যেতে পারত।’

প্রদীপ্ত বলল, ‘আরে না না, ঠিক আছে। তাছাড়া আপনি তো আমার দু’স্টপেজ আগে নামেন।’

আহেলী মুচকি হেসে বলেছিল, ‘আপনি আজ আমার সঙ্গেই নামুন। পরের মেট্রো ধরে চলে যাবেন।’

প্রদীপ্ত কাঁচুমাচু করে বলেছিল, ‘না, মা চিন্তা করবে, মাকে বলে আসা হয়নি তো।’ আহেলী বুঝেছিল, এ মাম্মাস বয়। মায়ের কথার বাইরে পা দেয় না এই বয়েসে এসেও। আহেলী আর জোর করেনি। আসলে জীবনে সামান্যতম সিদ্ধান্ত নিজে না নিতে পারা মানুষগুলোকে দেখলে ওর একটু অবাক লাগে। আহেলীও বাবার সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়েছে জীবনে। কিন্তু একটা মুভি দেখতে গেলে বা বন্ধুদের সঙ্গে কফি খেতে গেলে কখনও কারোর পারমিশন নিতে হয়নি। আহেলী নেমে পড়েছিল নিজের স্টপেজে। স্টেশন ছাড়ানোর মুখে শুনেছিল পিছন থেকে ডাকটা।

‘ম্যাম, আমন্ত্রণ করে এখন দৌড়ে পালাচ্ছেন যে!’

থমকে দাঁড়িয়েছিল আহেলী। পিছন ঘুরেই দেখেছিল, প্রদীপ্ত মুচকি মুচকি হাসছে। আহেলী হেসে বলেছিল, ‘মায়ের বকুনির ভয়ে আপনি তো আসবেন না বললেন।’

প্রদীপ্ত হেসে বলেছিল, ‘বন্ধুরা বলেছিল, সুন্দরী মেয়েরা আমাদের মতো ছেলেদের সঙ্গে কদাচিৎ কথাবার্তা বলে। চা খেতে নিমন্ত্রণ করা মানে লটারির টিকিটে এক কোটি টাকার প্রাইজ জেতা। তাই এমন সুযোগ যেন কেউ হাতছাড়া না করে। বন্ধুদের বাণী মনে পড়তেই ঝপ করে নেমে পড়লাম আপনার পিছন পিছন।’

আহেলী হেসে বলেছিল, ‘আপনাকে যতটা ভদ্র ছেলে মনে হচ্ছিল, ততটা কিন্তু নয়।’

প্রদীপ্ত সংকোচে বলল, ‘তাহলে কি কফির আমন্ত্রণ বাতিল হল? ভেবেছিলাম বন্ধুদের আড্ডায় একটু কলার তুলব, সে গুড়ে বালি?’

আহেলী হেসে বলল, ‘না না, একেবারেই নয়। কফির সঙ্গে ফিস ফ্রাই যুক্ত হল। আপনার সামনে ভদ্র, অতি ভদ্র সেজে থাকতে হবে না তাই।’

কফি খেতে খেতে আড্ডা হয়েছিল অনেক। প্রদীপ্ত নিজের সবটুকু প্রায় বলে দিয়েছিল আধঘণ্টার মধ্যেই। আহেলী বুঝেছিল, প্রদীপ্তর জীবনে ওর মায়ের প্রভাব খুব। কফি খেতে খেতেই বার দুয়েক ফোন এল। প্রদীপ্ত বলল, 'মা একটু বন্ধুদের সঙ্গে কফি খেতে এসেছি। পরের ট্রেনে যাচ্ছি।'

পরের ট্রেনের সময় পেরিয়ে যাওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দ্বিতীয় ফোনটা ঢুকেছিল। প্রদীপ্ত আহেলী সামনে একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলেছিল, 'মা আসছি।' দ্বিতীয় ফোন রাখার পরেই প্রদীপ্তর মধ্যে একটা চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল। সেটা বুঝেই আহেলী বলেছিল, 'চলুন ওঠা যাক।'

প্রদীপ্ত বলেছিল, 'আশা করি, আপনার পার্স দু'বার পড়বে না। আর আমি দ্বিতীয়বার কুড়িয়ে ফেরত দেওয়ার সুযোগ পাব না।'

কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আহেলী বলেছিল, 'ক্যাহেনা কেয়া চাহতে হো?'

প্রদীপ্ত হেসে বলেছিল, 'সিম্পল। আর কি কফি খাওয়ার বা খাওয়াবার ডাক পাব?'

আহেলীর বেশ ভালো লেগেছিল প্রদীপ্তকে। অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত কথাবার্তা। কিন্তু বেশ হিউমার যুক্ত কথাবার্তা বলে। সহজ-সরলভাবেই স্বীকার করেছিল, ওর বাবা হাইস্কুলের হেড মাস্টারমশাই হলেও ও প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করে। এবং সেটাও খুব হাই-ফাই কিছু নয়। মা একা হাতে ওদের সংসারটাকে ধরে রেখেছে। দিদির বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক আগেই। বাবা এ বছর রিটায়ার করবেন। বাড়ির অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। তবে বাবাকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছোট ভাইয়ের সংসার টানতে হয়েছে। কারণ ওর ছোটকাকা যে ব্যবসাতেই হাত দিয়েছে, তাতেই ভরাডুবি হয়েছে। এত পার্সোনাল কথা যে বন্ধু ভেবে মুহূর্তে বলে দিতে পারে, তার মধ্যে খুব

জটিলতা যে প্রবেশ করেনি সেটুকু উপলব্ধি করেছিল আহেলী। ফোন নম্বর বিনিময় হয়েছিল ওদের মধ্যে।

প্রায়ই ওদের দেখা হচ্ছিল মেট্রোতে। কখনও ছুটির দিনে প্রদীপ্ত ফোন করে বলত, 'যদি বন্ধু ভাবো, তাহলে চলো আজ দেখা করি ক্যাজুয়াল ড্রেসে। অফিস থেকে ফেরার পথে তাড়াহুড়োয় তো কথাই হয় না।'

আহেলী মজা করে বলেছিল, 'কেন ক্যাজুয়ালে বুঝি তোমায় ঋত্বিক রোশন লাগবে? আর সেটা হলে কি আমি ধপাস করে প্রেমে পড়ে যেতে পারি বলে বিশ্বাস করো তুমি?'

প্রদীপ্ত লজ্জা পেয়ে বলেছে, 'কুল ইয়ার। আমি এরকম কিছু ভাবিনি। মানে অফিস ফেরতা দুজনেরই বিধ্বস্ত অবস্থা থাকে, তাই ভাবলাম, একদিন ফ্রেশ মুডে আড্ডা দিই।'

আহেলী তবুও লেগ পুলিংয়ের সুযোগ একবিন্দুও না ছেড়ে বলেছিল, 'ধুর যাওয়ার ইচ্ছেটাই তো নষ্ট করে দিলে ওই ''কুল ইয়ার'' বলে। কেমন একটা স্কুল ফ্রেন্ড, স্কুল ফ্রেন্ড ফিলিংস আসছে এখন।'

প্রদীপ্ত বলেছিল, 'এতদিন কি অন্যরকম ফিলিংস ছিল তোমার আমার প্রতি? আমিই কি এক ড্রপ লেবুর রস ফেলে ছানা কেটে দিলাম?'

আহেলী কোনোমতে হাসি চেপে বলেছিল, 'ঠিক ধরেছ। এতদিন মেট্রোতে তোমায় দেখলেই অন্যরকম একটা ফিলিংস আসত।'

গাঢ় গলায় প্রদীপ্ত বলেছিল, 'বলোনি কেন আগে? কী ফিল করতে? প্লিস বলো?'

আহেলী গলায় আবেগ মিশিয়ে বলল, 'এই ব্যস্ত তিলোত্তমা, যেখানে মানুষের সময় নেই একে অপরকে নিয়ে এক সেকেন্ড ভাবার, এত মানুষ, সকলে যেন সকলের অপরিচিত, সেখানে মেট্রোতে তোমাকে দেখলেই আমার মনে হত, এই একটা মানুষ আছে যে আমায় চেনে, আমার গ্রে আর

পার্পেলে মেশানো পার্সটা চেনে। বেখেয়ালে পড়ে গেলে ঠিক তুলে নেবে। সত্যি বলতে কী খুব ভালো সহযাত্রী সহযাত্রী ফিল হত।'

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙা গলায় প্রদীপ্ত বলেছিল, 'ধুস্, তোমায় আসতে হবে না। থাকো তুমি তোমার গ্রে পার্স নিয়ে আর ওই হাঁদারাম সহযাত্রী নিয়ে। ভেবেছিলাম নিজেকে একটু স্মার্ট প্রমাণ করব তোমার সামনে। সদ্য স্যালারি ঢুকেছে। মাসের পনেরো তারিখ হলেই আবার পকেট গড়ের মাঠ হয়ে যাবে, তার আগে একটা ট্রিট দেব, তা নয়।'

আহেলী বলেছিল, 'চটপট বলো তোমার কোন রং পছন্দ?'

প্রদীপ্ত বলেছিল, 'এটা আবার কেন? আবার কোনো লেগপুলিং চলবে নাকি?'

আহেলী আবার রিপিট করেছিল, 'আরে বলো না।'

'আমার বেবি পিঙ্ক খুব পছন্দ। ছেলেদের পরলে মানায় না ঠিকই। কিন্তু আমার পছন্দের রং।'

আহেলী বলেছিল, 'বিকেল পাঁচটায় ভিক্টোরিয়া চত্বরে চলো তাহলে।'

প্রদীপ্ত বলেছিল, 'এ বাবা! ওখানে তো কাপলরা যায় বেশি।'

আহেলী হেসে বলেছিল, 'আমার বন্ধুরা বুদ্ধি দিয়েছিল, যদি কোনো ছেলেকে জীবনে পটাতে পারিস, তাহলে অবশ্যই একবার ভিক্টোরিয়া যাবি। ওখানে না গেলে নাকি ব্যাচেলার লাইফ কমপ্লিট হয় না। আর তাছাড়া সহযাত্রীকে যদি লোকজন প্রেমিক ভাবে, তাতে তোমার সমস্যা কোথায়?'

প্রদীপ্ত একটু থেমে কথাগুলো হজম করে বলেছিল, 'বেশ, তাহলে তাই চলো।'

নিজের আলমারি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা পিঙ্ক লং ফ্রক খুঁজে পেল আহেলী। ফ্রকটা খুব পছন্দ করে কিনেছিল সে। কিন্তু অফিস আর বাড়ি, ছুটির দিনে জমে থাকা কাজের চাপে এসব ছোট ছোট পছন্দগুলো যেন

হারিয়ে গেছে। লাস্ট কবে এই ড্রেসগুলো পরেছে, ভুলেই গেছে আহেলী। পিঙ্ক আর স্কাইয়ের ম্যাচ করা লং ফ্রকটা গায়ে আলতো করে ধরে আয়নার সামনে দাঁড়াল। আহেলী কি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে প্রদীপ্তর প্রতি! যদি সত্যিই ভালোবেসে ফেলে তাহলে কি আদৌ বাবা-মা মেনে নেবে ওকে জামাই হিসাবে? বাবা তো আহেলী জন্য বড় বড় চাকরি করা ছেলে খুঁজছে। প্রদীপ্ত নেহাতই সাধারণ। তবে আহেলী অয়ন পালকে একটু চেনে, মেয়ে কষ্ট পাবে এমন কাজ কিছুতেই করবে না। আহেলী যদি প্রদীপ্তকে বিয়ে করতে চায়, বাবা হয়তো একটু রাগ করবে, দুঃখ পাবে, কিন্তু মেনে নেবে শেষ পর্যন্ত। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেল আহেলী। ইস্, ভাবনার গতিবেগ আলোর থেকেও দ্রুত হয় কেন? প্রদীপ্তকে নিয়ে এত কিছু ভাবছে কেন আহেলী?

কনজারভেটিভ বাড়ি বলেই এই বয়েসে এসেও প্রেমে পড়া আর হয়নি আহেলীর। বাবার ধারণা, প্রেম করে কোনোদিন যোগ্য জীবনসঙ্গী পাওয়া সম্ভব নয়। প্রেম হল অল্প বয়েসের ভুল। এই একই ভাঙা রেকর্ড বাড়িতে শুনতে শুনতে আর অতি শাসনের কারণে সব প্রোপোজাল রিজেক্ট করতে করতে এগিয়েছে আহেলী। ঠিক যেন জেসিপি গাড়ি। সামনে যত আগ্রহী প্রেমিকই থাকুক, আহেলী তাকে সরিয়ে নিজের রাস্তা বানিয়ে চলেছে। আচমকা কেন যে প্রদীপ্তকে নিয়ে এতটা ভেবে ফেলল, কে জানে! কে যেন বলেছিল, প্রেম হল কালবৈশাখী ঝড়ের মতো। কখন আসবে আর সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, কেউ বলতে পারে না। কথাটা রবীন্দ্রনাথ বা হুমায়ুন আহমেদ যে বলেননি, সেটা নিশ্চিত।

আহেলী কলেজে রাজনীতি করেছে, ছেলে বন্ধুরা বাড়িতে এসেছে, জিন্স টপ পরে ঘুরে বেড়িয়েছে, কোনো কিছুতেই বাবার সমস্যা নেই। সমস্যা শুধু প্রেমে। মা মজা করে বলত, 'তোর বাবা মনে হয় অল্পবয়সে প্রেমে ধাক্কা

খেয়েছিল। সেই থেকেই প্রেমে অ্যালার্জি, বুঝলি!' যে যাই বলুক বাবা নিজের জায়গায় স্থির থেকেছে। সব স্বাধীনতা দিয়েছে, শুধু আপত্তি প্রেমে। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে গিয়ে কেউ নাকি আর সেভাবে প্রেমে পড়ে না, এমনই জ্ঞান দিয়েছিল সবজান্তা বন্ধু-বান্ধব। তাহলে প্রদীপ্তর সঙ্গে আলাদা মিট করতে যাবে ভেবেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি কেন হচ্ছে আহেলীর! আহেলী নিজের মনে হেসে উঠল, তবে কি নবেন্দু স্যার যেমন দেরিতে ক্লাসে ঢুকে বলতেন, 'আমি দেরিতেই আসি, কারণ কম সময়ে বেশি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখি।' তেমনই আহেলীর জীবনেও প্রেম একটু অসময়েই এল!

ভিক্টোরিয়া গেটের সামনে লেমন ইয়েলো টি শার্ট আর ব্ল্যাক জিন্স পরে দাঁড়িয়ে আছে প্রদীপ্ত। ওর জন্য কেউ এভাবে অপেক্ষা করছে ভাবতেই কেমন একটা শিহরন হয়েছিল।

ওকে দেখেই হাত নেড়ে এগিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত। বলেছিল, 'ওহ এই জন্য আমার ফেভারিট কালার জানতে চাওয়া হয়েছিল? মানে, তুমি বলে বলে ছক্কা হাঁকাবে আর আমি একবার ক্যাচ মিস করলেই দোষ!'

আহেলী বলেছিল, 'মানে?'

প্রদীপ্ত আর আহেলী পাশাপাশি হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতেই প্রদীপ্ত বলল, 'এভাবে আমাকে কুপোকাত করে দিয়ে ''শুধুই সহযাত্রী'' বলাটা কি মহামান্য আদালত মেনে নেবে?'

আহেলী হেসে বলেছিল, 'তো মহামান্য আদালতের নির্দেশে কী বলতে হবে শুনি?'

প্রদীপ্ত ওর হাতটা নিজের হাতে রেখে বলেছিল, 'আমার মনে ঘর বাঁধবে? চিরস্থায়ী ঘর। হাজার ঝড়-ঝাপটাতেও যে ঘর ভেঙে যাবে না?'

আহেলী কেঁপে উঠেছিল। এত কথা বলা মেয়েও যে কখনও কখনও চুপ করে যায় সেটা বোধহয় সেই প্রথম বুঝেছিল ও। ঠোঁটটা তিরতির কাঁপছিল, গলার কাছে বুজে আসা এক অনুভূতি। বেশ কিছুক্ষণ একটাও কথা বলেনি আহেলী। শুধু মুহূর্তটুকুকে উপভোগ করেছিল।

সেই থেকেই প্রদীপ্তকে বড্ড ভালোবাসে আহেলী। প্রদীপ্তও ওকে ভালোবাসে। কিন্তু বিয়ের কথা বললেই গত তিনবছরে ক্রমশ পিছিয়ে গেছে প্রদীপ্ত।

এমনকী, ওকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসছে শোনার পরেও বলেছে, 'যেভাবে হোক ক্যানসেল করো বিয়েটা। আমি বাড়িতে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছি।'

না, এখনও ম্যানেজ করে উঠতে পারেনি প্রদীপ্ত। মায়ের সামনে দাঁড়ালেই নাকি ওর গলা শুকিয়ে যায়।

প্রতিটা পাত্রপক্ষের দেখতে আসার আগে প্রদীপ্তর সঙ্গে প্ল্যান করে পাত্রপক্ষকে ক্যানসেল করেছে আহেলী। কিন্তু সৌরিশ অন্য ধাতুতে গড়া। তাই তাকে মিথ্যে দিয়ে বশ করা যাবে না।

ফোনটা বেজে যাচ্ছে প্রদীপ্তর। মনে মনে অধৈর্য হচ্ছে আহেলী। এখনও ফোনটা রিসিভ কেন করছে না! ওর হাতে মাত্র ছ'দিন আছে। প্রদীপ্ত যদি ওর ফ্যামিলিকে নিয়ে ওদের বাড়িতে এসে বিয়ের কথাটা বলে, বাকিটা ও ম্যানেজ করে নেবে। কিন্তু প্রদীপ্তর কোনো চেষ্টাই নেই। ধুর, এত ভীতু টাইপের ছেলে হলে চলে!

বার তিনেক বাজার পরে ফোনটা তুলল প্রদীপ্ত। বলল, 'কী হয়েছে অলি? একটা মিটিংয়ে ছিলাম, বলো।'

আহেলী বিরক্ত হয়ে বলল, 'শোনো, হাতে মাত্র ছ'দিন বাকি। যদি বাড়িতে বলতে না পারো তো আমি তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলছি। তোমায় ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। প্লিস প্রদীপ্ত, ডু সামথিং।'

প্রদীপ্ত বলল, 'এভাবে কেন প্রেশার দিচ্ছ অলি? আমি কি তোমায় চাই না? ভালোবাসি না তোমায়? কিন্তু বাবা-মাকে বলতে একটু দ্বিধা হচ্ছে এই যা। আসলে মায়ের মত না নিয়ে আজ অবধি কিছু করিনি। মা একটু শকড হবে। একটু সময় দাও প্লিস।'

আহেলী প্রায় চিৎকার করে বলল, 'সময়? প্রদীপ্ত আমরা প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন বছর সম্পর্কে আছি। এটা কি খুব কম সময়? শুধু তুমি বাড়িতে বলোনি বলে আমিও আমার বাড়িতে ভরসা করে বলে উঠতে পারিনি। একটার পর একটা সম্বন্ধ ভেঙে দিচ্ছি। এবারে হয়তো কোনো পাত্রপক্ষ বাবাকে ওপেনলি অপমান করে দিয়ে যাবে। তুমি কি সেটা চাও?'

প্রদীপ্ত বলল, 'আচ্ছা, আজ বাড়ি ফিরে কথা বলছি।'

আহেলী ফোনটা রেখে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

সৌরিশ এক চান্সে বলেছিল, 'তিন বছরে যে বলতে পারেনি, সে সাত দিনে বলতে পারবে বলে বিশ্বাস করেন আপনি? আপনাকে দেখে ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখতে শিখবে মানুষজন। এটা অবশ্য গুড সাইন।'

কিছুতেই কারোর কাছে হারতে চায় না আহেলী। প্রদীপ্তকে ভালোবাসে আহেলী। ওর সঙ্গেই শুরু করতে চায় জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। রাতে ফোন করেও আহেলী শুনল, প্রদীপ্তর আজকে অসম্ভব মাথা ব্যথা করছিল তাই মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেনি।

গুনে গুনে তিনদিন পর প্রদীপ্ত ফোন করে বলল, 'মা আর বাবা তোমায় দেখতে যেতে চায় আহেলী।'

আহেলী আনন্দে নেচে উঠেছিল। অবশেষে নিজের সব দ্বিধা কাটিয়ে বাড়িতে জানিয়েছে প্রদীপ্ত। এটাই যেন ওদের সম্পর্কটাকে চিরস্থায়ী করে দিল।

আহেলী মা-বাবাকে একসঙ্গে বসিয়ে বলেছে, 'তোমরা রাগ করো না আমার ওপরে। আমি একজনকে ভালোবাসি।'

বাবার চমকে ওঠা নজর এড়ায়নি আহেলীর। কিন্তু আজ আর কোনো উপায় নেই। সবটা বলতেই হবে বাবাকে। মাকে নিয়ে তেমন সমস্যা নেই। মা হয়তো একটু আন্দাজও করেছিল। একদিন বলেছিল, 'যদি কাউকে পছন্দ থাকে তাহলে বাবাকে জানিয়ে দিস। অকারণে তোর বাবা ভালো পাত্র খুঁজে যাচ্ছে হন্যে হয়ে আর তুই যেনতেন প্রকারে ক্যানসেল করছিস।'

আহেলী বুঝেছিল, মা সন্দেহ করেছে ওকে।

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'ছেলে কী করে? বাড়ি কোথায়? এতদিন বলোনি কেন? এভাবে আমাকে হ্যারাস করার মানে কী?'

আহেলী রেডি ছিল এই প্রশ্নগুলোর জন্য। প্রদীপ্তর সবটুকু শোনার পরে বাবা গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমার মাকে প্রথম জীবনে আমি খুব ভালো রাখতে পারিনি। তোমার মায়ের অনেক শখ অপূর্ণ রয়ে গেছে। তখন এত কম মাইনে পেতাম যে, বাড়িতে দিয়ে তেমন কিছুই হাতে থাকত না। তোমার মায়ের শখ ছিল হানিমুনে পেলিং যাবে। খরচের ভয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। পরে অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে ছিলাম, কিন্তু সেদিন তোমার মায়ের চোখে অভিমান ছিল। বলেছিল, 'আমরা কি তবে হানিমুনে যাবই না?' তাই আমি চেয়েছিলাম, তোমার ঠিকঠাক ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে। যাই হোক, তুমি যখন পছন্দ করেছ, নিজেও তো চাকরিটা করছ, অসুবিধা বোধ হয় তেমন হবে না। প্রদীপ্তকে আসতে বলো, ওর অভিভাবকদের নিয়ে। আমায় ফোন নম্বর দিও, আমি ওর বাবাকে আমন্ত্রণ জানাব।'

আহেলী নিজের খুশিটুকু কীভাবে খরচ করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। এত সহজে যে বাবা ওর কথা মেনে নেবে, ওর ধারণা ছিল না।

মা এসে বলল, 'তাহলে সৌরিশদের বলে দেওয়া উচিত তাই না?'

বাবা বলল, ‘ওরাই তো সাতদিন সময় চেয়েছিল। পছন্দ হয়নিটা ডিরেক্ট বলতে পারেনি হয়তো, তাই সময় নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ওরাই জানাবে। আমাদের চিন্তা করতে হবে না।’

আহেলী আর বিষয়টাকে জটিল করার জন্য বলল না যে, সৌরিশের ওই সাতদিন ওরই পরামর্শে নেওয়া। প্রদীপ্তর বাবা-মা আসুক ওদের বাড়িতে। তারপর আহেলীই সৌরিশকে ফোনে বলে দেবে। তাহলে আর বাবার অযথা সন্দেহ হবে না।

মা, বাবা ওঁরা আসবেন বলে সব মেনু ঠিক করেছে। মঙ্গলাদিকে নিয়ে সকাল থেকেই মা রান্না ঘরে ঢুকে গেছে। আহেলী আজ বেবি-পিঙ্ক কালারের একটা শাড়ি পরবে ভেবেছে। কে জানে কেন এত পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও যেন মনে হচ্ছে প্রদীপ্ত ওকে আজ প্রথম দেখবে। সেই প্রথম মিট করার দিনটার কথা মনে রেখেই শাড়ি বাছাই করল।

প্রদীপ্ত লাজুক লাজুক মুখে বসে আছে ওদের কর্নারের একটা সোফাতে। যেন প্রেম নয়, ভদ্রলোক খুনখারাপি করে ফেলেছে। রীতিমতো ফাঁসির আসামির মতো মুখ করে বসে আছে। আহেলীর প্রচণ্ড হাসি পেয়েছিল প্রদীপ্তকে দেখে। হ্যান্ডসাম লাগছে ড্রেসের কালার কম্বিনেশনে। কিন্তু মুখটা দেখলে মনে হচ্ছে, মিনিমাম তিনবার উচ্চমাধ্যমিকের ম্যাথসে ব্যাক পেয়েছে। তবে এমন কাঁচুমাচু মুখই ভালো বাবা-মায়েদের জন্য। তাহলেই ওরা মনে করে ছেলে অসম্ভব শান্ত-ভদ্র। মানুষের মুখ দেখে যদি মানুষ চেনা যেত, তাহলে আর এ বিশ্বে কঠিন বা অসমাপ্ত কাজ বলে কিছুই থাকত না।

আহেলী শাড়ির আঁচল সামলে এসে বসতেই ওর মা হাত বাড়িয়ে বললেন, ‘আহেলী তুমি আমার পাশে এসে বসো। বোঝো ছেলের কাণ্ড! এমন একটা মিষ্টি মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছিল। হ্যাঁ রে, মা শাসন করে যাতে

বদ পাল্লায় না পড়িস। মা তো আর বাঘ-ভাল্লুক নয় যে, এমন মিষ্টি একটা মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে যেতে বাধা দেবে?’

আহেলীর খুব ভালো লাগছিল প্রদীপ্তর মাকে। ও যেমন চব্বিশঘন্টা ভয়ে থাকে মায়ের নামে, তেমন কিছুই নন। বদমাশ ছেলেটা নিজে ভয় পায় বলে ওকেও ভয় পাওয়ায়। প্রদীপ্তর বাবা খুবই কম কথা বলেন। কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছে বা কোন কোম্পানিতে জব করো এই দুটো প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। তুলনামূলকভাবে ওদের ফ্যামিলিটা যে ওর মায়ের নির্দেশেই পরিচালিত হয় সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

ওর মা বললেন, ‘একটা ভালো করে ছবি তোল বাবু। পূবালীকে পাঠাতে হবে। আর বলো না, আমার মেয়ে ছটফট করছে ভাইয়ের বউ দেখবে বলে। কিন্তু কাজের চাপে আজ আসতে পারল না। বলেছে, যেন ছবি তুলে নিয়ে যাই।’

কোনোরকম খুঁতখুঁতে স্বভাব নয় ভদ্রমহিলার। মায়ের সঙ্গেও ঘরোয়া গল্প জুড়েছিলেন। খাবার টেবিলে মায়ের রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। আহেলীকে বললেন, ‘তুমি রান্না পারো কিনা জানতে চাইলাম না। চাকুরিজীবী মেয়ে ক’দিন আর রান্নার সময় পাবে? আমি যা পারি ওই খেয়ে অফিস যেতে হবে কিন্তু।’

আহেলী বলল, ‘আমিও টুকিটাকি রান্না শিখেছি মায়ের কাছ থেকে। ছুটির দিনে আপনাকে বানিয়ে খাওয়াব।’

দুই বাড়িরই পছন্দ হয়েছে দুজনকে। তবুও প্রদীপ্তর মুখে হাসি নেই। গোমড়া মুখে বসে আছে দেখে ইশারায় আহেলী বলল, ‘তোমার কি আমায় পছন্দ হয়নি হাঁদারাম? মুখটা এমন করে রেখেছ কেন?’

প্রদীপ্ত যেন অনেক কষ্টে একটু হাসল।

ছেলেটাকে মানুষ করতে পারল না আহেলী। এখনও ভীতুরাম রয়ে গেল। আজ এমন একটা খুশির মুহূর্তে যখন দুই বাড়ি গ্ল্যাডলি ওদের রিলেশনটা মেনে নিয়েছে, তখন মুখটা এমন করে রেখেছে যেন অপরিচিত কোনো মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওর সঙ্গে। নিজের মনে মনেই একচোট হেসে নিল আহেলী। কালকে অফিস থেকে ফেরার পথে দেখাচ্ছি মজা।

সবাই স্ন্যাকস খেতে খেতে হাসাহাসি করছে। ঠিক তখনই কফির কাপে চুমুক দিয়ে প্রদীপ্তর মা সুমিত্রাদেবী বললেন, 'তাহলে দাদা একটা ভালো ডেট দেখে বিয়ের দিনটা ফাইনাল করে ফেলি। এর মধ্যে আহেলীর সঙ্গে গল্প করতে আমার মেয়ে আর বোন একবার করে আসবে। ওদেরও খুব ইচ্ছে বাবুর বউকে একবার দেখে যাওয়ার। ওরা যখন নিজেরাই পছন্দ করেছে, তখন আমাদের তো এক্ষেত্রে কোনো করণীয় নেই। শুধু দাঁড়িয়ে থেকে চারহাত এক করে দেওয়া ছাড়া।

তবে দাদা একটা কথা, আমার ওই একটি ছেলে। গয়না আপনি আপনার মেয়েকে দিলে দেবেন, না দিলে না দেবেন। আমায় দশলাখ টাকা ক্যাশ দেবেন। ওই দোতলার ঘরগুলো ওদের জন্যই ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশন করে দেব, আর আপনার মেয়ে-জামাইয়ের জন্য একটা গাড়ি কিনে দেবেন। সত্যি বলতে কী আমাদের আর ভোগের বয়েস নেই। এখন ওরাই সব ভোগ করবে।'

এই কথা শুনে আহেলীর থেকেও বোধহয় বেশি চমকে ছিলেন অয়নবাবু। তাঁর একমাত্র মেয়ে, যতটা সম্ভব তিনি খরচ করবেন মেয়ের বিয়েতে, কিন্তু পণ দেবেন একটি শিক্ষিত ছেলেকে, বিয়ে দেওয়ার সময়, এই আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে, এটা যেন ওঁর কল্পনার অতীত।

আহেলী সোজাসুজি তাকাল তার তিনবছরের প্রতিমুহূর্তের ভাবনায় বসবাস করা মানুষটার দিকে। অপলক তাকিয়ে রইল, নিজেদের বিবাহিত জীবন নিয়ে প্ল্যান করা, হানিমুন নিয়ে বারংবার পাহাড় না সমুদ্র করা মানুষটার দিকে। মাথা নীচু করে বসে আছে প্রদীপ্ত। কিছুতেই চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। কোনো প্রতিবাদ নেই ঠোঁটে। এটা ওরা বাড়ি থেকেই প্ল্যান করে এসেছিল, সেইজন্যই প্রদীপ্ত আজ একটু বেশিই চুপচাপ। এতক্ষণে ওর মুখের অমন এক্সপ্রেশনের মানে বুঝেছে আহেলী। বিস্ময় এখনও কাটেনি ওর, তার মধ্যেই প্রদীপ্তর মা বললেন, 'আমিও আমার জামাইকে হীরের আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলাম। আপনি আশা করি, তাই করবেন।'

আহেলী দেখছে নির্লজ্জের মতো বসে থাকা ওর স্বপ্নের পুরুষকে।

অয়নবাবু একটু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আচ্ছা এটা নিয়ে আমি বাড়িতে একটু আলোচনা করে নিই।'

সুমিত্রাদেবী কফির কাপটা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, 'নিশ্চয়ই। দেখুন ওরা দুজন দুজনকে পছন্দ করে রেখে আমাদের কাজ তো অর্ধেক করে দিয়েছে। এখন শুধু দু'বাড়ির মধ্যে এই দেনা-পাওনা, নমস্কারি বা আশীর্বাদের কথাবার্তাগুলোই যা ফাইনাল হওয়ার থাকল।'

প্রদীপ্ত যাওয়ার আগেও একবারও তাকাল না আহেলীর দিকে।

আহেলীদের বাড়িতে আজ নিস্তব্ধ একটা বাতাস বইছে। একটু আগের আনন্দ যেন মুহূর্তের মধ্যে কেউ মুছে দিয়েছে। শাড়িটা এক টানে খুলে ফেলে, ঘরে পরার পোশাক পরে নিল আহেলী। ড্রয়িং রুমের বাতাসে এখনও প্রদীপ্তর পারফিউমের চেনা গন্ধটা ঘুরপাক খাচ্ছে।

ঘন্টাখানেক পরে প্রদীপ্ত মেসেজ করল, 'মায়ের তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে, বাবারও। দিভাইও তোমার ছবি দেখে খুব প্রশংসা করল। তোমার বাবা-মা আমার সম্পর্কে কী বলল অলি?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আহেলী মেসেজগুলোর দিকে। এত বড় একটা অপমান করে চলে যাওয়ার পরেও এসব কী করে লিখতে পারে একটা মানুষ! কোনো উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না আহেলীর।

বাবার পায়ের আওয়াজ শুনে নিজের গালের অপমানের নোনতা জলটুকু মুছে নিল আহেলী।

বাবা এসে বসল ওর ঘরের চেয়ারে। আস্তে আস্তে বলল, 'তোর বিয়ের জন্য গয়নাগাটি তোর মা সবই করিয়ে রেখেছে। আমিও লাখ ছয়েক রেখেছিলাম ধুমধাম করে বিয়েটা দেব বলেই। আরেকটা ফিক্সড ডিপোজিট আছে আমার লাখ বারোর। ওটা ভেঙে ফেলব ভাবছি। টাকা নিয়ে তুই চিন্তা করিস না। তোর অ্যাকাউন্টেও জমেছে ভালোই। অসুবিধা হবে না। কিন্তু পণ দিয়ে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—এটা মেনে নিতেই যা কষ্ট হচ্ছে।'

আহেলী বলল, 'বাবা আমি এ নিয়ে কাল অফিস থেকে ফিরে কথা বলব।'

কেন কে জানে নিজের ভালোবাসাই কেন ব্যঙ্গাত্মক ঢঙে বারংবার ওর সামনে আয়নাটা ধরছে। সেদিকে তাকিয়ে চোখ নীচু করে নিতে বাধ্য হচ্ছে আহেলী। এত খারাপ পছন্দ ওর! প্রদীপ্ত এতটা মেরুদণ্ডহীন ছেলে! ও তো সব জানত, বাবা পণ দিয়ে বিয়ে দেবে না। আহেলী নিজেও এভাবে পণ নেওয়াকে ঘৃণা করে। তারপরেও এটা কী করে করতে পারল প্রদীপ্ত! এখনও যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না ও। ভাবছে এখুনি বোধহয় প্রদীপ্ত ফোন করে হো হো করে হেসে বলবে, 'এটা আমরা মজা করেছিলাম আহেলী। আমি তোমায় ভালোবাসি। অর্থের বিনিময়ে তার বিচার করব, এটা ভাবলে কী করে!'

না, সারারাত কোনো ফোন এল না।

পরের দিন রেডি হয়ে অফিস বেরোনোর আগে পর্যন্ত মা, বাবা দুজনেই কোনো কথা বলল না। মা শুধু বলল, 'সৌরিশ ফোন করেছিল। তোর বাবার সঙ্গে কথা বলছিল। কী কথা হয়েছে আমি জানি না।'

সত্যি বলতে কী কোনো কথাই মাথায় ঢুকছিল না আহেলীর। অপমানে নীল হয়ে আছে ওর স্বপ্ন দেখা মনটা। কে সৌরিশ, সে কেন বাবাকে ফোন করেছিল—এসব কোনো কথাই মাথায় ঢোকেনি। অফিসে গিয়েও কাজে মন লাগছিল না ওর। কৌশানী এসে মজার সুরে জিজ্ঞাসা করল, 'কী গুরু বিয়েটা কবে খাচ্ছি?'

একমাত্র কৌশানী জানত প্রদীপ্তরা দেখতে আসবে।

আহেলী অন্যমনস্কভাবে বলল, 'কৌশানী বিয়েটা হয়তো হবে না রে। নিজেকে এতটা ছোট করতে পারব না।'

কৌশানী নিজেও পুরোটা শুনে চমকে উঠে বলল, 'তোমরা ভালোবেসে বিয়ে করছ, এতে এত টাকার ডিমান্ড কেন হবে?'

ফেরার পথে একটু ওয়েট করল আহেলী। শেষবার মুখোমুখি হতে চায় প্রদীপ্তর। নিজের সম্মানের কথা না ভেবেই আরেকবার কথা বলতে চায়। মেট্রো স্টেশনেই দেখা হয়ে গেল প্রদীপ্তর সঙ্গে।

প্রদীপ্ত বেশ হাসি মুখে এগিয়ে এসে বলল, 'শপিং শুরু করবে কবে থেকে?'

আহেলীর ইচ্ছে করছিল ঠাস করে একটা থাপ্পড় মেরে দিতে। তবুও নিজেকে কন্ট্রোল করে বলল, 'প্রদীপ্ত তোমার লজ্জা করল না, একজন শিক্ষিত ছেলে হয়ে এভাবে পণ চাইতে! আজকাল অ্যারেঞ্জড ম্যারেজেও কেউ টাকা চায় না। আর তুমি?'

প্রদীপ্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'জানতাম, তুমি ভুল বুঝবে। দেখো মা কোনো পণ চাইছে না। আমরা যাতে বিয়ের পরে দুজনে আরামে থাকি তাই একটা

ছোট্ট আবদার করেছে মাত্র! তুমি একটা ছোট্ট বিষয়কে এত বড় কেন করছ? এতদিন তো আমি বাড়িতে বলতে পারছিলাম না বলে খুব কথা শোনাতে। এখন যখন সবাই রাজি তখন তোমার সমস্যা কী? তাছাড়া তোমার বাবার অর্থনৈতিক অবস্থা যদি খারাপ হত, তাহলে কি মা চাইত? তোমার বাবার এটুকু দেওয়ার সামর্থ্য আছে।'

আহেলী প্রদীপ্তর ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে। কী অবলীলায় বলে চলেছে ও! আহেলী শেষ চেষ্টা করে বলল, 'এভাবে অপমান করতে পারো না তুমি আমাদের সম্পর্কটাকে। কোনো পণ দেবে না আমার বাবা।'

প্রদীপ্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'এরপর মা বেঁকে বসলে আমি কিন্তু আর রাজি করাতে পারব না।'

প্রদীপ্তর কথা শুনে মনে হচ্ছে বিয়ের ইচ্ছেটা একা আহেলীর। এই সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে তাকে নাম দেওয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আহেলীর। প্রদীপ্তর যেন কোনো দায় নেই। ও যেন আহেলীকে বিয়ে করে কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে দায়মুক্ত করছে!

অসহ্য জ্বালায় চোখ দুটো জ্বলছে আহেলীর। চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ট্রেন। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না আহেলী, চোখদুটো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে জলে। আচমকাই একটা হাত এসে ধরল ওকে। বলল, 'এতক্ষণ এখানে কী করছ আহেলী? আমি কখন থেকে ওয়েট করছিলাম তোমাদের বাড়িতে। শেষে আঙ্কেল বললেন, তুমি মেট্রোতে ফিরবে। তাই খুঁজতে খুঁজতে এলাম।'

প্রদীপ্ত অপলক তাকিয়ে আছে সৌরিশের দিকে।

আহেলীর গলাটা বুজে আছে যন্ত্রণায়। কোনো কথা বলার ক্ষমতা নেই যেন। সৌরিশ ছেড়ে দিলেই হয়তো পড়ে যাবে ও। প্রদীপ্ত যে এভাবে ওকে আঘাত করবে, এতটা ও বোধহয় কল্পনা করতে পারেনি। ভেবেছিল এটা

ওর মায়ের সিদ্ধান্ত, এতে হয়তো প্রদীপ্তর সমর্থন নেই। এখন পরিষ্কার হল, এতে প্রদীপ্তর সায় আছে সমানভাবে।

প্রদীপ্ত বলল, 'আপনি কে? ওর হাত ধরে টানছেন কেন?'

সৌরিশ হেসে বলল, 'আমি কে, সেটা না হয় ক'দিন পরেই জানবেন। তবে আহেলীর বাবা যে নিজের মেয়ের বিয়ে আপনার সঙ্গে দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটা হয়তো আজ রাতেই আপনাকে জানানো হবে। আমিই সুখবরটা আগাম দিয়ে দিলাম। আসলে আঙ্কেল বলেছেন, শিরদাঁড়া ভাঙা ছেলে আমার মেয়ের দায়িত্ব নিতে পারবে না। এনিওয়ে, আহেলী চলো বাইরে আমার গাড়ি আছে। আমরা কোনো রেস্টুরেন্টে ডিনার করে ফিরব। আঙ্কেল আর আন্টিকে রান্না করতে বারণ করেছি। প্যাক করে নেব। আসি প্রদীপ্তবাবু। ভালো থাকবেন। ভবিষ্যতে মায়ের পারমিশন না নিয়ে, আর দরাদরি না করে খবরদার কোনো মেয়ের প্রেমে পড়বেন না। ভালোবাসার যোগ্যতা সকলের থাকে না। বিশেষ করে আহেলীকে অর্জন করার যোগ্যতা সকলের নেই।'

সৌরিশ হাত ধরে টানতে অবশ পাগুলো দিয়ে যন্ত্রের মতো হাঁটতে শুরু করল আহেলী।

পিছন থেকে তীব্র রাগে প্রদীপ্ত বলল, 'ওহ, বড় চাকুরেওয়ালা ছেলেকে বিয়ে করবে বলেই পণ নিয়ে এত কথা! এটাই তাহলে আসল কারণ।'

আহেলীর আর ইচ্ছে করছে না পিছন ঘুরে প্রদীপ্তর মুখটা দেখতে। ইচ্ছে করছে না সত্যিটা ওকে বোঝাতে।

সৌরিশ গাড়িতে উঠেই বলল, 'এভাবে হাটে বাজারে নিজের মূল্যবান মনটাকে বিলিয়ে দিতে বসেছ কেন আহেলী? তার জন্যই মনখারাপ করো, যে তোমার মন ভালো রাখার চেষ্টা করে এসেছে বরাবর। তাকেই উজাড় করে ভালোবাসো, যে তোমার ভালোবাসাকে মূল্যবান ভাববে।'

সৌরিশ গাড়িটা আহেলীর বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'আমি আঙ্কেলকে ফোন করেছিলাম সকালে। তোমায় পছন্দ নয়—কথাটা জানাব বলে। আজকেই তোমার দেওয়া সাত দিনের শেষ দিন। কিন্তু আঙ্কেল প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে গতকালের প্রদীপ্তদের সব কথা বলে ফেললেন। কবে আমি ওঁর এতটা ভরসার জায়গা হয়ে গেলাম নিজেও টের পেলাম না। আর বলা হল না, তোমায় পছন্দ হয়নি। আঙ্কেল বিকেলবেলা ফোন করে বললেন, ওঁর নাকি প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছে। কারণ, তোমার অফিসের বান্ধবী কৌশানী অঙ্কেলকে জানিয়েছে, তুমি অফিসে খুব অন্যমনস্ক ছিলে। তাই আমি সবটুকু জেনে মেট্রো স্টেশনে এসে ওয়েট করছিলাম। কিছু মনে করো না, প্রদীপ্তকে অপমান করার লোভ ছাড়তে পারলাম না। ছেলেটা ক্রমাগত তোমায় হার্ট করছিল। ওর সামনে ইচ্ছে করেই বললাম, আমরা এখন রেস্টুরেন্টে খাব। আমি জানি আহেলী, তোমার মনের অবস্থা এখন সেরকম নেই। তুমি বাড়ি গিয়ে রেস্ট করো। আঙ্কেল তোমায় নিয়ে চিন্তা করছেন, পারলে ওঁকে একটু সান্ত্বনা দিও।'

আহেলী অস্ফুটে বলল, 'ভিতরে আসবে না?'

সৌরিশ বলল, 'আরেকদিন আসব না হয়। তুমি নিজেকে সামলানোর সময় নাও একটু। তারপর একদিন এসে তোমার কলেজে রাজনীতির গল্প শুনে যাব কফি খেতে খেতে। এই কান্না ভেজা, বিধ্বস্ত আহেলীর প্রেমে তো আমি পড়িনি প্রথম দর্শনেই। আমি সেই আহেলীর প্রেমে পড়েছিলাম, যে কিনা গল্পের আকারে নিজেকে প্রায় ডনে পরিণত করেছিল। প্লিস আহেলী অনেকটা সময় নাও, কিন্তু পাল্টে যেও না।'

আহেলী যাওয়ার সময় বলল, 'থ্যাংক ইউ। আমার বাবার চয়েস আমার জন্য সবসময় ভালোই হয়েছে। আজ বড্ড ছোট হয়ে যেতাম প্রদীপ্তর কাছে। মাটিতে মিশিয়ে দিতে চাইছিল ও। ভাগ্যিস তুমি এলে।'

সৌরিশ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, 'টেক কেয়ার। ভালোবাসায় বিশ্বাস হারিও না আহেলী। ভালোবাসার কোনো দোষ নেই, ভুল মানুষকে ভালোবাসলে দোষ সেই মানুষটার। ওই অনুভূতিটার নয়। ওই ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ডগুলো এখনও একইরকম সজীব। আর সাত দিন পরে আমি আঙ্কেলকে ফোন করে জানিয়ে দেব, আমার আপনার মেয়েকে খুব পছন্দ। ঠিক সাতদিন পরে। তুমি সময় নাও আহেলী, দীর্ঘ সময় নাও, শুধু প্লিস আমায় ওই প্রথম দিনের আহেলীকে ফেরত দিও।'



বাসি বকুলের গন্ধ

'এই চন্দ্রজা যা না, তিমিরকে ডেকে নিয়ে আয় না। তুই কেন বুঝতে পারছিস না এটা আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের ম্যাটার অফ প্রেস্টিজ। এমনিতেই তো ফাইনাল ইয়ারের ওই সুবিনয়, তনয়া, জ্যোতিষ্ক এরা সব ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ালে জড়পদার্থও প্রাণ ফিরে পায়। দেখলি না গতকাল বর্ষা ম্যাডাম এসে বলে গেলেন, 'এটাকে কম্পিটিশন হিসাবে নিও তোমরা। শুধু কলেজ ফেস্ট নয়। চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিও। আজ অবধি সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারের কাছে জিততে পারেনি কোনোদিন। তোমাদের মধ্যে একমাত্র তিমিরকেই একটু ভরসা করা যায়।'

অতনুর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রজা বলল, 'তোরা হঠাৎ আমাকে কেন ডাকতে পাঠাচ্ছিস? তোরা যে কেউ তো তিমিরকে ডাকতে পারিস। আমরা একই ইয়ারের একই বিষয়ের ছেলেমেয়ে, তাহলে তোরা ওকে ডাকতে পারবি না কেন?'

আর্ট কলেজের ক্যাম্পাসে আজ একটা বেশ চাপা উত্তেজনা শুরু হয়েছে। সিনিয়র ভার্সেস জুনিয়র আঁকার কম্পিটিশন। ছোটবেলার মতো বসে আঁকো

প্রতিযোগিতা নয়। এ অনেক জটিল ব্যাপার। ওদের কলেজে দুটো ছাত্র পরিষদই বেশ স্ট্রং। মানে ভোটা-ভুটিতে ড্র হয়েছে গত বছর। সেকেন্ড ইয়ারের উৎসব ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে ভীষণ রকমের যুক্ত। তাই সেকেন্ড ইয়ার হেরে যাক এটা ও একেবারেই চায় না। সেইজন্যই উৎসব বেশ উঠে পড়ে লেগেছে।

উৎসব এবারে বলল, 'চন্দ্রজা, ঢং পরে করলেও চলবে। সবেতে তোদের এই ন্যাকামিগুলো আর হজম হয় না মাইরি। আরে তিমির যে সকলের থেকে আলাদা সেটা আমরা সবাই জানি। ওকে আমরা জোর-জবরদস্তি ডাকলেও ও আসবে না।'

চন্দ্রজা নিজের নখের কপার রঙের নেলপলিশ খুঁটে তুলতে তুলতে বলল, 'তাহলে জোর করছিস কেন? ওকে থাকতে দে না ওর মতো। আমরা সবাই মিলে ভেবেচিন্তে একটা প্রজেক্ট দাঁড় করাই। কেন তিমিরকে তোদের প্রয়োজন? এতদিন তো ওকে আমরা কেউ পাত্তাই দিইনি। এমনকি ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্টের পরেও না। তাহলে আজ হঠাৎ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওকে ডাকতে পারব না।' উৎসব বলল, 'দেখ চন্দ্রজা, আচমকা শরৎচন্দ্রের নায়িকার মতো সৎ হয়ে যাস না। পাত্তা কি আমরা একা দিইনি? তুইও তো দিসনি। ছেলেটার তোর প্রতি আকর্ষণ আছে জেনেও দিসনি।'

চন্দ্রজা বলল, 'কার কার আমার প্রতি আকর্ষণ আছে সেটা কি খুঁজে বেড়াতে হবে আমাকে? আমি জাস্ট পারব না।'

বিরক্ত হয়ে শ্রাবণী বলল, 'ছাড় রে। আমি ডাকছি ওকে।'

শ্রাবণী এগিয়ে গেল নিজেদের ডিপার্টমেন্টের দিকে। তিমির আবার বাইরে তেমন বেরোয় না। ক্লাসরুমে বসে থাকতে পছন্দ করে।

শ্রাবণী রুমে ঢুকে দেখল খাতায় দুটো চোখ এঁকেছে তিমির। ওকে সামনে দেখেই চট করে খাতাটা বন্ধ করে দিল। শ্রাবণীরও আর্টিস্টের চোখ। ভুল

ওরও হয়নি। চোখ দুটো কার বুঝতে দেরি হয়নি ওর। অন্য সময় হলে হয়তো একটু লেগপুল করত। কিন্তু আজ ওদের টিমের তিমিরকে প্রয়োজন। তাই বেশ সিরিয়াস মুখ করে শ্রাবণী বলল, ‘তিমির, আমাদের ডিপার্টমেন্টের সম্মান তোর হাতে। একমাত্র তোর তুলিতেই ইউনিক আইডিয়া আসে। থার্ড ইয়ারের সঙ্গে পাঙ্গা লড়ে বসে আছে উৎসব। এখন তুই আমাদের বাঁচা প্লিস।’

তিমির খাতায় লিখল, ‘প্লিস শ্রাবণী, আমায় এসবে জড়াস না। আমি কোনো প্রতিযোগিতা পছন্দ করি না।’

খাতাটা সামনে ধরল শ্রাবণীর। শ্রাবণী লেখাটা পড়েই বলল, ‘কিন্তু তিমির তুই আমাদের পাশে থাকবি না?’

তিমির আবার লিখল, ‘পাশে আছি। কিন্তু কোনো চ্যালেঞ্জে নেই।’

তিমির আর কিছু লিখবে কিনা সেটার আশায় ছিল শ্রাবণী। কিন্তু তিমির পেন বন্ধ করে দিল দেখেই বুঝল, এটা নিয়ে ও আর কোনো কথা বলতে চাইছে না।

তিমির বোবা, কালা নয়। কানে শুনতে পায়। কথা বলতেও পারে। কিন্তু কথাগুলো একটু অস্পষ্ট উচ্চারণ করে। ঠিক তোতলা বলা যায় না। সম্ভবত ওর উচ্চারণেই কোনো সমস্যা আছে। ক্লাসে এসে প্রথম দিন রবিনকে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করেছিল, গোটা ক্লাস হেসেছিল ওর অমন অস্পষ্ট আধো আধো উচ্চারণ শুনে। তারপর থেকেই ও আর কথাই বলে না কারোর সঙ্গে। যে যা বলে খাতায় লিখে উত্তর দেয়। ওর নিখুঁত হাতের লেখার প্রেমে পড়তে বাধ্য হয় সকলেই।

তবুও কলেজে যা হয়, ওকে ‘তোতলা’ নাম দেওয়া হয় গেছে। আড়ালে ওকে সবাই তোতলা বলেই ডাকে। তিমির নিজেও সেটা বুঝে গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। এখন ও ওর বই আর আঁকার দুনিয়ায় থাকে। সব থেকে

আশ্চর্যের ব্যাপার, তারপর থেকে ক্লাসের কেউ ওর গলা শুনতে পায়নি। অদ্ভুত জেদ ছেলেটার। প্রফেসররা এসে অনেক বুঝিয়েছেন। তবুও কথা বলেনি ছেলেটা। দু-চারটে যা কথা বলার প্রয়োজন হয় সেটা খাতায় লিখে লিখে সেরে নেয়। তাই ক্লাসের সবাই জানে তিমিরের জেদ মারাত্মক। ওকে এত সহজে যে রাজি করানো যাবে না সেটা উৎসব নিজেও জানে। তাই চন্দ্রজাকে পাঠাতে চাইছিল। ডিপার্টমেন্টের মোটামুটি সবাই বুঝতে পারে তিমিরের চন্দ্রজার প্রতি আকর্ষণ আছে। না, তিমির কখনও বলেনি ওকে। হয়তো বলবেও না। কিন্তু মাঝেমাঝেই তিমিরকে চন্দ্রজার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে দেখেছে সবাই। চন্দ্রজা অবশ্য ব্যাপারটা মোটেই পাত্তা দেয়নি। হেসে বলেছে, 'সাতবার তুতলে শেষে হয় তো বলবে বালোবাছি। রক্ষে করো মোরে। আমার কি ছেলের অভাব আছে?'

চন্দ্রজাকে দেখতে যে বিশাল সুন্দরী তা নয়। তবে ওর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। ওর ঠোঁটের কোণে সবসময় একটা অহংকারী হাসি বাধা পড়ে থাকে। আর হাঁটার ছন্দে পাতাবাহারি গাছের দোলন। ঠিক ভিড়ে মিশে যাওয়া চেহারা নয়। একটু স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই বলে চন্দ্রজাকে সুন্দরী বলা মোটেই সমীচীন নয়। যদিও চন্দ্রজা এসব ভাবে না। সে নিজেকে নিয়েই মজে আছে। তিমিরকে নিয়ে চন্দ্রজাকে লেগপুল করলে ও খুব শান্ত গলায় বলে, 'তোরা আনন্দ পাচ্ছিস এটাই তো যথেষ্ট। আজও যেমন উৎসবের মুখের ওপর বলে দিল, তোরা ডাক। এতদিন যখন উপযাচক হয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে যাইনি, তখন আজকেও যাব না।' ডিপার্টমেন্টের সবার সঙ্গে কথা বললেও, তিমিরের সঙ্গে একটাও কথা বলে না ও। কারণটা ঠিক কী, সেটাও কোনোদিন বলেনি কাউকে।

শ্রাবণী ফিরে এসে বলল, 'হল না বস। মহারাজ রাজি হলেন না।'

অতনু, সুপ্রভরা হেসে বলল, 'সে কি রে, হল না? তোর এত সুন্দর কালার করা চুল, এমন নেল আর্ট দেখেও তিমির ভিজল না?'

বিরক্ত হয়ে শ্রাবণী বলল, 'না, ভিজল না। ভিজবে কী করে, সে তো একজনের মধ্যেই জগৎ দর্শন করে। এখনও ডাকতে গিয়ে দেখলাম, তার চোখ আঁকছিল মন দিয়ে।'

চন্দ্রজার দিকে সব ক'টা চোখ একসঙ্গে হতেই বিরক্ত হয়ে নিজের নেলপলিশে মন দিল ও। উৎসব এবার গলাটা নামিয়ে বলল, 'আরে চন্দ্রা, তুই সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন রে? আমাদের কাজ মিটে গেলেই কেল্লা ফতে। তারপর থোড়ি তোকে ওর সঙ্গে টাইম স্পেন্ড করতে হবে? আরে তিমিরকে দিয়ে কাজটা হবে বুঝলি। তারপর না মিশলেই মিটে গেল। অসম্ভব জেদি ছেলে রে, আমরা ডাকলে যে আসবে না, সেটা জানি। একমাত্র তোর প্রতি দুর্বলতা আছে। তাহলে সেটাকে কাজে লাগালে অন্যায় কেন হবে?'

সুপ্রভ বলল, 'তুই তো এমন ভাব করছিস, যেন ওই তোতলাকে আমরা ছাদনা তলায় এনেছি। আর তোর মুখে পান চাপা। শুভদৃষ্টি হওয়ার আগের মুহূর্তে তুই বলছিস, না আমি বিয়ে করব না। আরে ইয়ার এটা জাস্ট একটা কম্পিটিশন। আমাদের টিমের ওকে দরকার। দ্যাটস এনাফ। তারপর ও যাবে ওর পথে, তুই তোর। নাথিং সিরিয়াস।'

চন্দ্রজা বলল, 'আমি ডাকলেই যে আসবে এমন গ্যারেন্টি তোদের কে দিল? নাও তো আসতে পারে।'

অতনু বলল, 'বেশ, তুই একবার ট্রাই তো কর।'

চন্দ্রজা একটু ভেবে বলল, 'ঠিক আছে। আমি আজ নয় কাল কলেজে এসে ওকে ডাকব। আজকে ডাকলে ও বুঝতে পারবে আমরা প্ল্যান করছি। কারণ, দু'মিনিট আগেই শ্রাবণী ফিরে এসেছে।'

ওর কথায় সবাই সম্মতি দিয়ে বলল, 'এটা ঠিক বলেছিস। কালকেই ডাকা হোক ওকে।'

চন্দ্রজা বাড়ি ফিরেই ফোন করল জিৎকে। জিৎ ফোনটা কেটে দিয়ে লিখল, 'ব্যস্ত আছি। পরে করছি।' চন্দ্রজা জানে এই 'পরে'-র অর্থ আজ কখনোই নয়। এক সপ্তাহও হতে পারে। অথচ এর সঙ্গেই নাকি চন্দ্রজাকে গোটা জীবন কাটাতে হবে। চন্দ্রনাথ বসুর বন্ধুর ছেলে বলেই তাকে কেন বিয়ে করতে হবে—এটা অবশ্য চন্দ্রজা বোঝেনি। কিন্তু জিৎকে দেখার পরে ওর আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তাই বিয়ের কথাবার্তা টুকটাক এগোলেও আপত্তি করেনি চন্দ্রজা। কিন্তু মাস পাঁচেক ধরেই দেখেছে জিতের আচরণ কেমন বদলে গেছে। সবসময় ব্যস্ততা দেখায়। একটুও যেন সময় নেই ওর। এদিকে দুই বাড়ি থেকেই চায় ওরা একটু মেলামেশা করুক। সুপুরুষ, স্মার্ট, নামী কোম্পানিতে চাকুরীরত জিৎ যেন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। আলাদা সময় নেই চন্দ্রজাকে দেওয়ার। মন হলে ফোনে দু'মিনিট কথা বলে, না হলে নয়। মুড ঠিক থাকলে চন্দ্রজাকে বলে, 'মুভি যাবে? তাহলে চলে এসো।'

চন্দ্রজা ওর বলা নির্দিষ্ট জায়গায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে ফিরে আসে। কারণ সেই সময়টুকু জিতের ফোন সুইচড অফ থাকে। পরে ফোনে বলে, 'ওহ্ আচমকা মিটিং এসে গিয়েছিল। পরে কোনো একদিন যাব।'

ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না, কতক্ষণ ওয়েট করেছিলে ওখানে? বা 'সরি' বলে যে একটা শব্দ আছে ডিকশনারিতে, সেটাও সম্ভবত জানে না জিৎ। কারণ গত এক বছরে জিতের মুখে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখেনি চন্দ্রজা। তবুও জিৎকে ওর ভালো লাগে। খুব ইচ্ছে করে জিৎও ওকে একটু মিস করুক, যেমন চন্দ্রজা করে। মা বলে, বিয়ে হলে নাকি সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আচমকা একটা মানুষের আজন্মলালিত স্বভাবের পরিবর্তন কীভাবে হবে, সেটাই ভেবে পায় না চন্দ্রজা। জিৎ অন্যরকম হবে কী করে? ওর

মধ্যে যে খামতিগুলো আছে সেটা তো ও রিয়ালাইজও করে না। চন্দ্রজার স্কুল লাইফের বেস্ট ফ্রেন্ড সুলেখাকেও বলেছে জিতের কথা। সুলেখা অদ্ভুত একটা ভঙ্গিমা করে বলেছে, 'ও বাবা, ভালো চাকরি, সুদর্শন, স্মার্ট, ভদ্র ফ্যামিলির সঙ্গে আবার ভালোবাসাও চাস নাকি তুই? শোন বস, ওসব ভালোবাসা বলে আদৌ কিছু হয় না। ওই প্রথম প্রথম ক'দিন তুমি আমার আমি তোমার হয়, তারপর সেসব কর্পূরের মতো উবে যায়। এই আমার বয়ফ্রেন্ডকে দেখ, চার বছর ধরে প্রেম করছি আমরা, কোনোদিন আমার জন্মদিনটুকু মনে রেখে উইশ করতে পারে না। আমার ফেসবুকে একটা ভুল বার্থ ডে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল যখন অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম। সোশ্যাল মিডিয়ার নোটিফিকেশন পেয়ে যেমন অন্য স্বল্প পরিচিতরা আমায় বার্থ ডে উইশ করে আমার বয়ফ্রেন্ডও তাই করে।'

চন্দ্রজা বলল, 'ভুল সংশোধন করে দিস না কেন?'

সুলেখার ঠোঁটে একটুকরো করুণ হাসি। বলল, 'হয় রে? এভাবে হয়? জোর করে মনে করিয়ে কারোর থেকে শুভেচ্ছা নিয়ে সেই আনন্দটা পাওয়া যায়! এই যে প্রতিবার তুই রাত বারোটা বাজলেই আমায় উইশ করিস, এতে যে গুরুত্বটা পাই সেটা ওইভাবে আদায় করতে ইচ্ছে করে না। ও তো জানে আসল ডেটটা। আমি কিন্তু এই চার বছরে ওকে একবারও উইশ করতে ভুলিনি জানিস। আসলে ইচ্ছেটাও দরকার। সম্পর্কগুলো শুরু হয় বেশ কিছু না বলা শর্তাবলী, বেশ কিছু অলিখিত প্রতিশ্রুতি নিয়েই। তারপর একজন কবে থেকে যেন অলিখিত আর না বলার সুযোগ নিতে থাকে। কতবার মনে করাব? তাছাড়া ভালোবাসা ভিক্ষে করতে হলে বড্ড আত্মসম্মানে লাগে রে। তাই জিতের কাছ থেকে আর যাই পাস, ভালোবাসা বা গুরুত্ব এসব পাবি না জেনেই তোকে এগোতে হবে। আসলে কী জানিস, সম্পর্কটাকে যত্ন করতে কম মানুষই জানে। আরেকটা কথা, তোকে সে

ভালোবাসছে কিনা এটা তুই ফিল করতে পারবি। ঠিক যেভাবে অবহেলাটা পারছিস, সেভাবে।'

সুলেখার মুখে এই সমস্ত কথা শুনে শুনে চন্দ্রজা বুঝে গেছে, ভালোবাসা বলে আদৌ কিছু নেই। কেউ ওর জন্য প্রতীক্ষা করে থাকবে না। যদিও কলেজের কেউ এখনও জিতের কথা জানে না। ইচ্ছে করেই বলেনি চন্দ্রজা। আগে জিৎকে চিনতে চায় ও। হঠাৎই যদি বাতিলের দলে ফেলে দেয় জিৎ, তাহলে অকারণে নিজের মানসম্মান নিয়ে টানাটানি হবে। তাই আগে দেখুক ওর প্রতি জিতের সামান্যতম ইন্টারেস্ট আছে কিনা, তারপর বলবে। দু'ঘন্টা হয়ে গেল, না জিতের কোনো ফোন না মেসেজ। এটাতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে চন্দ্রজা। ও জানে জিৎ ওকে রিং ব্যাক করবে না। বরং ও ন'টায় বাড়ি ফেরে, সেই হিসেব করে যদি চন্দ্রজা কল করে তাহলে হয়তো দু-একটা কথা হলেও হতে পারে। অথবা বলতে পারে, 'আজ টায়ার্ড আছি, পরে কথা বলব।' চন্দ্রজা জিজ্ঞাসা করেছিল জিৎকে, 'তোমার কি আমায় পছন্দ নয়?' জিৎ অবাক চোখে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমি তো এ প্রসঙ্গে তোমায় কোনো কথা বলিনি চন্দ্রজা। আমার চয়েস সম্পর্কে আমি তো কাউকেই কিছু বলিনি। তোমায় আমার পছন্দ না অপছন্দ এ নিয়ে তো কখনও আমাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি।'

চন্দ্রজা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'তাহলে আজ হোক। দুই বাড়ি থেকে আমাদের বিয়ের কথা বলছে। এর আগে আমায় তোমার পছন্দ কিনা সেটা তো জানা প্রয়োজন।'

জিৎ হালকা হেসে বলেছিল, 'পছন্দ-অপছন্দের ওপরে বিয়ে নির্ভর করে না চন্দ্রজা। বিয়েটা একটা সোশ্যাল স্ট্যাটাস। সবাই করে, তাই আমরাও করব। দুই ফ্যামিলি পরিচিত তাই এই সম্বন্ধটা এসেছে, ব্যস। আর তো কিছু ভাবিনি এটা নিয়ে। ইনফ্যাক্ট এর থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার

আছে। সো প্লিস, মনোটনাস জিনিস নিয়ে বেশি আলোচনা করতে আমি পছন্দ করি না।'

ঠিক কী বলা উচিত বুঝতে পারেনি চন্দ্রজা। কেমন যেন ঘেঁটে গিয়েছিল ওর চেনা জানা বিষয়গুলো। আজ যেমন আর কল করতে ইচ্ছে করছে না জিৎকে। এভাবে হয় না। দেখা যাক জিৎ আদৌ কবে কল করে ওকে। খেয়াল করেনি কখন যেন ওর দু'গাল বেয়ে নোনতা জলের ধারা নেমে এসেছে। খুব ভালো করে চিন্তা করল চন্দ্রজা। ও কি জিতের জন্য কাঁদছে? জিৎ ওকে ভালোবাসে না বুঝে কাঁদছে? নাকি আত্মসম্মানে আঘাত লাগেছে বলে কাঁদছে? অনেক খুঁজে প্রশ্নের উত্তরটা পেতেই গালটা মুছে নিল। না, জিৎ ভালোবাসে না বলে ও কাঁদছে না, ওর আত্মসম্মানে তীব্র আঘাত লাগছে বলেই কেঁদে ফেলছে। ঘরটা অন্ধকার করে অনেকক্ষণ বসে থাকল চন্দ্রজা। তারপর জিতের ফোন নম্বরটা ডিলিট করে দিল ফোন থেকে। আর হোয়াটসঅ্যাপেও ব্লক করে দিল। নিজের থেকে আর কোনো ফোন বা মেসেজ নয়। এখন শুধু ধৈর্যের পরীক্ষা চলুক। দেখা যাক কবে জিৎ ওকে কল করে। বা হোয়াটসঅ্যাপে ব্লকিংটা নোটিস করে কী না।

মনটা বড্ড খারাপ লাগছে। উঠে গিয়ে সাদা ক্যানভাসে আঁকতে শুরু করল। হোম থিয়েটারে গান বাজছে। ওর প্রিয় অরিজিৎ সিং।

বিশাল মনযোগ দিয়ে যে ও আঁকছে, তা নয়। কিছুটা আনমনেই। হঠাৎই খেয়াল হল ক্যানভাসে একটা স্টেশনের ছবি এঁকেছে। একটা ট্রেনের পিছনটুকু দেখা যাচ্ছে। একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। ঠিক যেন লাস্ট ট্রেনটা বেরিয়ে যাওয়ার পরে মেয়েটা ভাবছে, এখন সে কীভাবে বাড়ি পৌঁছাবে! চন্দ্রজা ছবিটা ভালো করে দেখল। দূরে কোথাও কি কোনো রাস্তা এঁকেছে? যেটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটা বাড়ি পৌঁছে যেতে পারে। এখনও আঁকা হয়নি দেখেই স্টেশনের পিছন দিকে একটা সরু রাস্তা এঁকে

দিল। একটা পথ বন্ধ হয়ে গেলে আরেকটা পথ খুলে যায়, এই ভেবেই সেই রাস্তায় একটা বাস আঁকতে শুরু করল চন্দ্রজা।

মেয়েটার পরনে শেষ বসন্তের মতো ফিকে হলদে একটা শাড়ি।

'কী রে আজ হঠাৎ শাড়ি পরে কলেজে এলি যে? আজ তো কোনো অকেশন নেই গুরু, তাহলে শাড়ি কেন? তাও আবার হলদে শাড়ি। এটা তো বসন্তকালও নয়।'

শ্রাবণী বলল, 'তোকে আজ অন্যরকম লাগছে। মুখেচোখে একটা যন্ত্রণার চিহ্ন, অথচ তুই সেটাকে দমিয়ে রেখে জিততে চাইছিস হাসি দিয়ে।'

ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ঠোঁটটা সামান্য উল্টে চন্দ্রজা বলল, 'এটা কাব্যিক কষ্ট নয় বস, এটা রিয়েল কষ্ট। এখুনি উৎসব আর অতনুরা এসে বলবে তিমিরকে রাজি করাতে। এখন থেকেই কেমন অস্বস্তি হচ্ছে, বিশ্বাস কর। শুধু প্রয়োজনের জন্য এভাবে কাউকে ব্যবহার করা আমার একেবারে অপছন্দের।'

শ্রাবণী বলল, 'তুই একটু বেশি ভাবছিস। কেউ ওর কিডনি চাইছে না রে। ও দিনরাত আঁকছে, আমরাও ডিপার্টমেন্টের সম্মানের জন্য ওর একটা আঁকা চাইছি। ও অদ্ভুত টাইপের ছেলে তাই আসতে রাজি হল না।'

উৎসব ক্লাসে ঢুকেই বলল, 'তিমির আসছে। সবাই ক্লাসের বাইরে চল এখুনি। একমাত্র চন্দ্রজা থাকুক।'

এবারে একটু ভয় ভয় করছে চন্দ্রজার। তিমির বেশ জেদি। ক্লাসে কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলে না। বন্ধুরা বলে, ও নাকি তিমিরের ক্রাশ। দু-একবার ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা ছাড়া আর কোনো লক্ষণ দেখেনি ও তিমিরের মধ্যে। যদি বন্ধুরা ভুল হয়, যদি তিমির অকারণে অপমান করে! এমনিতেই মন ভালো নেই ওর। জিতের করা অকারণ অপমানের জ্বালাটা এখনও ক্ষত হয়ে ব্যথা দিচ্ছে। না, সকাল থেকে একবারও ফোন করেনি

জিৎ। করবে না জানত অবশ্য চন্দ্রজা। তবুও বারবার সাইলেন্ট করা ফোনটা চেক করছিল আনমনে। এখন আবার যদি তিমির তেমন কিছু বলে দেয়, তাহলে...

ও কিছু বলার আগেই সবাই উৎসবের কথায় বেরিয়ে গেল ক্লাস থেকে। চন্দ্রজা একা বসে আছে রুমে। ঠিক দু'মিনিট পরে তিমির ঢুকল ক্লাসে। ঢুকেই এদিক-ওদিক তাকাল। ক্লাসরুম ফাঁকা কেন বোঝার চেষ্টা করছে বোধহয়। চন্দ্রজা খুব চাইছে ওকে জিজ্ঞাসা করুক তিমির। কিন্তু কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে রোজ ও যে বেঞ্চে বসে, সেই বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়ল। অদ্ভুত ছেলে তো। ফাঁকা রুম দেখেও কোনো হেলদোল নেই। চুপচাপ বসে নিজের খাতা-পেন বের করে কিছু একটা লিখতে শুরু করল। চন্দ্রজা অপেক্ষা করছিল, হয়তো তিমির ওকে কিছু বলবে লিখে লিখে। কিন্তু পাঁচ মিনিট হয়ে গেল। কিছুই বলল না। মহাভারত রচনা নিশ্চয়ই করতে শুরু করেনি। বাধ্য হয়ে বন্ধুদের ভয়েই চন্দ্রজা উঠে গিয়ে তিমিরের ডেস্কের সামনে দাঁড়াল। তিমির একমনে খাতায় একটা স্কেচ করছে। স্কেচের মেয়েটার মুখটা ওর খুব চেনা। রোজ একে আয়নায় দেখে চন্দ্রজা। ওকে সামনে দেখে একটু যেন লজ্জা পেয়ে খাতাটা বন্ধ করে দিল তিমির। বড় বড় চোখে অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে তাকাল চন্দ্রজার দিকে। তিমিরের চোখদুটোতে যেন সমুদ্রের গভীরতা। মুখে কিছু না বলেও যেন অনেক কিছু বলে দিতে পারে তিমির ওই চোখদুটো দিয়ে। তিমিরের ঠোঁটের কোণে প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি। যেন বলতে চাইছে, হঠাৎ ওর ডেস্কের সামনে, কিছু দরকার আছে?

চন্দ্রজা বলল, 'একই ডিপার্টমেন্টে কাটিয়ে দিলাম এক বছরের একটু বেশি সময়, অথচ তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি এখনও সেভাবে, তাই আজ কথা বলতে এলাম।'

তিমির খাতায় লিখল, 'আমি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নই। আলাদা করে আলাপ করারও কিছু নেই। খুবই নগণ্য মানুষ।'

চন্দ্রজা বলল, 'কথা বলতে পারো আমার সঙ্গে। তোমার উচ্চারণে সমস্যা থাকলেও আমি বুঝে নেব।'

একটু করুণভাবে হাসল তিমির। তারপর আবারও খাতায় লিখল, 'করুণা আমার বড্ড অপছন্দের জিনিস। প্লিস ওটা বাদ দিয়ে কথা বলো।'

চন্দ্রজা অনেক চেষ্টা করেও তিমিরকে তুই বলে সম্বোধন করতে পারছে না। চন্দ্রজা বলল, 'উৎসবরা আমায় পাঠাল তোমার কাছে। যদি তুমি এই কম্পিটিশনটাতে সহযোগিতা করো তাহলে সেকেন্ড ইয়ার জিতবে। তাই আমি তোমায় বলতে এলাম। তুমি রাজি না হতেই পারো। ওরা জোর করছিল বলে বাধ্য হয়েই আমি এলাম। তোমার ইচ্ছের ওপরে আমার জোর নেই।'

তিমির অপলক তাকিয়ে আছে চন্দ্রজার দিকে। কেমন একটা লজ্জা করছে চন্দ্রজার। ও মোটেই লাজুক স্বভাবের নয়। কিন্তু তিমিরের গভীর চাহনির সামনে কেমন একটা অজানা অনুভূতির সম্মুখীন হচ্ছে চন্দ্রজা।

চন্দ্রজা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ওরা হয়তো তোমায় ইউজ করতে চাইছে। তোমার ট্যালেন্টকে কাজে লাগিয়ে ডিপার্টমেন্টকে জেতাতে চাইছে। কিন্তু আমি বলছি তিমির, তোমার নিজের যদি ইচ্ছা না থাকে তাহলে শুধু আমি বলতে এসেছি বলে তুমি রাজি হয়ে যেও না। নিজে ভেবে সিদ্ধান্ত নিও।'

তিমির খাতায় লিখল, 'এতজন থাকতে তোমায় কেন ওরা এই দায়িত্ব দিয়েছে তুমি কি জানো?'

চন্দ্রজা যেন মরমে মরে গেল। ঘাড় নেড়ে বলল, 'জানি না।'

তিমির লিখল, 'বেশ, আমি রাজি ওদের বলে দিও। কোন বিষয়ে আঁকতে হবে আমায় জানাতে বলো, প্লিস।'

চন্দ্রজার খুশি হওয়ার কথা। খুব আনন্দ পাওয়ার কথা। কারণ তিমিরকে ও রাজি করিয়েছে। কিন্তু কেন কে জানে সেই আনন্দটা ওর হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে তিমিরের একতরফা পছন্দের সুযোগ নিচ্ছে। যেহেতু তিমির ওকে পছন্দ করে তাই ইমোশনালভাবে ওকে রাজি করাল।

তিমির খাতায় লিখল, 'মনখারাপ করার কিছু হয়নি। তুমি বললে বলেই আমি রাজি হলাম। সেটাতেও তোমার কিছু দোষ নেই। এত হেজিটেট কেন করছ? কেন এটা ভাবছ যে, এর কারণে আমি পরে তোমার থেকে কিছু চাইব? না চাইতেই তুমি অনেক কিছু দিয়েছ আমায়। তোমার কাছে আমি কোনোদিনই কিছু চাইব না। নিশ্চিন্তে থাকো।'

চন্দ্রজা লেখাটা পড়ে বলল, 'এই তুমি আমায় বুঝলে? তুমি কিছু চাইতে পারো ভেবে আমি হেজিটেট করছি না। বরং সুযোগ নেওয়া হল কিনা, তোমার অপছন্দ সত্ত্বেও তুমি রাজি হলে কিনা, এসব ভেবে মনখারাপ করছি।'

তিমির লিখল, 'প্লিস আর মনখারাপ করো না। এমনিতেই তুমি মনখারাপ করে আছ কোনো কারণে। এবারে চোখের কোণের জল আর তোমার কথা শুনবে না।'

অবাক হয়ে গেল চন্দ্রজা। তিমির কী করে জানল ওর মনখারাপ হয়ে আছে আজকে?

চন্দ্রজা বলল, 'কী করে বুঝলে আমার মনখারাপ হয়ে আছে?'

তিমির মুখটা নামিয়ে নিল। শুধু লিখল, 'আমি বুঝতে পারি।'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই সবাই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ক্লাসে।

চন্দ্রজা বলল, 'তিমির রাজি। ও আঁকবে আমাদের ডিপার্টমেন্টের হয়ে।'

উৎসব ছুটে গিয়ে তিমিরকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাঁচালি ভাই। ইজ্জত কা সওয়াল। তোর ওপরে আমাদের ভরসা আছে।'

তিমির মিটিমিটি হাসছিল।

চন্দ্রজা বলল, 'কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর আঁকতে হবে, এমন কিছু বলেছে?

তিমির জানতে চাইছিল।'

উৎসব বলল, 'ইউনিক কিছু এঁকে দে ভাই। সবার যেন চোখ ট্যারা হয়ে যায়। ক্লাসে বেশ একটা উত্তেজনা চলছে। তার মাঝেই বারকয়েক তিমিরের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল চন্দ্রজার। অন্যদিনও হয় হয়তো, কিন্তু সেভাবে খেয়াল করেনি কোনোদিন।

চন্দ্রজার ফোনে জিতের কোনো ফোন আসেনি গত তিন দিনে। ও জানে আসবেও না, তবুও একটা অভিমানভরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। বাবংবার ফোন যে চন্দ্রজাই করত সেটা এই ক'দিনে আরও বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ওদিক থেকে সব চুপচাপ।

সুলেখার ফোন থেকে জিতের ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা দেখল আজ বিকেলে। যথারীতি বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে চিল আউটের ছবি আপলোড করেছে। অনেক খুঁজেও জিতের পরিচিত গণ্ডির মধ্যে নিজেকে পেল না চন্দ্রজা।

কলেজে যেটুকু সময় ও থাকে, সেটুকু সময় বন্ধুদের সঙ্গে বেশ কেটে যায়। বাড়িতেও বাবা-মা রোজই কোনো না কোনো কারণে জিতের প্রসঙ্গ তোলে। বারণ করলেও ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ওরা ধরেই নিয়েছে বিয়েটা হচ্ছেই।

ইদানীং জিতের প্রসঙ্গ উঠলেই নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হচ্ছে এ বাড়িতে। এমন কেউ নেই যার কাছে ও এগুলো শেয়ার করতে পারে। চূড়ান্ত

বিরক্তিকর অবস্থা।

কলেজে ঢুকতেই শ্রাবণী বলল, 'তোকে একবার তিমির ডেকেছে। মানে আমাকে ইশারায় জানতে চাইছিল তুই এসেছিস নাকি।'

চন্দ্রজা বলল, 'তিমির কোথায়?'

শ্রাবণী ওর হাতে একটা চিরকুট দিয়ে বলল, 'এই নে।'

চিরকুটটা খুলতেই চন্দ্রজা দেখল, তিমির লিখেছে—আজ একবার আমার বাড়িতে আসতে হবে তোমায় কলেজ ছুটির পরে। খুব প্রয়োজন।

বিরক্তিতে ভ্রূটা কুঁচকে গেল চন্দ্রজার। শিল্পী, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, লুকিয়ে ওকে দেখা—এসব নাটকের যবনিকা পড়ে গেল এত সহজেই! একদিন একটু সহজ ব্যবহার করেছে বলে বাড়িতে ডাকতে সাহস পেয়ে গেল তিমির! হয়তো বাবা-মা থাকবে না, সেই সুযোগে ডাকছে ও। ভাবতেই গা'টা গুলিয়ে উঠল ওর। একটু শীতলতা তো দিতে পারত তিমির ওকে। বট না হোক কাঠচাঁপা গাছের ছায়াটুকুও যদি দিত হয়তো চন্দ্রজা নতুন করে ভাবতে শুরু করত। কিন্তু না, সবাই সেই একই ছাঁচে গড়া। জিতের সঙ্গে ওর ফাঁকা বাড়িতে যেতে চায়নি বলেই না জিতের আর কোনো ইন্টারেস্ট নেই ওর প্রতি। তিমির হঠাৎ আলাদা হবে, এমন ধারণা হলই বা কোথা থেকে ওর! চিরকুটটা হাতের মধ্যে মুচড়ে ধরল চন্দ্রজা। তিমির ক্লাসে ঢুকছে দেখেই চন্দ্রজা বলল, 'আজ কলেজ ছুটির পরে একসঙ্গেই তাহলে তোমার বাড়ি যাব।'

তিমিরের মুখে প্রাপ্তির হাসি।

চন্দ্রজা দেখতে চায় তিমির ঠিক কতটা নীচে নামতে পারে। এতদিন চোখের সামনে এক ধ্যানমগ্ন শিল্পীকে দেখে এসেছে। সাদা ক্যানভাস আর রং-তুলি যার একমাত্র সাধনা। তার মধ্যে কতটা পাশবিক প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে সেটাই দেখার অপেক্ষায় আছে ও। ক্ষতি করবে চন্দ্রজার? করুক।

একজন মনটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে গেছে। আরেকজন না হয় শরীরটাকে দেবে। একটা অদ্ভুত বোকা বোকা জেদ মাথা চাড়া দিল ওর মধ্যে। অন্যমনস্কভাবে কেটে গেল সময়টা। প্রফেসরের লেকচারের সময়েও বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল তিমিরের দিকে। সে একমনে শুনছে লেকচার। মুখের কোনো রেখায় লোভ নেই। কী সুন্দর অভিনেতা। দক্ষ শিল্পীর সঙ্গে দক্ষ অভিনেতাও!

কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখল তিমির দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে এগিয়ে এল বাইক নিয়ে। পিছনের সিটে হাত দিয়ে বসতে বলল।

চন্দ্রজার আজ আর কথা বলতে ভালো লাগছে না। তিমির ওকে এই চোখে দেখত এতদিন! ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইত! কষ্ট হচ্ছে ওর। বুকের বাঁ-দিকে চিনচিনে একটা অব্যক্ত কষ্ট। এর থেকে ভালো হত যদি কখনো তিমিরের সঙ্গে কথা না হত। ওই বন্ধুদের মাধ্যমে জানত, তিমির ওকে ভালোবাসে, তাহলেই বোধ হয় ভালো হত।

তিমির কোনো কথা না বলে বাইক চালাচ্ছে। চন্দ্রজা আকাশ-পাতাল ভাবছে। হঠাৎই ব্রেক কষে দাঁড়াতে সম্বিৎ ফিরল চন্দ্রজার। বেশ বড়সড় একটা তিনতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তিমির। তিমিরকে দেখে বা ওর হাবভাব দেখে বোঝা যায় ও ছা-পোষা মধ্যবিত্ত। এই বাড়িটা যে ওদের নয় বেশ বুঝতে পারছে চন্দ্রজা। বাড়ির সামনেই গ্যারেজে গাড়িও রয়েছে। তিমির ওকে নামতে নির্দেশ করল।

ওই গাড়ির পাশেই নিজের বাইকটা ঢুকিয়ে দিয়ে ইশারায় ভিতরে যেতে বলল। এতক্ষণে চন্দ্রজার ভয় করছে। এভাবে রিস্ক নেওয়া উচিত হয়নি ওর। রোজ খবরের কাগজ খুলেই দেখে গ্যাং রেপ থেকে শুরু করে আরও কত কী! চন্দ্রজাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাত ধরে টানল তিমির।

বাড়ির দরজা খুললেন একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা। মহিলার চেহারায় বেশ সম্ভ্রান্ত ভাবভঙ্গি। বুকের মধ্যে শিরশিরে ভয়টা একটু যেন প্রশমিত হল মহিলাকে দেখে।

মহিলা হেসে চন্দ্রজার হাতটা ধরে বললেন, 'তুমি চন্দ্রজা তাই না? তুতাইয়ের ব্যাচমেট। এসো, ভিতরে এসো।'

চন্দ্রজা কিছু বোঝার আগেই একটা বছর সতেরোর মেয়ে এসে চন্দ্রজাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বলল, 'তুমিই দাদার সব ছবির কমন ক্যারেক্টার? ছবিতে তোমায় রোজ দেখি। আজ সামনে দেখলাম।'

তিমির এতক্ষণ ইশারায় চালাচ্ছিল। এবারে বোনকে ধমকে উঠে বলল, 'চুপ করবি? চন্দ্রজা আমার ফ্রেন্ড।'

চন্দ্রজা জানতই না তিমিররা এতটা ধনী। ওর ভাবভঙ্গিমায় এত কুণ্ঠা মিশে থাকে যে, মনে হয় নিতান্ত মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে ও। চন্দ্রজা তিমিরদের থেকে অনেকটাই বিলো স্ট্যান্ডার্ডে বিলং করে। যদিও ওর হাবে-ভাবে কখনও সেটা কাউকে বুঝতে দেয়নি।

তিমিরের উচ্চারণে সমস্যা হয় বলেই বোধহয় ও বাড়িতেও কম কথা বলে। তিমিরের বাবা নিউরোলজিস্ট। ওর মা ব্যাঙ্কে জব করেন। ওর মা চন্দ্রজার সামনে একটু আফসোস করেই বললেন, 'ভগবান বোধহয় হিংসে করেই তুতাইয়ের কাছ থেকে ওর সাবলীল কথা বলার ক্ষমতাটা কেড়ে নিয়েছেন। আর কত দেবেন একটা ছেলেকে? আমার ছেলে বলে নয়, এত গুণ কোনো ছেলের মধ্যে থাকে না চন্দ্রজা।'

তিমিরের বোন ঠোঁট উল্টে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তো বেগুন। দাদাই বেস্ট বয়।'

চন্দ্রজা তমালীকে পাশে বসিয়ে বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে দাদার থেকেও দাদার বোন বেশি গুণের। দাদাটা তো মিশুকে নয় মোটেই।

একগুঁয়ে আর জেদি। রাগ যেন নাকের ডগায়। শান্ত হলে কী হবে, ভিতরে রাগ গনগন করে।'

আড়চোখে দেখল তিমিরের ঠোঁটে হাসি।

চন্দ্রজার মনটা পাখির মতো ডানা মেলতে চাইছে অনেকদিন পরে। নিজের ভাবনাগুলো মিথ্যে হওয়ায় ও যে এতটা খুশি হবে, নিজেই ভাবতে পারেনি।

তমালী বলল, 'ঠিক বলেছ দি। দাদা অমন শান্ত দেখতে হলে কী হবে, একবার যা বলে দেবে, সেটাই শেষ কথা। এই দেখো না, এত করে আমরা সবাই বললাম জন্মদিনে একটা পার্টি থ্রো করি। ওর কলেজের বন্ধুরা আসুক। আমার স্কুলের বন্ধুদের ডাকি আর বাবা-মায়ের কলিগরা আসুক। কিন্তু দাদার কড়া নির্দেশ ওর আজকে জন্মদিন, সেটা কাউকে বলাই যাবে না।'

চমকে উঠল চন্দ্রজা। আজ তিমিরের বার্থ ডে! অদ্ভুত ছেলে তো। সেসব না বলে ওকে কলেজ থেকে তুলে নিয়ে বাড়িতে চলে এল। চন্দ্রজা কোনো উপহারও আনেনি।

তমালী বলল, 'তুমি দাদার একমাত্র বন্ধু যে দাদার জন্মদিনে এ বাড়িতে এলে। মায়ের লাডলা বলে মা অবশ্য ঘরোয়াভাবে সবটুকুই করে।'

তমালীর কথা শেষ হওয়ার আগেই তিমিরের মা বললেন, 'চন্দ্রজাকে নিয়ে খাবার টেবিলে আয়।'

খাবার টেবিলে গিয়ে চমকে গেল চন্দ্রজা। বিশাল আয়োজন। পোলাও, চিংড়ি, মাংস, মাছ, পায়েস থেকে আইসক্রিম অবধি!

ওর মা বললেন, 'তুমি আর তিমির খেয়ে নাও। কলেজে ছিলে, সেই কখন খেয়েছ।'

চন্দ্রজা দেখেই আঁতকে উঠে বলেছিল, 'এত খাবার আমি খেতে পারব না আন্টি।'

তিমিরের মা বলেছিলেন, 'খুব পারবে।'

তিমির চন্দ্রজার চেয়ার টেনে দিয়ে বলেছিল, ‘ওকে কিছু নিয়ে জোর করো না মা।’

চন্দ্রজা তিমিরের কানের কাছে এসে বলেছিল, ‘শুভ জন্মদিন। উপহারটা কালকে দেব।’

তিমির লাজুক মুখে খাবারের থালায় হাত দিয়েছিল।

চন্দ্রজা বলেছিল, ‘চিংড়ির মালাইকারি আমার খুব পছন্দের।’

তিমির নিজের বাটিও ওর দিকে এগিয়ে দিয়েছিল নীরবে। চোখের ইশারায় বলেছিল, এটাও তোমার। তিমিরের মা খুব যত্ন করে খাইয়েছিলেন ওদের।

তিমির নিজের খাওয়ার থেকে বেশি নজর রেখেছিল চন্দ্রজার প্রতি। ওর নিজেরই লজ্জা করছিল এত যত্ন দেখে। খাওয়ার পরে তিমির নিয়ে গেল ওর তিনতলার ঘরে। ওর বেডরুমের পাশেই একটা বিশাল রুম জুড়ে ওর স্টুডিও।

তিমির বলল, ‘এসো। তবে রাগ করো না প্লিস।’

চন্দ্রজা বলল, ‘উচ্চারণে প্রবলেম আছে বলে কথা বলাই বন্ধ করে দেওয়া কী উচিত ছিল তিমির? সকলের সবকিছু তো পারফেক্ট থাকে না তাই না? তোমার উচ্চারণ পারফেক্ট নয়, তবুও গোটা ডিপার্টমেন্টকে তোমার পায়ে ধরতে হল এই কম্পিটিশনটা জেতার জন্য। তার মানে, তোমার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে তাই না তিমির? তাহলে অকারণে কথা না বলে এভাবে নিজেকে কষ্ট দেওয়ার কোনো মানে হয় না।’

তিমির এসব নিয়ে কথা না বাড়িয়ে একের পর এক ক্যানভাসে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রত্যেকটাই চন্দ্রজার ছবি। ছবির চন্দ্রজা যেন বাস্তবের থেকেও বেশি সুন্দর। ঈশ্বর বোধহয় ওকে গড়ার সময় এতটা যত্ন করেননি যতটা যত্ন করে এঁকেছে তিমির। যে যে পোশাক পরে চন্দ্রজা কলেজে গেছে

তার বোধহয় প্রতিটার ছবিই আছে ওর কাছে। চন্দ্রজার লজ্জা করছে। হাত-পা ঘামছে ওর। এভাবে কেউ ওকে নজরবন্দি করে রেখেছে ভেবেই লজ্জা আর সুখের আবেশে ছেয়ে যাচ্ছে ওর সমস্ত মন। কারোর কাছে ও এতটা গুরুত্বপূর্ণ, ভাবতেই পারছে না চন্দ্রজা।

তিমির লাজুক গলায় বলল, 'এই একজন মডেলকে আমি সামনে না বসিয়েও চোখ বন্ধ করে আঁকতে পারব।'

কথাটা বলতে গিয়ে বার চারেক আটকাল বলে সংকুচিত হয়ে গেল তিমির।

চন্দ্রজা ওর হাতটা আলতো করে ধরে বলল, 'আমি যে সুন্দরী আমি নিজেও তো জানতাম না। আয়নাও কখনও বলেনি আমায়। একমাত্র তোমার ছবিই প্রথম আমায় সুন্দরী বলল।'

তিমির থেমে থেমে বলল, 'চন্দ্রজা এই প্রতিযোগিতার জন্য একটা ছবি আঁকতে শুরু করেছি। একটু দেখো, ভুল কিছু দেখলে সাজেস্ট করো।'

চন্দ্রজা তখনও ঘোরের মধ্যে আছে। চারিদিকে ওর ছবি। এই স্টুডিওর মালকিন যেন শুধুই ও। আর চিত্রকরের মনে যে ওর একাধিপত্য, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিমির একটা ক্যানভাসের ওপর থেকে স্বচ্ছ কাপড়টা সরিয়ে দিল।

স্তম্ভিত হয়ে দেখছে চন্দ্রজা।

একটা মাল্টিপ্লেক্সের সামনে জিৎ নামছে গাড়ি থেকে। অপেক্ষারত চন্দ্রজাকেই দেখা উচিত ছিল ওখানে। কিন্তু তিমির এঁকেছে গাড়ি থেকে নামছে জিৎ, ওর চোখ দুটো যেন কাউকে খুঁজছে। ওদিকে একটি মেয়ে মুখাবয়ব অনেকটা চন্দ্রজার মতো, হাতে একগুচ্ছ বেলুন নিয়ে বাচ্চাদের বিলি করেছে। মেয়েটির চোখ ভর্তি জল, মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। যেন কোনো পিছুটান নেই মেয়েটার। পৃথিবীতে কোথায় কী চলছে সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপ

নেই। দূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে একজন চিত্রশিল্পী ক্যানভাসে কিছু এঁকে চলেছে।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চন্দ্রজা। ফিসফিস করে বলল, 'জিৎকে তুমি চিনলে কী করে?'

তিমির বলল, 'ওই পথ দিয়েই আসছিলাম সেদিন। দেখলাম তুমি প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করছিলে। আমিও দূরে দাঁড়িয়ে তোমায় দেখছিলাম। তারপর তোমার ভালোবাসার মানুষটি এল। ভেবেছিলাম তুমি রাগ করবে, চেঁচামেচি করবে। কিন্তু দেখলাম, ওই ছেলেটি দু'মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলে গাড়ি করে চলে গেল। তুমি একা দাঁড়িয়ে থাকলে। ওই অবস্থায় তোমায় দেখতে ভালো লাগছিল না। ছবির তুমি আমার কল্পনা। তুমি অন্য কোথাও আনন্দ খুঁজে নিতে পারো। জিতের ওপরে তুমি নির্ভরশীল নও। সেই ভাবনা থেকেই এঁকেছি ছবিটা।'

চন্দ্রজার কান্না পাচ্ছিল। জিতের অপমানটা তিমির দেখেছিল বলে, নাকি তিমির ওকে অন্যরূপে এঁকেছে বলে, সেটা ও নিজেও বুঝতে পারছে না।

তিমির তাড়াতাড়ি ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, 'আমি তোমায় কষ্ট দিতে চাইনি। প্লিস আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমার ফিয়ঁন্সের নামেও কিছু বলতে চাইনি। তোমরা ভালো থেকো।'

তিমির চুপ করে গেল। চন্দ্রজাও চুপ। একমাত্র নীরবতা অনেক কথা বলে যাচ্ছে কানে কানে। চন্দ্রজার মনে হচ্ছে, তিমিরকে কি বলে দেওয়া উচিত, জিতের সঙ্গে ওর ওইটুকু অবহেলার সম্পর্কও আর অবশিষ্ট নেই? না থাক, তিমির যদি ভাবে চন্দ্রজার দোষ ছিল এই ভাঙনে।

তিমির বলল, 'চন্দ্রজা, আমি জানি আমার কথা বুঝতে তোমার অসুবিধা হচ্ছে। তবুও আরেকটা কথা বলতে চাই, এই ছবিটাকে আরেকটু নিখুঁত

করার জন্য তোমার হেল্প লাগবে। মাত্র আধঘন্টার জন্য আমার মডেল হবে?'

চন্দ্রজা সামনের চেয়ারে বসে পড়ল।

তিমির চন্দ্রজার জল টলটল চোখদুটো আর ঠোঁটের কোণের হাসিটাকে আরও নিখুঁত করে ফোটানোর চেষ্টা করছে ছবিতে। চন্দ্রজার থুতনির ভাঁজে এসে বেশ কিছুক্ষণ তুলি বোলাল।

চন্দ্রজা নিজেও চিত্রশিল্পী। কিন্তু এমন ধ্যানমগ্ন হতে পারেনি এখনও পর্যন্ত। তিমিরকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর বাহ্যিক কোনো জ্ঞান নেই। মগ্ন হয়ে রয়েছে ওই ছবিতে। প্রতিটা বাচ্চার মুখে আলাদা আলাদা এক্সপ্রেশন। কেউ বেলুনের দিকে হাত বাড়িয়েছে, নেওয়ার ইচ্ছে ষোলো আনা, কিন্তু চোখে অনেকটা সংশয়।

একটি বাচ্চা মেয়ের চোখে রয়েছে বিস্ময়, কেন হঠাৎ বিনামূল্যে কেউ বেলুন দিচ্ছে ওদের সেটাই যেন ভাবছে। একজনের ঠোঁটে সব প্রাপ্তির হাসি। আরও দুজন দৌড়ে আসছে বেলুন শেষ না হয়ে যায় সেই আশঙ্কায়।

চন্দ্রজা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তিমিরের আঁকার দিকে। এত নিখুঁত কেউ কীভাবে আঁকতে পারে!

তিমির আচমকা উঠে এসে চন্দ্রজার মুখটা একটু বাঁ দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'আর দু'মিনিট এইভাবে থাকো।'

তিমিরের কাজ শেষ। ওর মা, বোনের সঙ্গে দেখা করে বাইরে এসে দাঁড়াল চন্দ্রজা। তিমির ওকে বাইকে চাপিয়ে বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'আজকের দিনটা আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ দিন।'

চন্দ্রজার বলা হল না, এটা ওরও জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। এত গুরুত্ব যে ওকে কেউ দিতে পারে, এই ধারণাই ছিল না ওর।

বাড়ির গেটের সামনে জিতের গাড়িটা রয়েছে দেখেই অবাক হল। হঠাৎ হল কী জিতের? ওদের বাড়িতে চলে এসেছে! চন্দ্রজার অভিমান কবেই বা ওর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল যে, একটাও ফোন না করে একেবারে বাড়িতে চলে এল রাগ ভাঙাতে!

বাড়িতে ঢুকেই দেখল চন্দ্রজার মা গদগদ হয়ে একজনকে খুব আদর আপ্যায়ন করছে।

চন্দ্রজা ঢুকতেই বলল, 'কী রে, এত দেরি হল আজ? এক্সট্রা ক্লাস এতক্ষণ চলছিল? দেখ কে এসেছে। ইনি জিৎদের বাড়ির ড্রাইভার। জিৎ আরও একটা শো-রুম ওপেন করেছে। তাই মিষ্টি পাঠিয়েছেন ওর মা। বেশ কয়েক প্যাকেট মিষ্টি ছড়িয়ে রয়েছে ডাইনিং টেবিলে।'

ড্রাইভারকে দিয়ে মিষ্টি পাঠিয়ে ভদ্রতা দেখাতে চাইছে জিৎ? নাকি জিৎ জানেই না, ওর মা পাঠিয়েছে? সত্যি বলতে কী, আর কোনো আগ্রহ নেই চন্দ্রজার জিতের প্রতি। জিতের কিছু দেওয়ার নেই ওকে। টাকা ছাড়া আর জিতের আছেই বা কী?

না আছে মন, না আবেগ, না ভালোবাসা, কিছুই নেই জিতের। যান্ত্রিক জীবন ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাছাড়া চন্দ্রজার অপেক্ষারাও আজ ঘুমিয়ে গেছে। তারাও আর জিতের জন্য রাত জাগতে নারাজ।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল চন্দ্রজা। ঠিক তখনই জিতের ফোনটা এল।

অনাগ্রহে ফোনটা রিসিভ করতেই জিৎ বলল, 'কী ব্যাপার, কল করোনি ক'দিন? ব্যস্ত আছ নাকি? তা ভালো। তুমি যত ব্যস্ত থাকবে তত আমায় বিরক্ত কম করবে। তত আমি মনযোগ দিয়ে কাজ করতে পারব। আর উন্নতি ততই বাড়বে। মিষ্টি খেয়েছ? রবীনকে দিয়ে মা পাঠিয়েছে তোমাদের বাড়ি। কলকাতার বেস্ট দোকানের মিষ্টি। সাধারণ মানুষের যেগুলো নাগালের

বাইরে সেগুলোকে কব্জা করেই আমার শান্তি। আমি একটা শো-রুম ওপেন করলাম। জুয়েলারির শো-রুম। এসে দেখে যেও একদিন।'

চন্দ্রজার ক্লান্ত লাগছে। আর বারবার মনে হচ্ছে, টাকা ছাড়া এই লোকটার কি কিছুই নেই?

ফোনটা রেখে দিল চন্দ্রজা।

আজ শুধুই ভাবতে ইচ্ছে করছে ওর। স্বপ্ন স্বপ্ন একটা দিন শুধুই ওকে ঘিরে। কিন্তু চন্দ্রজা জানে, তিমিরকে নিয়ে ভবিষ্যতের পথে যখনই পাড়ি দিতে যাবে তখনই এই সুখস্বপ্নটা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যাবে। কারণ চন্দ্রজার বাবা কিছুতেই মেনে নেবে না তিমিরকে। তিমির তোতলা বলে নয়, তিমির জিতের মতো অহংকারী নয় বলে। বাবার বোধহয় জিতের ওই ডোন্ট কেয়ার ভাবটাই বেশি পছন্দের। দিনরাত নিজের স্ট্যাটাস নিয়ে অন্যকে ছোট করার মানসিকতাটাই বোধহয় বেশি পছন্দ ওর বাবার। শুধু বন্ধুপুত্র বলে এই আবেগ, নাকি, এভাবে নিজেকে আরেকটু ওপরে তোলার ইচ্ছে— সেটা অবশ্য বুঝতে পারেনি চন্দ্রজা।

অন্যমনস্কভাবেই তিমিরকে লিখল, 'তোমাদের বাড়িতে কাটানো সময়টা ভুলব না আমি।'

তিমির হোয়াটসঅ্যাপে অন নেই। লিখেই ডিলিট করে দিতে ইচ্ছে হল। ঠিক তখনই তিমির লিখল, 'তোমায় একটা জিনিস পাঠাচ্ছি দেখো।'

একটা ছবি এঁকেছে তিমির। চন্দ্রজা একমনে খাবার টেবিলে খাচ্ছিল যখন সেই মুহূর্তকেই তুলে ধরেছে তিমির।

চন্দ্রজা লিখল, 'মডেল চেঞ্জ করো। না হলে একঘেয়ে হয়ে যাবে যে।'

তিমির লিখল, 'মডেল আমি চেঞ্জ করব না, যদি তোমার উডবি এসে আমার নাক ফাটিয়েও দেয়, তবুও মডেল চেঞ্জ হবে না।'

চন্দ্রজা লিখল, 'তিমির তোমার আঁকা সব ছবি নিয়ে, একটা আর্ট গ্যালারি ভাড়া করে এক্সিবিশন করতে পার।'

তিমির বলল, 'উঁহু, এই ছবিগুলো বিক্রি নেই। অন্য কারোর দেখার অধিকারও নেই। শুধু তোমার জন্মদিনে তোমায় একটা গিফ্ট করতে পারি।'

'শুভরাত্রি' লিখে অফ হয়ে গেল তিমির। চন্দ্রজার ইচ্ছে করছিল সারারাত কথা বলে যেতে।

ধ্রুবতারাকে চিনতে না পারাটা একমাত্র নাবিকের ব্যর্থতা, এতে ধ্রুবতারার কিছু বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। তিমির হচ্ছে ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল। ওকে নিজের করে পাওয়ার যোগ্যতা চন্দ্রজার নেই। তাই তো ওর বাড়ির একতলায় এখন জোরকদমে জিতের বাড়ি থেকে পাঠানো নামি দোকানের মিষ্টি নিয়ে আহ্লাদিত হচ্ছে ওর বাবা-মা।

তিমিরের আঁকা ছবি ওদের কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে। এই প্রথম সেকেন্ড ইয়ার জিতেছে থার্ড ইয়ারের কাছে। উৎসব আজ সবাইকে খাওয়াবে বলেছে চাঁদনী রেস্টুরেন্টে। কিন্তু গোটা কলেজ তিমিরের আঁকা ছবিতে বেলুন বেলানো মেয়েটাকে বেশ ভালোই চিনতে পেরেছে। অনেকে ঈর্ষা করেছে। এমন শিল্পীর ক্যানভাসে চন্দ্রজার মতো সাধারণ চেহারার মেয়ে স্থান পেয়েছে দেখে অনেকেই ফিসফিস করেছে। অনেকেই আঙুল দেখিয়ে বলেছে, 'দেখ, ওই মেয়েটাই ছিল ছবিতে।'

চন্দ্রজা সেই মুহূর্তগুলো শুধুই উপভোগ করেছে। বারবার মনে হয়েছে, তিমিরের দেওয়া সম্মান, ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরা উচিত ওর। বাবা-মা, জিৎ, দুই ফ্যামিলি এসবকে তুচ্ছ করে শুধুই তিমিরের হাতটা শক্ত করে ধরা উচিত। এত সম্মান, এত ভালোবাসা ওকে আর কেউ কোনোদিন দিতে পারবে না।

চন্দ্রজার বাবা বলে দিয়েছে, আর মাত্র একটা বছরের অপেক্ষা। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হলেই জিতের সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে দেবে। তারপর পড়াশোনা করুক, ও বাড়িতে কোনো আপত্তি নেই।

অন্যের ইচ্ছের ওপরে চলছে চন্দ্রজার প্রতিটা মুহূর্ত।

তিমিরকে ঘিরে আজ কলেজে উচ্ছ্বাস। শান্ত, নির্বিবাদী ছেলেটাকে ঘিরে সবাই মেতে আছে। তিমিরের চোখে খুশি উপচে পড়ছে।

চন্দ্রজা ব্যাগ থেকে বের করে একটা কফি মাগ ওর হাতে দিয়ে বলল, 'আজকের জন্য আমার তরফ থেকে গিফ্ট।'

তিমির আড়ালে গিয়ে প্যাকিংটা খুলেই চমকে উঠে বলেছিল, 'চন্দ্রজা আমি কীভাবে তোমার মডেল হলাম? এটা তো আমার হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি। কাপের গায়ে আমি নিজে? তুমি আমায় আঁকলে চন্দ্রজা? এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর তো কিছুই নেই আমার কাছে।'

চন্দ্রজা হেসে বলেছিল, 'আমি তোমার মতো নিখুঁত শিল্পী নই। তাই যা যা ভুল চোখে পড়ছে সেগুলো জাস্ট হজম করে নিও।'

তিমিরের চোখে জল। ছোট্ট করে বলল, 'কেউ কখনও আমায় আঁকেনি তুমি ছাড়া।'

তিমির জানত, চন্দ্রজার সঙ্গে জিতের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তাই বন্ধুত্বের থেকে বেশি কিছু দাবি করেনি কখনও। চন্দ্রজার সঙ্গে খুব শান্ত নির্মল বন্ধুত্ব রেখেছিল ও।

চন্দ্রজা জানত, তিমির শুধু ওকেই ভালোবাসে। ও নিজেও তিমিরকে ভালোবাসত কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি কখনও। শুধু জানত, কেউ একজন আছে এই পৃথিবীতে যে ওর জন্য অপেক্ষায় আছে। ওকে নীরবে ভালোবাসে। এই অনুভূতিটুকুই যেন চন্দ্রজার বেঁচে থাকার প্রেরণা ছিল। তিমিরের সবটুকুতে ও মিশে আছে এই উপলব্ধিটাই যেন পরম প্রাপ্তি ছিল।

থার্ড ইয়ারের শেষের দিকেই চন্দ্রজার বাড়িতে বিয়ের শপিং শুরু হয়ে গিয়েছিল। জিতের ব্যবহার আলাদা করে কিছুই বদলায়নি। চন্দ্রজার কোনো গুরুত্ব নেই ওর জীবনে। ও একেবারেই বাড়তি, না হলেও চলে। তবুও চন্দ্রজা জিতের সহধর্মিনী হতে চলেছে। নিজের সবটুকু আত্মসম্মান বলি দিয়ে ও জিতের জীবনসঙ্গিনী হতে চলেছে।

'কী হল বৌদিমনি, এত ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না? কাঁদছ কেন?'

বাহান্ন ইঞ্চি টিভির পর্দা জুড়ে তিমিরের মুখ। একটা সাক্ষাৎকার চলছে টিভিতে। দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্ট ফেস্টিভ্যালে বিচারক হিসাবে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিমির রায়। সেই অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইছে চ্যানেল।

প্রায় চারবছর পরে তিমিরকে টিভির পর্দায় দেখল চন্দ্রজা। ওর বিয়ের পরে তিমিরের সঙ্গে ইচ্ছে করেই আর যোগাযোগ রাখেনি চন্দ্রজা। অকারণে তিমিরের ক্ষতকে রক্তাক্ত করতে ইচ্ছে করেনি আর। তাই জিতের সঙ্গে নিজেকেও আস্তে আস্তে যন্ত্রমানবে পরিণত করে নিয়েছে। বেশ আছে বড়লোকের বউ হয়ে। আবেগহীন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

তিমিরও চেষ্টা করেনি যোগাযোগের। ধীরে ধীরে ও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল।

সেই বিয়ের রাতেই যা তিমির এসেছিল চন্দ্রজার বাড়িতে। অন্য কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে। নিজের আঁকা একটা সুন্দর ছবি উপহার দিয়েছিল। সেই ছবিটা এখনও টাঙানো আছে চন্দ্রজার বেডরুমে। ওর হাতে জিতের হাত, একটা বৃষ্টিভেজা বিকেল, মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

ভালো করে খুঁটিয়ে দেখেছিল চন্দ্রজা। খুঁজতে চেয়েছিল এই ছবি আঁকার সময় ক্যানভাসে তিমিরের চোখের জল পড়েছে কিনা। কিন্তু তিমির নিখুঁত শিল্পী, তাই খুঁজে পায়নি নোনতা জলের দাগ। পেলে হয়তো খুশি হত

চন্দ্রজা। তিমির তো জোর করতে পারত, নিদেন একটা প্রোপোজ! প্রোপোজ করলেই কি চন্দ্রজা ওর পরিবারের বিরুদ্ধে যেতে পারত? কেন যে কলেজের প্রতিযোগিতায় ওকেই ডাকতে পাঠানো হল তিমিরকে। কেন যে...

তিমিরের সেই উচ্চারণে সমস্যা এখনও আছে। একটু থেমে থেমেই কথা বলছে। সঞ্চালক জিজ্ঞাসা করলেন, 'শিল্পীদের নাকি একাধিক প্রেম হয়। আপনার জীবনে তেমন কেউ আছেন নাকি?'

তিমির হেসে বলল, 'আমার জীবনে প্রেম একটাই ছিল। এখন যার সঙ্গে জীবন কাটাব স্থির করেছি সেটা সমঝোতা। সম্পর্কটা ধীরে ধীরে প্রেমের রূপ নিলে আমি খুশি হব।'

বহুদিন পরে আজ খুব খুশি হল চন্দ্রজা। একজনের জীবনে সে অন্তত একক রয়েছে এখনও। তিমির তো বলল, প্রেম একটাই হয়েছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত একটা হিংসে হচ্ছে। মনে হচ্ছে ওর একচ্ছত্র আসনটা কেউ একজন ভরাট করে দিতে এসে গেছে। হয়তো আস্তে আস্তে ভুলে যাবে তিমির ওকে। মনে মনে বলল, প্লিস তিমির আমায় ভুলে যেও না। তুমিও আমার মতোই মানিয়ে নিয়ে সংসার করো, তোমার ক্যানভাস জুড়ে আমিই থাকতে চাই আজীবন।

চন্দ্রজা তাকাতেই পদ্ম বলল, 'বৌদিমনি, রাতে কী রান্না হবে জিজ্ঞাসা করছে বামুন।'

চন্দ্রজা নিজের গাল মুছে রান্নাঘরে গেল নির্দেশ দিতে।

আজ কতক্ষণ ধরে যে সেই ফেলে আসা পথে ও হেঁটে বেড়িয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এমন মাঝে মাঝে পুরোনো পথে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ালে মন্দ হয় না। জমাট বরফগুলোও মুক্তি পায় একটু।

দ্রুত পায়ে রান্না ঘরের দিকে এল চন্দ্রজা। কানের কাছে অনুরণন হয়ে চলেছে, 'আমার জীবনে প্রেম একটাই ছিল। এখন যার সঙ্গে জীবন কাটাব

স্থির করেছি সেটা সমঝোতা।’



আজ ১০ই বৈশাখ

'লোপা তুমি তো একেবারেই নতুন এসেছ এবাড়িতে, মাত্র মাস তিনেক হল। এখনও এবাড়ির নিয়ম কানুন কিছুই জানো না। আগে একটু দেখেশুনে নাও,' অরুণাদেবী বৌমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন। 'তোমার অফিসের ছুটি যেদিন যেদিন থাকবে সেদিন সেদিন একটু একটু দেখিয়ে দেব আমি। দেখিয়ে বলতে আমাদের বাড়ির মালকিন জয়ন্তীকে কখন কী নির্দেশ দিতে হবে, এটুকুই শিখে নেওয়া। আমরা এবাড়ির সবাই জয়ন্তীর ওপরে নির্ভরশীল। জয়ন্তীর যখন মাত্র পনেরো বছর বয়স তখন থেকে ও এবাড়ির দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছে। আমরা জলখাবারে কী খাব, দুপুরে কী খাব সব ওই ঠিক করে। বুকুন তো কলেজ থেকে ফিরে জয়ন্তীদির বানানো টিফিন ছাড়া খেতেই পারত না। আজও একই স্বভাব আছে।'

লোপার হাজবেন্ড সন্দীপের ডাকনাম বুকুন। সন্দীপ আর সুদীপা দুই ভাইবোন। সুদীপার বিয়ে হয়ে গেছে। কালেভদ্রে বাপের বাড়ি আসে। দুই ভাইবোনের একটাই মিল, ভীষণ রকমের অহংকারী আর মুডি। ওদের চোখে কারোর কোনো যোগ্যতা নেই একমাত্র ওদের ছাড়া। সুদীপা

কলেজের প্রফেসর। তাই রেলে ক্ল্যারিক্যাল জব করা লোপা ওর চোখে নিতান্তই সাধারণ। আর সন্দীপ তো আরেক কাঠি এগিয়ে। সে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তার ধারণা, এই পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কম গরু-ছাগলের সংখ্যা বেশি। তিনি উচ্চমার্গে বিরাজ করেন। লোপার মতো মধ্যমেধার মেয়েকে যে সে বিয়ে করেছে এটাই অনেক। লোপার প্লাস পয়েন্টে বলতে, লোপা ভয়ানক সুন্দরী। সুদীপার বক্তব্য হল, এমন সুন্দরীদের নাকি মাথাটা নিরেট হয়। এ নিয়ে ভাই-বোন যথেষ্ট হাসাহাসিও করেছে।

এই তিন মাসের মধ্যে লোপা বুঝে গেছে এ বাড়িতে তার যদি বন্ধু কেউ থাকে, তিনি হলেন সন্দীপের মা অরুণাদেবী। ভদ্রমহিলার মধ্যে একটা চিরন্তন মাতৃরূপ রয়েছে। সকলকেই কী অদ্ভুত শক্তিতে আপন করে নিতে পারেন!

শ্বশুরমশাই একটু রাশভারী মানুষ। কথা বিশেষ বলেন না। কলেজের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। বর্তমানে রিটায়ার্ড পার্সন। দিনরাত বই নিয়ে কেটে যায়। লেখালেখি করেন। মাঝে মাঝেই সভা সমিতিতে ডাক পড়ে। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে লোপার বিয়েটা হয়েছে। তাই এবাড়ির সবকিছুই তার অপরিচিত। এমনকী যার হাত ধরে এ বাড়িতে আসা সেই মানুষটাও। তিনমাসে কিছুই চেনা হয়নি। কারণ বিয়ের পর মাত্র পনেরো দিন লোপার সঙ্গে কাটিয়ে সে পাড়ি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। চার মাস ওখানে থাকবে। কোম্পানির সিনিয়র অফিসার বলে তাকে প্রায়ই বিদেশে ট্রাভেল করতে হয়।

লোপার যখন সন্দীপদের বাড়িতে বিয়ে ঠিক হয়েছিল, তখন সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বেশ হিংসার চোখে দেখেছিল ওকে। সকলের ধারণা ছিল ধনী আর সুদর্শন স্বামী পাচ্ছে মানেই বড্ড সুখী হবে লোপা। সকলের কাছে শুনতে শুনতে লোপা নিজেও অবশ্য সেটাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। একমাত্র ওর ছোটমাসি বলেছিল, 'শোন, সুখ বৃষ্টির ফোঁটা নয়, যে পড়ছে

আর তুই ধরে নিবি। সুখ পেতে গেলে অনেকটা স্যাক্রিফাইস করতে হবে। মানিয়ে নিতে হবে অনেক। আর গায়ের চামড়া, চোখের পর্দা এগুলোকে একটু মোটা করতে হবে। সকলের সব কথা গায়ে মাখলে চলবে না। তবে তুই সুখের চাবিকাঠির নাগাল পাবি। তোর ছোটমেসোও কিছু কম বড় চাকরি করে না, আর দেখতেও ছিল রাজপুত্র। তুই যদি আচমকা প্রশ্ন করিস, মাসিমনি তুমি কি জীবনে সুখী? তাহলে আমাকেও গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসতে হবে। সারাজীবন হীরের হার পরে অবহেলা পেয়ে হাসি মুখে ঘুরে বেড়ানোকে যদি সুখ বলিস, তাহলে আমি সুখী। তোর মাকে আমি বারণ করেছিলাম সন্দীপের সঙ্গে বিয়ে দিতে। ছেলেটাকে দেখেই অল্প বয়েসের তোর ছোটমেসোকে মনে পড়েছিল। তাই বুঝেছিলাম, তোরও আমার মতো বরের হাত ধরে বৃষ্টিতে ভেজার শখ পূরণ হবে না কোনোদিনই। সে যাই হোক, সুখী কেউ হয় না লোপা, সুখী হতে হয় চেষ্টা করে।'

ছোটমাসির সব কথার মানে যে ও বুঝেছে এমন নয়। কিন্তু এটুকু বুঝেছে, সুখ বড় দুর্লভ জিনিস। আত্মীয়-স্বজনের বলা কথার মতো সরলীকরণ না করাই ভালো। বিয়ের পরে সন্দীপদের বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য দেখে ওর মধ্যবিত্ত মন একটু ভয়ই পেয়েছে। এদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে তো? লোপার মা রান্নাবান্নার পরে হলুদ মোছা আঁচল দিয়ে ক্লান্ত মুখের ঘাম মুছেছে। এখানে জয়ন্তীদির পরনে থাকে কুকিং অ্যাপ্রন। বাড়িতে তিনটে পরিচারিকা। এক চিলতে বাগানের জন্য আবার সহদেবদা আছে মালি প্লাস ড্রাইভার হয়ে। তিনতলা বাড়ির গোটা একতলা জুড়ে এরাই থাকে। এত আতিশয্য দেখা অভ্যেস ছিল না লোপার। তবে পরিচারিকার সংখ্যা যতই বেশি হোক, এবাড়ির সকলে সব থেকে বেশি নির্ভর করে জয়ন্তীদির ওপরে।

কার ওষুধ কোন ড্রয়ারে থাকে থেকে শুরু করে কোন আলমারিতে কার পোশাক আছে পর্যন্ত জয়ন্তীদির নখদর্পণে। সোম থেকে রবি জলখাবারে কে

কী খাবে তাও মুখস্ত ওর। এমনকী এ বাড়ির কার কীসে অ্যালার্জি সেটাও মনে রাখতে হয় জয়ন্তীদিকেই। তাকে আবার লোপা কী নির্দেশ দেবে, বুঝে উঠতে পারল না। তবুও শাশুড়িমায়ের কথায় ঘাড় নেড়ে বলল, 'নিশ্চয়ই মা, তুমি আমায় শিখিয়ে দিও।'

টুকিটাকি কাজ চালানোর রান্না লোপা জানে। তবে এবাড়ির সকলেরই জিভের স্বাদ একটু বেশিই উন্নত। লোপা একদিন শখ করে একটু আলুর চপ বানিয়েছিল। সন্দীপের সে চপে নুন কম, শ্বশুরের তেল চপচপে লেগেছিল। তাই আর শখ করে কিছু করতে যায় না লোপা। একমাত্র অরুণাদেবী বলেছিলেন, 'আমার বাপের বাড়িতে একটা বিখ্যাত চপের দোকান ছিল। সুবোধের আলুর চপ। ঠিক যেন অমন স্বাদ পেলাম বহুদিন পরে।'

সন্দীপের দিদি সুদীপা ফোনে শুনে হেসে বলেছিল, 'দেখো লোপা, আমাদের বাড়িটাকে আবার ছা-পোষা মধ্যবিত্ত চপ-মুড়ির বাড়ি করে দিও না। ভাইয়ের পছন্দের ডিশ কন্টিনেন্টাল। পারলে ইউটিউব দেখে ওগুলো বানানোর চেষ্টা করো।'

না, আর চেষ্টা করেনি লোপা।

অরুণাদেবী বললেন, 'তুমি এবাড়ির বউ। আমার পরে এই বাড়ির দায়িত্ব তোমার। জয়ন্তী সব করে ঠিকই কিন্তু মাথার ওপরে একজনের নির্দেশ ছাড়া সে চলতে পারে না। তাই একটু একটু করে জেনে নাও এই বাড়ির নিয়মকানুনগুলো।'

জয়ন্তীদি শ্বশুরের দুপুরের চিকেন স্টু বানাচ্ছিল। রবিবারের দুপুরে বাড়ির সকলের জন্য মটন রান্না হলেও শ্বশুরমশাইয়ের যেহেতু হাই প্রেশার তাই সহদেবদা ছোট মুরগি নিয়ে আসে বাজার থেকে। চিকেন স্টু খান উনি। মটন খেতে বারণ করে দিয়েছেন মল্লিক ডাক্তার। মানে এবাড়ির হাউজ ফিজিশিয়ান ডক্টর আঙ্কেল। ডক্টর আঙ্কেলদের সঙ্গে এবাড়ির সম্পর্ক বহু

পুরোনো। সন্দীপের দাদু সনাতন গোস্বামী ছিলেন এই চত্বরের বিখ্যাত ডাক্তার। তখন থেকেই মল্লিক আঙ্কেলের বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব। সেই থেকেই দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা। মল্লিক আঙ্কেল বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ডাক্তার হন। সনাতন গোস্বামীর বাড়ির আর কেউ ডাক্তার হননি। সন্দীপদের এই বিশাল বাড়ি, এত সম্পত্তির অধিকাংশই ওর দাদুর করে দেওয়া।

বনেদি বংশ বলেই সন্দীপের এত অহংকার। দিনরাত ব্লু ব্লাড বলে বলে লোপার মধ্যে একটা হীনমন্যতা জাগিয়ে তুলেছে। এমনকী ফুলশয্যার দিনে লোপাকে আদর করার আগে একটা গিনির হার পরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'এটা আমার ঠাম্মার হার। নাতবউয়ের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। বনেদি ব্যাপারটা ঠিক বুঝবে না হয়তো তুমি। কিন্তু এটা মূল্য রাখার চেষ্টা করো।'

কেন কে জানে এরপর সন্দীপের গভীর চুম্বনে লোপার মুখটা তেতো হয়ে গিয়েছিল, আচমকা একটা বিতৃষ্ণা এসে বাসা বেঁধেছিল খোঁপায় জড়িয়ে রাখা জুঁই ফুলের গন্ধে। তবুও সন্দীপ ওর স্বামী আর এই দিনটাকে ঘিরে অনেক রঙিন স্বপ্ন এঁকেছিল চোখের কাজল, তাই সুখ খুঁজতে সন্দীপের আদরে ভাসতে চেষ্টা করেছিল লোপা।

কথায় কথায়, 'মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে লোপা, তুমি এখন গোস্বামী বাড়ির বউ।' এই শুনতে শুনতে মাত্র কয়েকমাসেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে লোপা। যদিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ওর ছবি দেখে বন্ধুরা ধরেই নিয়েছে হলুদ বন থেকে ও সুখের ঘরের চাবিকাঠিটা একাই আত্মসাৎ করে ফেলেছে। কারণ ওর ঠোঁটের হাসিটা সেখানে চিরস্থায়ী।

অফিস কলিগরাও কথায় কথায় বলে, 'তোমার তো ব্যাপারই আলাদা লোপা। সুখ, শান্তি, ভালোবাসা এসব তো স্বেচ্ছায় তোমার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়েছে। তুমি কতটা গ্রহণ করবে আর কতটা বর্জন করবে সেটা তো শুধুই তোমার ইচ্ছে।'

লোপা হাসে। ছোটমাসি বলেছিল, ‘সুখ মনে করলেই সুখ।’ সেটাই মনে করার চেষ্টা করে। এমনই কাটছিল দিনগুলো। রাতে একবার সন্দীপের সঙ্গে ভিডিও চ্যাট, ওখানের দিনগুলো ওর কেমন কাটছে তার ইতিবৃত্ত, ব্যস এইটুকুই।

সন্দীপ ফিরে আসবে খুব তাড়াতাড়ি। বাড়িতে খুশির হাওয়া বইছে। লোপার মনে ভয়। লোপা কী জানে না যে মডার্ন জগতের হিসেবের খাতাটাও যে সঙ্গে করেই আনবে সন্দীপ। আর বাড়ির সব পরিচারিকাদের সামনেই মজার ছলে বুঝিয়ে দেবে, লোপা একটা নিতান্ত সাধারণ মেয়ে। বুল্টি তো একদিন ঘর মুছতে মুছতে দাদার কথাতে হেসে কুটোপাটি হচ্ছিল। কারণ সন্দীপ খাবার টেবিলে বলেছিল, ‘লোপা তুমি ড্রাইভিং জানো না, তাই না? বিয়ের আগে তাহলে কলেজ যেতে কীসে? প্লিস, আমাদের বুল্টির মতো হারকিউলিস সাইকেল চালাতে বলো না যেন। মিনিমাম স্কুটি বলো।’

লোপা ব্রেডে কামড় দিয়ে বলেছিল, ‘পাবলিক বাসে যেতাম। কলকাতা শহরের নাইনটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট যেভাবে কলেজ যায়।’

বুল্টি ঘর মুছতে মুছতে হেসে উঠেছিল। বৌদি তার মানে তার থেকেও কমা, সাইকেলও ছিল না, ভেবে বেশ মজা পেয়েছে। আর সন্দীপ সবাইকে হাসিয়ে মজা নিয়েছে।

তাই অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে যে লোপার না পারার তালিকাটা কত বড় সেটা বুঝিয়ে দেবে সন্দীপ সকলের সামনেই। আর ভাই ফেরার আনন্দে সুদীপাদি নিশ্চয়ই আসবে। দুই ভাইবোন একসঙ্গে হওয়া মানেই লোপা বুঝতে পারে ও কতটা খুঁতযুক্ত মানুষ। গুড ফর নাথিং।

জয়ন্তীদি চিকেন স্টুটা নামিয়ে বলল, ‘দেখ বৌমনি, জেঠু কিন্তু স্টু’তে বাটার খায় না। অল্প গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেই হবে।’

ঠিক সেই সময়েই জয়ন্তীদির ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভ করেই বলল, 'বলিস কি রে সুকান্ত, সে ফিরে এসেছে? একা না দোকা কিছু দেখেছিস? আমি আজ বিকেলেই যাব।'

অরুণাদেবীর কপালে ভাঁজ পড়ল। সেটা লোপার নজর এড়াল না। জয়ন্তীদি ছাড়া গোস্বামী বাড়ি যে একদিনও চলবে না, সেটা এই তিনমাসে বেশ বুঝতে পেরেছে লোপা। এরা সবাই জয়ন্তীদির ওপরে ভীষণ রকমের নির্ভরশীল। আর জয়ন্তীদিও খুব ভালো, সকলের বড্ড খেয়াল রাখে। এ যেন তার নিজের বাড়ি।

সন্দীপের মা বলেন, 'মাত্র পনেরো বছর বয়সে নাকি জয়ন্তীর মা ওর বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের ছ'মাস যেতে না যেতে বর বোম্বে চলে গিয়েছিল হিরো হবে বলে। তারপর আর ফেরেনি। সেই থেকেই জয়ন্তী এবাড়িতে। ওর মা এবাড়ির পরিচারিকা ছিল। তাই নিজের মেয়েকে অরুণাদেবীর সামনে এনে বলেছিল,

'জয়ন্তীর কপাল পুড়ল, ওর বর ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। এমন সোমত্ত মেয়েকে তো আর যার তার বাড়িতে দিতে পারি না, যদি তোমরা রাখো তো নিশ্চিন্ত হই।' বুকুন তখন বছর পাঁচেকের আর তিতলি আট। পনেরো বছরের জয়ন্তী সেদিন থেকেই রয়ে গেল ওদের দিদি হয়ে।'

জয়ন্তীদির চোখে জল। হাতটা বেসিনে ধুয়ে বলল, 'জেঠিমা, আমায় একবার গোপালপুর যেতেই হবে। সুকান্ত মানে আমার খুড়তুতো ভাই বলল, তিনি নাকি ফিরে এসেছেন। এসেই আমার খোঁজ করছেন।'

অরুণাদেবী বললেন, 'কে ফিরে এসেছে সেটা তো বল।'

জয়ন্তীদি নিজের সিঁথির সিঁদুরে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'আমার স্বামী জেঠিমা। এতকাল পরে তার আমার কথা মনে পড়ল।'

জয়ন্তীদির বর্তমান বয়স পঞ্চাশ তো হবেই। সিঁদুর পরতে পরতে সিঁথি চওড়া হয়েছে, সিঁথির পাশের চুলে পাক ধরেছে। হাতের শাঁখায় গোস্বামী বাড়ির হেঁসেলের হলুদ-লঙ্কার ছোপ লেগে লেগে লালচে রং হয়ে গেছে। তার মনেও যে স্বামী সম্পর্কে এতটা আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, ধারণাই ছিল না লোপার। এখনও এই মানুষটা মনে মনে অপেক্ষা করত তার ফিরে আসার!

অরুণাদেবী একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তাতে তোর কী জয়ন্তী? বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে তোকে একলা ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল সেই লোকটা। তুই বাঁচালি কী মরলি সে খবর অবধি নেয়নি। তোকে তোর শ্বশুরবাড়ির লোক অপয়া বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এসব ভুলে গেলি? সে এসেছে শুনে অমনি ছুটছিস? সত্যি তোদের আর লজ্জা হবে না রে।'

জয়ন্তীদি মাথা হেঁট করে বলল, 'কী করব গো জেঠিমা, অগ্নিসাক্ষী করে মন্ত্র বলে বিয়ে করেছিল যে। না গেলে ওপরে গিয়ে জবাব দেব কী?'

অরুণাদেবীর চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ। তবুও শেষ চেষ্টা করে বললেন, 'আদৌ কি সত্যি ঘটনা এটা? এত বছর পরে চিনবি কী করে তাকে?'

জয়ন্তীদি চোখে জল নিয়ে একমুখ হেসে বলল, 'তার নাকের পাশে বড় আঁচিল আছে যে। লুকোনোর পথ পাবে না ওটা।'

ওদের কথার মাঝেই শ্বশুরমশাই ড্রয়িংরুম থেকে উঠে এসে বললেন, 'যেখানে যাচ্ছিস যা। দু'দিনের বেশি থাকবি না। তুই তো জানিস গোস্বামী বাড়ি তুই ছাড়া অচল। টাকা নিয়ে যাস আমার কাছ থেকে।'

জয়ন্তীদি যে এমন আচমকা চলে যাবে সেটা লোপাও বোঝেনি। এবাড়ির নিয়মকানুন বুঝতে এসে মহা সমস্যা হল। অরুণাদেবী রীতিমতো মাথায় হাত দিয়ে বসে বললেন, 'এই লোপা এই ক'দিন কী করে চলবে বলো দেখি?'

লোপা বলল, 'আমি অফিস যাওয়ার আগে না হয় একটু রান্না সেরে রেখে যাব।' অরুণাদেবী বললেন, 'অমন মনে হয়। পরশু দুই ভাইবোনেই আসছে। এদের বায়না সামলাবে কে? রান্না খারাপ হলে আমার সামনে তোমায় অপমান করবে। আমি বরং মালতিকে বলে একবার দেখি, ও যদি কাউকে ক'দিনের জন্য দিতে পারে। রান্নার হাত ভালো হতে হবে তার। তাছাড়া তুমি এত কষ্ট করবেই বা কেন? গোস্বামী বাড়ির সম্ভ্রমের গল্প করবে বাড়ির সবাই, আর নতুন বউ রান্না করে অফিস করবেই বা কেন?'

লোপার চোখে জল চলে এসেছিল। লোকে বলে শাশুড়িকে নিয়েই নাকি সব থেকে বেশি প্রবলেম হয় শ্বশুরবাড়িতে। লোপার তো এবাড়িতে ভালোবাসা পাওয়ার জায়গাই এটুকু। যেখানে ওকে মধ্যবিত্ত, ছা-পোষা, ব্যাকডেটেড এসব বলে ক্ষতবিক্ষত করা হয় না, বরং সবসময়ই প্রশ্রয়ের হাতটা থাকে ওর মাথায়।

এটুকুই লোপার সুখ এবাড়িতে। না শুধু এটুকু বললে হবে না। সহদেবদা বাগানের দক্ষিণ দিকে দুটো চৌবাচ্চা করে তাতে পদ্ম ফুটিয়েছে। কবে তাতে নতুন কুঁড়ি আসবে এটার প্রতীক্ষাটাও লোপার একটা মস্ত বড় সুখ। লোপার শাশুড়িমাও ওর মতো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকেই এবাড়ির বউ হয়ে এসেছিলেন। তাই বিশেষ সম্মান যে এবাড়িতে তিনি পাননি, সেটা বেশ বোঝা যায়। তাছাড়া শ্বশুরমশাইও নিজের জগতে ব্যস্ত থাকেন। কোনোকালে অরুণাদেবীকে তেমন গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাই হয়তো তিনি লোপার অপমানের জ্বালাটা বোঝেন।

মালতি এবাড়ির ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া-মোছার লোক। তিনতলা বাড়ি মোছামুছি করতেই হাঁপিয়ে যায় মালতি।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত মুখে বলল, 'এই রাজপ্রাসাদ মোছার পরে যেন আমায় রান্নাঘরের দায়িত্ব নিতে বলো না। আমি পারব না।

জয়ন্তীদি তার সোয়ামীকে পেয়ে গেছে, আর ফিরবে কিনা জানি না। আমি এই ঝামেলার হেঁসেল ধরতে পারব না।'

অরুণাদেবী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী আমার দ্রৌপদী এলেন রে! এককাপ চা করতে বলেছিলাম একদিন, পাঁচন বানিয়ে এনেছিলিস, মনে নেই? তোকে কে রান্নার দায়িত্ব দেবে রে? তুই আমায় একটা ভালো লোক দেখে দে।'

মালতি একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তাহলে ঐ চৌধুরী বাড়িতে নতুন ঢুকেছে সুমনাকে ডাকব? সে কিন্তু শিক্ষিত মেয়ে। জয়ন্তীদির মতো নয়। সাইকেলে করে রান্না করতে আসে। ওর বর হোম সার্ভিসের ব্যবসা করে। সব বাড়ি বাড়ি খাবার দিয়ে বেড়ায়। ও-ই সেসব রান্না করে শুনেছি। তারপর ওই চৌধুরী বাড়িতেই শুধু কাজটা ধরেছে। আর কাজ করবে কিনা জানি না অবশ্য। বলে দেখতে পারি।'

অরুণাদেবী বললেন, 'তুই আর দেরি করিস না। একবার ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

লোপা বেশ বুঝতে পারছিল মা চিন্তায় পড়ে গেছেন। সন্দীপ আর সুদীপার যা খাওয়ার ফিরিস্তি সেটা জয়ন্তীদি বলেই সামলাত। অন্য কেউ এসে এত যত্ন নিয়ে করবেই বা কেন! জয়ন্তীদির নিজের বাড়ির মতো হয়ে গেছে তাই করে।

লোপা ধীর পায়ে পদ্মের চৌবাচ্চার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। চারটে কুঁড়ি এসেছে। গোলাপি পদ্ম। পাতাগুলো নিজেদের গায়ে একফোঁটাও জল দাঁড়াতে দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে যেন। পাঁকে ফুটলেও নিজের গায়ে পাঁক মাখতে কিছুতেই রাজি নয় পদ্ম সুন্দরী নিজেও। হাওয়া দিলেই সবজে পাতাগুলো যেন হেসে কুটোপাটি করছে। ঠিক যেন প্রাইমারি স্কুলের টিফিনবেলা। অকারণ ঠেলাঠেলি আর হাসাহাসির ধুম পড়ে গেছে। জলে

আলপনা এঁকে যাচ্ছে পাতার স্পন্দন। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোপা। আগামীকাল সন্দীপ ফিরবে। ওর খুব আনন্দ হওয়ার কথা। নতুন বিয়ের ক'দিনের মধ্যেই সন্দীপ অস্ট্রেলিয়া চলে গিয়েছিল। দীর্ঘ বিরহের পরে ওর স্বামী ফিরছে ওর কাছে, স্বাভাবিকভাবেই মনে মনে উৎফুল্ল হওয়ার কথা। কিন্তু কেন কে জানে লোপার এমন কোনো অনুভূতি হচ্ছে না। জয়ন্তীদি তার এতদিনের ছেড়ে যাওয়া স্বামী ফিরে এসেছে শুনে যেভাবে ছুটল, তাতে বেশ বোঝা গেল জয়ন্তীদি মানুষটাকে ভালোবাসে। লোপা কেন পারছে না সন্দীপকে ভালোবাসতে! কেন মনে হচ্ছে সন্দীপ বাড়িতে ঢুকেই প্রথম মন্তব্যটা করবে, 'কী গো এখনও তুমি তোমার ওই ক্লার্কের জবটার মায়া ত্যাগ করতে পারোনি? ওটা ছাড়বে কবে? পৃথিবীটা দেখবে কবে? ও জব ছাড়ো, চলো নেক্সট ট্যুরে তোমায় নিয়ে যাব।'

বড্ড অপমানিত বোধ করে লোপা। অনেকগুলো চাকরির পরীক্ষা দিয়ে ওকে পেতে হয়েছে এই চাকরিটা। এবং রেলের এই চাকরিটা পাওয়ার পরে বন্ধুরা বলেছিল, 'তুই তো লাকি রে, একেবারে সেন্ট্রালে পেয়ে গেলি?'

এতদিন পর্যন্ত ও জানত এটা ওর বড় অ্যাচিভমেন্ট। সন্দীপের তাচ্ছিল্যের ফলে লোপা বুঝতে পারছে ওর মধ্যে মারাত্মকরকম একটা নেগেটিভিটি কাজ করছে। এসব ছাড়িয়ে সন্দীপকে কিছুতেই আপন করে ভালোবাসতে পারছে না ও।

একটা বেগুনি রঙের বোগেনভেলিয়া গাছ ওদের গেটের মাথাটাকে রঙিন করে রেখেছে। সেদিকে তাকাতেই দেখল মালতি প্রায় ছুটতে ছুটতে ঢুকছে। ওর সঙ্গে একজন মেয়ে, চুড়িদার পরে লম্বা বিনুনি করে একটু সংকোচের সঙ্গে আসছে।

মালতি বলল, 'এই যে জেঠিমা এই আমাদের সুমনাদিদি। মুখে সবসময় হাসিটি লেগে থাকে।'

সুমনা অরুণাদেবীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'বলুন জেঠিমা, কেন ডেকেছিলেন?'

অরুণাদেবীর চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সুমনাকে বেশ মনে ধরেছে। সুমনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রান্নাবান্না সব পারো তো?'

সুমনা শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, 'সব পারি। আমার স্বামী হোম সার্ভিসের ব্যবসা খুলেছে। প্রায় কুড়িজন কাস্টমার হয়েছে আমাদের। সব রান্না আমিই একা হাতে করি। চৌধুরী বাড়ির কাজটা আমায় ছেড়ে দিতে হবে। ওদের যে কাজ করত সেই পুরোনো রাঁধুনি ফেরত এসেছে।'

শুদ্ধ উচ্চারণ, সুন্দর কথা বলার ভঙ্গিমা সুমনার। তাই একটা কাজ আমি খুঁজছিলাম। আমি কিন্তু সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে কাজ করে বাড়ি চলে যাব। তারপর আমায় হোম সার্ভিসের রান্না করতে হবে। আবার বিকেলে আসব সাড়ে চারটে নাগাদ। চলবে?'

জয়ন্তী একবেলা নেই তাতেই যেন নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। এত বাছাবাছির সময় নেই। পেয়েছেন এই না কত। লোপাকে হাত নেড়ে ডাকলেন অরুণাদেবী। একটু অস্বস্তি নিয়েই এসে দাঁড়াল লোপা।

সুমনা বলল, 'বৌদি, আজকের রাতের রান্না কী কী করতে হবে তাহলে তুমি দেখিয়ে দিও।'

লোপা ঘাড় নাড়ল।

অরুণাদেবী বললেন, 'মাইনে কেমন নেবে বলো দেখি।'

সুমনা দৃঢ় স্বরে বলল, 'আট হাজারের কমও না বেশিও না।'

মালতি বলল, 'একটু কম করো গো সুমনাদি।'

সুমনা হেসে বলল, 'আমার কাজে ফাঁকি পাবে না। মাইনে আমি এটাই নেব। এতগুলো লোকের রান্না এর কমে করব না।'

অরুণাদেবীর টাকার অভাব নেই। তাড়াতাড়ি বললেন, 'যা চাইছ তাই হবে। কিন্তু কামাই করবে না। করলে আগে জানিয়ে দেবে।'

লোপা ওকে রান্নাঘর দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'রাতে মটর পনির আর ডাল মাখানি করতে হবে। দেখো রান্না যেন ভালো হয়।'

সুমনা ঘাড় নেড়ে বলল, 'খেয়েই দেখো না।'

লোপা আর অরুণাদেবী মিলে সুমনাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাতে খাবার টেবিলে শ্বশুরমশাই যে কথাটা প্রথম বললেন, 'আরে রান্নাটা কি ওই নতুন মেয়েটা করল নাকি? এ যে দুর্দান্ত টেস্ট!'

সত্যিই সুমনার হাতের রান্না খেয়ে প্রশংসা করতে হবে। অরুণাদেবী বললেন, 'নিশ্চিন্ত হলাম। বুকুন তিতলি এসে ঝামেলা বাঁধবে না।'

লোপা আজ অফিসে যাবে না। সন্দীপ বাড়ি ফিরছে, আজ অফিস গেলে দৃষ্টিকটু লাগে। তাছাড়া ও নিজেও সম্পর্কের ভিতটা তৈরি করতে চায়। বেডরুমটা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে। ফুলদানিতে রজনীগন্ধা, বিছানায় নতুন বেড কভার, সুন্দর করে গোছানো সন্দীপের ল্যাপটপ টেবিল। নিজেও পরিপাটি করে সেজে নিয়েছে। খুব বেশি কিছু না হোক, চোখে হালকা কাজল টেনেছে আর ঠোঁটে নরম লিপস্টিক। লোপাকে অবশ্য সাজতে হয় না বেশি। এমনিতেই সে চোখে পড়ার মতো সুন্দরী।

ওপরের ব্যালকনি থেকে রাস্তাটা দেখা যায় পরিষ্কার। ওখানেই বেতের চেয়ারে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল লোপা। এয়ারপোর্টে নেমে গেছে সন্দীপ ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে লোপাকে। ওয়াশরুমে সন্দীপের ফ্রেশ পোশাক রেখে দিয়েছে লোপা।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই চোখে পড়ল, সুমনা একটি ছেলের সাইকেলে চেপে আসছে। নিজের সাইকেল নেই আজ। ছেলেটার বয়স সুমনার থেকে বছর দুই তিনের বড়ই হবে। সাইকেলের রডে বসে

আছে সুমনা। ছেলেটা একহাতে সাইকেল চালাচ্ছে একহাতে ছাতাটা ধরে আছে সুমনার মাথায়। এত যত্ন করে ধরে আছে ছাতাটা যে, সূর্যদেবের ক্ষমতা নেই ওটা ভেদ করে সুমনার মাথায় রোদের ছোঁয়াটুকুও লাগাবে।

গোস্বামী বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নেমেই নিজের ওড়না দিয়ে ছেলেটার মুখটা ভালো করে মুছে দিল সুমনা খুব অভ্যস্ত ঢঙে। তারপর আরও দু-একটা কথা বলে এগিয়ে এল বাড়ির গেটে। ছেলেটা সুমনার বাড়িতে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে গেল বাজারের দিকে। সকালের নরম রোদে দেখা তুচ্ছ দৃশ্যটাও যেন বড্ড মূল্যবান মনে হল লোপার চোখে।

সুমনার ঠোঁটের কোণে সুখী সুখী একটা হাসি যেন লেগেই রয়েছে। চোখের দৃষ্টিতেও তারই পুনরাবৃত্তি।

বেশ লাগছিল দেখতে লোপার। সুমনা ঢুকতেই নীচ থেকে যে ডাক পড়বে সেটা জানে লোপা। তাই সময় নষ্ট না করে নীচে নেমে গেল।

সুমনার হাতে হাতে এটা ওটা দিতে দিতে লোপা বলল, 'বিয়ে কতদিনের?'

সুমনার শ্যামলা গালে যেন এই সামান্য কথাতেই আবিরের ছোপ লাগল। মিষ্টি গলায় বলল, 'বছর পাঁচেক হল। কৌশিকের সঙ্গে আমার প্রেম করে বিয়ে।

আমার মামার বাড়ির কাছে ওরও মামার বাড়ি। ওখানেই পরিচয়। বাড়ি থেকে বিয়েটা দিতে চায়নি। কিন্তু আমি কৌশিকের হাত ছাড়তে নারাজ ছিলাম। কৌশিক একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করত। এই কোভিড পরিস্থিতির জন্য চাকরিটা চলে গেল ওর। তখন বাধ্য হয়ে আমরা দুজনে মিলে এই খাবার হোম ডেলিভারির ব্যবসাটা খুলে বসলাম। আরেকটু পুঁজি দরকার বলেই আমি এক বাড়িতে রান্নার কাজ নিলাম। এক বছর করলেই

ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে যাবে। তখন আর কৌশিককে এত পরিশ্রম করতে হবে না।'

লোপা বলল, 'পরিশ্রম তো কৌশিকের থেকে তোমার বেশি হয় মনে হচ্ছে।'

সুমনা বলল, 'না না। আমি আর এমন কী করি একটু খুন্তি নাড়া ছাড়া? ও তো বাজার করে, সব টিফিন কৌটোতে প্যাক করে, বড় বড় হাঁড়ি কড়া মাজে, তারপর লোকের বাড়ি বাড়ি দিতে যায়। প্রচুর পরিশ্রম করে কৌশিক। আমায় সুখে রাখার জন্য সব করতে পারে ও।'

লোপা অবাক হয়ে দেখছিল সুমনাকে। অন্যের বাড়িতে রান্না করতে আসা মেয়েটাও সুখের সংজ্ঞা জানে। ও জানে ওর হাজবেন্ড ওর সুখের জন্য সব করতে পারে।

সুমনা কৌশিকের নামে প্রশংসা শুরু করলে আর থামে না, এটা খেয়াল করল লোপা।

সন্দীপ বাড়ি ফিরে লোপাকে প্রথম কথাটাই বলেছে, 'যাক বাঁচালে। অবশেষে জবটা তুমি ছেড়ে দিয়েছ। এই ক'দিন গোস্বামী বাড়ির আভিজাত্য দেখে নিশ্চয়ই আর বাসে করে চাকরি করতে যেতে ইচ্ছে করছে না। খুব ভালো করেছ লোপা। তুমি এখন সন্দীপ গোস্বামীর বেটার-হাফ। এবারে তোমায় এসব মিডলক্লাস মেন্টালিটি থেকে বেরোতে হবে। তাও যদি বুঝতাম দিদির মতো কলেজের প্রফেসর। তা নয় রেলের গ্রুপ ডি কর্মচারীর সম্মান বলে কোনো বস্তু আছে নাকি!'

সন্দীপের হাতে জলের গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে লোপা বলল, 'আজ তুমি ফিরবে বলে ছুটি নিয়েছি। আগামীকাল অফিস আছে। ওয়াশরুমে তোমার ফ্রেশ পোশাক রাখা আছে। চেঞ্জ করে নাও। আমি ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসছি।'

সন্দীপ বিরক্ত গলায় বলল, 'ওহ্, নারী স্বাধীনতার ভূত তো আবার সহজে মাথা থেকে নামার নয়।'

লোপার মনটা মুহূর্তে বিরক্তিতে ভরে গেল। চোখের কোণের কাজল, ঠোঁটের নরম লিপস্টিক ব্যঙ্গ করল যেন। কারণ, লোপা ভেবেছিল এতদিন পরে হয়তো সন্দীপ এসেই ওকে জড়িয়ে ধরে বলবে, 'মিস করছিলাম।' অথবা 'কী মিষ্টি লাগছে আমার বউটাকে।' না, ভাবনাগুলো সত্যি হয় না লোপার।

সুমনার ব্রেকফাস্ট বানানো হয়ে গেছে। দুপুরের রান্না চাপিয়ে দিয়েছে। রান্না করতে করতেই ফোনে কথা বলছে। 'এঁচোড় তুমি কাটতে যেও না কৌশিক। হাত কাটবে। আমি গিয়ে কেটে নেব। সবেতে ওস্তাদি কিন্তু আমার ভালো লাগে না। ন্যাকা, বউ যেন আর কারোর হয় না। শোনো, আমার এত ভালোবাসার দরকার নেই। তার থেকে আমার কথাটা শুনলে খুশি হব।' ফোনটা কেটেই বলল, 'ধুর, একটা কথা শোনে না লোকটা। হাত কেটে একটা কাণ্ড না বাঁধিয়ে রাখে।'

লোপা সুমনার ভালোবাসার উত্তাপে উষ্ণ হতে হতে সন্দীপের জন্য ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে নিল একটা থালায়।

সুমনা ওকে দেখে লজ্জিত গলায় বলল, 'তোমরা তরকারিতে ঝাল বেশি খাও না কম?'

লোপা ছোট্ট করে বলল, 'কম খাই। মাঝারি দিলেই হবে।'

লোপা ঘনঘন তাকিয়ে দেখছিল সুমনার মুখে দিকে। সুমনা একেবারে স্বাভাবিক দেখেই নিশ্চিন্ত হয়ে ওপরে উঠে গেল।

সন্দীপ ফোনে কারোর সঙ্গে কথা বলছে। ইশারায় খাবারের প্লেটটা দেখিয়ে বারান্দায় চলে এল লোপা।

মেঘ করেছে আকাশ জুড়ে। ঠিক ওর মনের মতো। কিন্তু কোনো একটা পিছুটানের জন্যই বোধহয় ঝমঝমিয়ে নামতে পারছে না গাল, চিবুক, বুক বেয়ে। কিন্তু বৃষ্টি নামটা খুব দরকার। গুমোট হয়ে আর কতদিন? নিম্নচাপ হয়ে থাকলে ক্ষত বাড়ছে ক্রমাগত। বৃষ্টি আসুক প্রবল বেগে, ক্ষতগুলো ধুয়ে যাক নোনতা জলে। প্রলেপ পড়ুক মনের গভীরে। মেঘেদের দিকে তাকিয়ে আছে লোপা। কেন সন্দীপের সঙ্গে এভাবে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে? কেন কিছুতেই ওকে আঁকড়ে ধরতে পারছে না ও?

রাস্তায় চোখ পড়ল। কৌশিক মানে সুমনার স্বামী দাঁড়িয়ে আছে গেটের বাইরে। সুমনার সাইকেলটা দোকানে দিয়েছে, বেলটা কাজ করছিল না বলে। তাই কৌশিক আজ ওকে নিয়ে এসেছে। কৌশিক অপেক্ষা করছে। লোপা দেখল নেহাতই সাধারণ চেহারার মানুষ। চেহারায় কোনো বিশেষত্ব প্রকাশ পায় না। শুধু অপেক্ষার ভঙ্গিমাটি বড় মনকাড়া। লোপার মনে হল, সুমনা সত্যিই খুব ভাগ্যবতী। দিনের শেষে একজন আছে যে ওর জন্য অপেক্ষায় আছে। একটা ভরসার কাঁধ আছে যেখানে ও ক্লান্ত মাথাটা ঠেকাতে পারে।

সুমনার গলা পেল, 'জেঠিমা এলাম গো। সব করে টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখেছি। মালাইকারিটা মাইক্রোওভেনের বক্সে রেখে দিলাম। যদি গরম করো তাই।'

সুমনাকে দেখেই কৌশিকের মুখে হাসি ফুটল। যেন কতজন্ম পরে ওদের দেখা হল। মাঝের ঘন্টাতিনেক যেন কত বিরহে কাটিয়েছে। সত্যি, অপেক্ষা যে এত সুন্দর হয় জানা ছিল না লোপার। কারণ ও এতদিন একজনের অপেক্ষায় ছিল। ঘরদোর সাজিয়ে, নিজেকে গুছিয়ে বসেছিল। কিন্তু যার প্রতীক্ষায় ও ছিল, সে যেন এসে অবহেলায় বলে গেল, এসবের দরকার নেই। এত সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই!

সুমনা হাসতে হাসতে কিছু একটা বলল। কৌশিক হাত নেড়ে আইসক্রিমওয়ালাকে ডাক দিল। দুজনে দুটো আইসক্রিম নিয়ে অকারণে হাসতে হাসতে চলে গেল।

লোপার মেঘলা মনে কয়েকফোঁটা বৃষ্টি পড়ল যেন। সঙ্গে একটা অবুঝ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

সন্দীপ খেতে খেতেও কল করছিল। এখন ঘরে ঢুকে লোপা দেখল ও ঘুমাচ্ছে।

ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল লোপা। সন্দীপ এককথায় সুপুরুষ। ছাদনাতলায় সবাই প্রকাশ্যে বলছিল, 'কী মানিয়েছে বর-বউকে।'

লোকের এসব টুকরো কথার স্রোতে অনেক অনুভূতিই গলার কাছে দলা পাকিয়ে এসেছিল লোপার। মনে হচ্ছিল সন্দীপের কানে কানে অনেক কিছু বলতে। কিন্তু আচমকাই যেন শব্দভাণ্ডারে টান পড়েছিল ওর। বলা হয়ে ওঠেনি কিছুই। শুধু সুখানুভূতিতে লাইনার পরা চোখের পাতাটা ভিজে ছিল।

আজও ইচ্ছে করছে ঘুমন্ত সন্দীপের কপালে একটা চুমু এঁকে দিতে। যেভাবে আকাশের বুকে চুম্বন করে বিদায়ী বেলার চাঁদ, ঠিক তেমনই। কিন্তু সন্দীপের ঘুম ভেঙে গেলে হয়তো বলবে, 'ফ্লাইটে তো কখনো লং জার্নি করোনি। তাই ক্লান্তিটা বোঝো না। ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে তো আমার! এসব করার জন্য তো গোটা রাত ছিল লোপা।'

লজ্জায় অধোবদন হয়ে যাবে ও। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার থেকে উপেক্ষিত হওয়া ভালো। সন্দীপ বুঝবেই না, ইচ্ছেগুলোর ইচ্ছেও হঠাৎ করেই হয়। সে রাতের জন্য অপেক্ষা করে না।

পাশের ঘরে গিয়ে একটা বই নিয়ে বসল লোপা। উফ একটা গোটা দিন অফিস না গিয়ে এবাড়িতে কাটানো সত্যি কঠিন। আজ বিকেলে সুদীপাদি

আসবে। ভাবতেই ভয় ভয় করছে। আবার দুই ভাইবোনের মজা শুরু হবে ওকে কেন্দ্র করে। কতরকমভাবে যে মানুষ আনন্দ পেতে চায়, এদের না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। লোপাকে দুজনে মিলে ছোট করে অদ্ভুত একটা স্যাডিস্টিক প্লেজার পায়। লোপার মুখ নীচু দেখলে এদের হাসি পায়।

বিকেলে সুমনা এল। ছোট্ট একটা টিফিন কৌটো ওর হাতে লুকিয়ে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'খেও।'

সুদীপা ঢুকেই বলল, 'জয়ন্তীদি নেই মা? এই ক'দিন তবে বাইরে খাবার অর্ডার করতে হবে।'

সন্দীপ বলল, 'নতুন যাকে মা কাজে লাগিয়েছে, খুব ভালো না হলেও চলে যাবে বুঝলি!'

লোপা দেখেছে লাঞ্চ টেবিলে সুমনার রান্না করা মালাইকারি সন্দীপ প্রায় চেটে খেয়েছে, তবুও প্রশংসা করতে বড্ড কষ্ট এদের।

সুদীপা লোপাকে দেখে বলল, 'তুমি আজ অফিস যাওনি মনে হচ্ছে। স্যালারি কাটবে না তো গ্রুপ ডি'দের? আসলে আমি ঠিক জানি না কিনা!'

ওদের কথার টুকটাক উত্তর দিয়ে লোপা ছাদে উঠে এসেছে। সুমনার দেওয়া ছোট্ট টিফিন কৌটোতে কী আছে দেখার আগ্রহই ওকে ছাদে টেনে এনেছে। খুলতেই বহু পুরোনো অথচ পরিচিত একটা গন্ধ ওর নাকে এসে ঝাপটা দিল। কয়েতবেল মাখা রয়েছে বেশ লঙ্কা দিয়ে। জিভে দিতেই সেই পুরোনো পরিচিত স্বাদটা!

এক নিমেষে লোপা পৌঁছে গেল ওদের বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের টিফিন টাইমে। গেটের ঠিক বাইরেই বসত রামদুলাল কাকা। কয়েতবেল নিয়ে। সঙ্গে নুন, লঙ্কা, তেল আর অল্প মিষ্টি দিয়ে বেশ করে মেখে কাঠের চামচ দিয়ে ধরিয়ে দিত ওদের হাতে। আহা, অমৃতও হার মানত। সমস্যা হত অন্য জায়গায়। বাড়ি ফিরে দাঁত জিভ দিয়ে আর কিছু খাওয়ার ক্ষমতা

থাকত না। মা পিঠে গুম করে কিল দিয়ে বলত, ‘আজকেও ওই টক বেল খেয়েছিস?’

ওসব টুকটাক মার সহ্য করে নিত ওরা। কিন্তু কয়েতবেলের স্বাদ ছাড়তে নারাজ ছিল। লোপা নিশ্চিন্ত হল, সুমনা ওকে চিনে ফেলেছে। তাই হয়তো আজকে বেল মেখে এনেছে। নাকি এমনিই কাকতালীয় ব্যাপার! মনের দ্বন্দ্বকে আপাতত পাত্তা না দিয়েই অল্প খেল। এখন আর বেশি খাওয়ার অভ্যাস নেই। আবার কাল খাবে বরং।

ইদানীং রোজই টিফিনে ওর পছন্দের তরকারি পাচ্ছে লোপা। যেমন লাউ চিংড়ি এবাড়ির কেউ মুখেই দেয় না। অথচ অফিসে টিফিনবক্স খুলে লোপা দেখল ভাতের সঙ্গে লাউ চিংড়ি রয়েছে। অবাক হয়ে গিয়েছিল ও। বাড়ি ফিরে অরুণাদেবীকে জিজ্ঞাসাও করেছিল, ‘আজ কি বাড়িতে লাউ চিংড়ি হয়েছিল?’

অরুণাদেবী হেসে বলেছেন, ‘ধুর পাগলী। ও জিনিস এবাড়ির কেউ খায় নাকি?’

চুপ করে গেছে লোপা। আর কথা বাড়ায়নি।

সন্দীপের ব্যবহার দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছিল। লোপার যেন সবকিছুই খারাপ। প্রতি মুহূর্তে ওর দোষ না ধরলে সন্দীপের চলে না। এমনকী রাতে বিছানায় শুয়েও ওর বক্তব্য, লোপার শরীরে নাকি সেই উত্তেজনটাই নেই যেটা সন্দীপ চায়। লোপা বোঝাতে পারে না, মনখারাপ থাকলে শরীর কথা বলে না। মনের ভাঙা-গড়ার সঙ্গে শরীরেরও ছন্দপতন ঘটে। একঘেয়ে দীর্ঘ অপমানের পরে অপমানিত ব্যক্তির শরীর জাগে না আর। তবুও সেই অপমান করা ব্যক্তিকে নিজের শরীরের অধিকার দিতে বাধ্য হয় লোপা—এটাই তো ওর হেরে যাওয়া, বোধহয় এটাই ওর ভবিতব্য।

জয়ন্তীদি ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে, সে আর ফিরবে না। স্বামী ফিরে এসেছে তার কাছে। বাকি জীবনটা তাকে নিয়েই কাটাবে। ক'দিনের মধ্যে আসবে জমানো টাকা নিতে। বাড়ির সবাই অল্পবিস্তর বিরক্ত জয়ন্তীদির ওপরে। এমন নির্ঝঞ্ঝাট সর্বক্ষণের সঙ্গী চলে গেলে বিরক্ত হয় বৈকি মানুষ। জয়ন্তীদি যে কোনোদিন গোস্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে, এ যেন ধারণার বাইরে ছিল। যার তিনকুলে কেউ ছিল না, তার আবার নতুন করে এই বয়েসে এসে সংসার হবে কে জানত! এবাড়ির সকলের সুমনার রান্না পছন্দ হলেও, জয়ন্তীদির অভাব সকলেই অনুভব করছে। অরুণাদেবী সুমনাকে আরেকটু তোয়াজ করে চলছেন। যদি ছেড়ে চলে যায় তো আবার মুশকিল।

সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল, সুমনা এল বেশ সেজেগুজে। মাথায় একটা বেলির মালা জড়িয়ে, সুন্দর লালচে শাড়ি পরে। বেশ মিষ্টি লাগছিল সুমনাকে। লোপা অফিস যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছিল। সুমনাকে দেখে বলল, 'আজ এত সাজগোজ! কী ব্যাপার?'

সুমনা নতুন বউয়ের মতো লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল, 'আজ যে ১০ই বৈশাখ গো। আমাদের বিয়ের দিন। তাই হোম সার্ভিস বন্ধ রেখেছি। এই রান্নাটা করেই বেরিয়ে যাব। কৌশিক বলেছে, আজ রেস্টুরেন্টে খাব আর সিনেমা দেখব। এই মালাটা ও জড়িয়ে দিল। লজ্জা করছিল রাস্তা দিয়ে আসতে কিন্তু ও কষ্ট পাবে বলে খুলিনি।'

লোপার খুব ভালো লাগে ওদের এই খুনসুটি ভরা প্রেমের গল্প শুনতে। অধরা জিনিসের প্রতি মানুষের লোভ চিরকালের। ভালোবাসা, আবদার কেমন হয়, বিয়ের পাঁচমাস পরেও বুঝল না লোপা। মুখ নীচু করে থেকেও সন্দীপের ভালোবাসার পাত্রী হয়ে উঠতে পারল না। তাই সুমনা আর কৌশিকের সবকিছু ও যেন মানস চোখে দেখে নিতে পারে। ঠিক সিনেমার

ফ্ল্যাশব্যাকের মতো। লোপা নিজের ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে একটা নতুন শাড়ি বের করল। সুমনাকে শাড়িটা দেবে বলে। বিয়েতে পাওয়া শাড়ির শেষ নেই। অফিস যাতায়াতের জন্য তো কুর্তি, চুড়িদারই পড়ে।

শাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে আসার আগেই সন্দীপ বলল, 'শোনো, তোমার বাবা ফোন করেছিলেন। তোমার বাড়িতে কীসের একটা কালীপুজো আছে তাই নিমন্ত্রণ করলেন। আমি এসব চিপ জায়গায় যেতে পারব না কিন্তু। তুমি তোমার বাবাকে জানিয়ে দিও। আর নিজেও জেনে নিও।'

লোপা বাইরে বেরোতেই দেখল সুমনা দুজনের টিফিনবক্স হাতে দাঁড়িয়ে আছে। লোপা টিফিনবক্স দুটো নিয়ে ওর হাতে শাড়িটা দিয়ে বলল, 'এটা বিবাহবার্ষিকীর উপহার।'

সুমনা একমুখ হেসে বলল, 'দারুণ শাড়ি।'

তারপরেও সুমনা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির ওপরে। লোপা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কিছু বলবে?'

সুমনা ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের বিনোদিনী গার্লস স্কুলে লোপা বলে একটা মেয়ে ছিল, ঠিক তোমার মতো দেখতে। কিন্তু স্বভাবটা একটু অন্যরকম। প্রতিবাদী মেয়ে ছিল। অন্যায় দেখলেই মুখের ওপর বলে দিত। আমাদের ক্লাস নাইনে পড়াকালীন একবার উঁচু ক্লাসের দিদিরা এসে খুব বাজে বাজে কথা শুনিয়েছিল। তখন লোপা একমাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'তোমরা বোধহয় জানো কোরাস গান একজনের গাওয়া নয়। তাই অনুষ্ঠানের কোরাস গানটা খারাপ হওয়ার জন্য শুধু ক্লাস নাইন দায়ী নয়। ওখানে নাইনের মাত্র দুজন মেয়ে ছিল। বাকি আটজন ছিল ইলেভেনের মেয়ে। বাকিদের কোনো দায় নেই তার মানে? লোপা রুখে দাঁড়াতেই মেয়েগুলো পিছু হঠেছিল। আমরা তারপর থেকে লোপাকে আমাদের রোল মডেল মানতাম। অকারণে অপমান সহ্য সে করত না। সে কয়েতবেল মাখা, লাউ

চিংড়ি এসব খেতে খুব ভালোবাসত। কে জানে মেয়েটা কোথায় হারিয়ে গেল!’

সুমনা আর দাঁড়াল না।

লোপা সন্দীপের হাতে টিফিন বক্সটা দিতে দিতে বলল, ‘জানো সন্দীপ, আমিও চাই তুমি ওবাড়িতে আর যেও না। আসলে আমাদের বাড়ির লোকজন একটু রুচিসম্পন্ন তো। তাদের শিক্ষায় মানুষকে অপমান করতে শেখায় না। আসলে গোস্বামী বাড়ির সম্মান ডোবানোর জন্য তুমি একাই একশো। লোকে তোমায় দেখলে ভাববে সনাতন গোস্বামী নাতিকে মিনিমাম এটুকু শেখাননি।’

সন্দীপ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অপরিচিত লোপার দিকে। এভাবে কথা দিয়ে সপাটে থাপ্পড় যে লোপা মারতে পারে, সেই ধারণা ছিল না সন্দীপের।

লোপা একটু হেসে বলল, ‘চাকরিটা আমি ছাড়তে কেন পারছি না জানো? তোমার যা অসভ্য মেজাজ, প্রাইভেট কোম্পানি থেকে যদি এই বিহেভের জন্য তোমায় স্যাক করে দেয় তখন আমার গ্রুপ ডি’র মাইনে তোমায় খাইয়ে দিতে পারবে। চললাম, অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। অফিস থেকে সোজা ওবাড়ি চলে যাব।’

সন্দীপ পিছন থেকে হতভম্ব হয়ে বলল, ‘আমি কি অফিস ফেরত ও বাড়ি যাব?’

লোপা ঘাড় নেড়ে বলল, ‘উঁহু। তুমি না গেলে আমি খুশি হব।’

কতদিন নিম্নচাপের পরে আজ অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। ওড়না দিয়ে নিজের চোখ দুটো ভালো করে মুছে নিল লোপা।

সুমনার রান্না কমপ্লিট। ও বেরিয়ে যাচ্ছে। গেটের সামনে পরিপাটি হয়ে অপেক্ষা করছে কৌশিক।

সুমনার দিকে তাকিয়ে লোপা বলল, 'চিনতে পেরেছিলি তো পরিচয় দিলি না কেন?'

সুমনা হেসে বলল, 'যে কারণে তোর ইচ্ছে থাকলেও পারিসনি। বাড়ির রাঁধুনি তোর ক্লাসমেট জানলে তোর সম্মান কি এবাড়িতে বাড়ত?'

লোপা বলল, 'কলেজে ভর্তি হলি না কেন?'

সুমনা হেসে বলল, 'বাবা মারা যাওয়ার পরে আর সামর্থ ছিল না রে। তবে বিশ্বাস কর, ভালো আছি। বড্ড ভালোবাসায় রেখেছে কৌশিক।'

লোপা বলল, 'তোর জন্য আবার আজ অনেকদিন পরে সেই পুরোনো লোপাকে আমিও ফেরত পেলাম।'

সুমনা বলল, 'পুরোনো পরিচয় লুকানো থাক। আমার কাজটা দরকার আর তোকেও সসম্মানে বাঁচাতে হবে এবাড়িতে। তাই আজ আসছি বৌদিমনি।'

লোপা ঘাড় নেড়ে বলল, 'এসো।'

কৌশিকের মুখে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে দেখা হওয়ার হাসি। সুমনার চোখে খুশির ছোঁয়া। ওরা আজ সারাদিন আনন্দ করবে। আরও বেশি করে নিজেদের হবে।

লোপা উপভোগ করছে ওদের ভালোবাসার উষ্ণতাটা।

ওর গোটা মন জুড়ে বৃষ্টি নেমেছে। জলের ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে লোপার কষ্টগুলো। কে যেন বলেছিল, প্রেম শুধু হাসায় না কাঁদায়ও। কাঁদছে লোপা, সে কান্না পথ চলতি লোক দেখতে পাচ্ছে না, তবুও কাঁদছে ও।

আজ ১০ই বৈশাখ বিনোদিনী গার্লস স্কুলের এক ছাত্রীর বিয়ের দিন, আরেক ছাত্রীর নিজেকে আবার খুঁজে পাওয়ার দিন। তারিখটা লোপা বাংলাতেই মনে রাখতে চায়।



পড়ন্ত বেলায়

'মিনতিমাসি তুমি বাবাকে নিয়ম করে ওষুধগুলো দাও তো? বাবার এই ভুলভাল বকার রোগটা দেখছি কিছুতেই সারছে না। মা মারা যাওয়ার পরে সাময়িক ট্রমা মনে করেছিলাম। দেখতে দেখতে প্রায় একবছর হয়ে গেল, এখনও বাবা সবসময় চন্দনা বলেই ডাকছে কেন তোমায়? তুমি কিছু মনে করো না মিনতিমাসি, আসলে মায়ের মৃত্যুটা বাবা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। মা অসুস্থ ছিল ঠিকই, কিন্তু এভাবে চলে যাবে বোধহয় ভাবতে পারেনি। ডক্টরও বলেছিলেন, কেমো কমপ্লিট হলেই মা সুস্থ হয়ে যাবে। আমরাও সেটাই বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু মা যে লাস্ট কেমো নিতে গিয়ে হার্ট ফেল করবে কে জানত বলো তো? মা'র ওইভাবে মারা যাওয়াটা কিছুতেই নিতে পারছে না বাবা। তাই তোমাকে সবসময় চন্দনা বলে ডেকে চলেছে। তুমি রাগ করো না মিনতিমাসি।'

বছর পঞ্চাশের মিনতি শাড়ির আঁচলটা কোমরে গুঁজে বলল, 'ও তুমি কিছু মনে করো না টুয়াদিদি। আমি সামলে নেব দাদাবাবুকে।'

টুয়া নিজের ল্যাপটপ খুলে বসল। নামেই উইকেন্ড। অফিসের ফোন কলের কোনো শেষ নেই এই দিনগুলোতেও। সত্যি বলতে কী এই মুহূর্তে চেন্নাই থেকে ট্রান্সফার নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই বাবাকে রেগুলার দেখাশোনা করাও সম্ভব নয়। বাবাকে নিয়ে চেন্নাই শিফট করবে ভেবেছিল, কিন্তু যা কাজের চাপ তাতে ওখানে নিয়ে গিয়ে বাবার যত্ন করার সময় পাবে না। তার থেকে বরং এখানে কাছেই পিসিমনিরা থাকে, তারাও মাঝে মাঝেই আসতে পারবে। তাছাড়া মিনতিমাসি তো এবাড়িতেই থাকে সর্বক্ষণ, তাই বাবার অসুবিধা হবে না। তাছাড়া অপরিচিত পরিবেশে গিয়ে বাবা যদি আরও বিরক্ত হয়, তখন তো মুশকিল হবে। ও অফিস সামলাবে না বাবাকে! ডক্টর বারবার বলেছিলেন, ‘কোনো কিছু নিয়ে ওঁনাকে জোর করবেন না। হিতে বিপরীত হতে পারে।’

তাই মাসে দু’দিনের জন্য ট্রাভেল করে টুয়া। বাবাকে নিয়ে চেকআপে যায়, সব ওষুধপত্র মিনতিমাসিকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে যায়। মা মারা যাওয়ার পরে পিসিমনি মিনতিমাসিকে এনে দিয়েছে ওদের বাড়িতে। পিসিমনির জায়ের বাড়িতে কাজ করত দীর্ঘদিন। জা মেয়ের বাড়ি পার্মানেন্টলি থাকবে বলেই মিনতিমাসি কাজের সন্ধান করছিল। তখনই পিসিমনির মনে হয়েছে, দাদার যা মানসিক অবস্থা সেখানে সবসময় একটা লোকের দরকার। টুয়ার দ্বারা যে সেটা সম্ভব নয় বুঝেই পিসিমনি একাজ করেছে। পিসিমনি বলেছিল, ‘এত বিশ্বাসী মানুষ তুই আর দ্বিতীয় পাবি না। নিজের বাড়ি মনে করে আগলে রাখবে।’ সত্যিই তাই। গত একবছরে ওদের বাড়ির ভোল পাল্টে দিয়েছে। মা দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে বাড়িঘর যথেষ্ট নোংরা হয়েছিল। টুয়ার মা ছিল ভীষণ গোছানো মহিলা, বাবা আবার ততটাই এলোমেলো। মা দিনরাত বাবাকে বকাবকি করত আর

ঘরদোর গুছিয়ে যেত। টুয়ার বন্ধুরা এসে বলত, 'তোদের বাড়িটা ইন্দ্রপুরী সিনেমার সেটের মতো গোছানো।'

সেই বাড়িই এলোমেলো হয়ে গেল একটা ঝড়ে। মায়ের ক্যানসার ধরা পড়ল। অসুস্থ হয়ে পড়ল মা। নিজের রোগের কষ্ট সামলে বাড়িঘর গোছানোর সুযোগ পেত না। এদিকে ওদের পরিচারিকা রীতাদি ওইসময় যত ইচ্ছে ফাঁকি দিতে শুরু করল। মায়ের পছন্দের শো-পিসগুলোতে ধুলো জমল। মা বেঁচে থাকার দিন গুনতে লাগল। সাজানো ঘর-সংসারের প্রতি মোহ কমতে শুরু করল। ধীরে ধীরে মা বড্ড বেশি উদাসীন হয়ে গেল। হয়তো উপলব্ধি করেছিল, আর ক'দিন এসব আগলে রাখতে পারবে? বরং মায়া ত্যাগ করাই শ্রেয়। টুয়াদের পাশের বাড়ির নীলিমাকাকিমা ছিল মায়ের প্রাণের বন্ধু। অঞ্জনকাকু আর বাবার একসঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। দুজনে নাকি একই সঙ্গে বউ নিয়ে পাড়ায় ঢুকেছিল। কালীমন্দিরে প্রণাম করতে ঢুকেই মা প্রথম দেখেছিল নীলিমাকাকিমাকে। সেই শুরু বন্ধুত্বের। তারপর কত ঝড়ঝাপটা গেছে জীবনে, কোনোদিন ওদের বন্ধুত্বে টোল পড়েনি। টুয়া আর মিষ্টি একসঙ্গে বড় হয়েছে। মা বা নীলিমাকাকিমা আমাদের দুজনকেই নিজের সন্তানের মতো যত্নে বড় করছে।

মায়ের শরীর খারাপের সময় নীলিমাকাকিমা রোজ সন্ধেবেলা এসে বসে থাকত বন্ধুর কাছে। আর বলত, 'এ কী চন্দনা, তুমি তোমার সাধের ঘরদোর অবধি পরিষ্কার করাচ্ছ না? আর ওই ফাঁকিবাজ রীতাটাও হয়েছে তেমনই।'

মা হেসে বলেছিল, 'আর ক'দিনই বা আছি এবাড়িতে। অনেক তো পরিষ্কার করলাম। এবারে নতুন বাড়িতে গিয়ে আবার ঝাঁটা-ন্যাতা নেব।'

নীলিমা বিরক্ত হয়ে বলত, 'ওহ, তুমি বুঝি ডাক্তারিটাও পড়েছিলে? একেবারে জেনে গেলে তুমি বাঁচবে না? এদিকে মিষ্টির বাবা, কাকু দুজনেই বলল তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে।'

মিষ্টি টুয়ার বাবা দিবাকরকে কাকু বলে ডাকত। দিবাকর নাকি অঞ্জনের থেকে মাস পাঁচেকের ছোট ছিল বয়েসে। তাই এই কাকু-জেঠুর গল্প। টুয়া দেখেছিল, মা একটু একটু করে সবকিছুর থেকেই নিজের মনকে গুটিয়ে নিচ্ছে। মা চলে যাওয়ার পরে বাবা একেবারে গভীর জলে পড়েছিল। সেই অবস্থায় মিনতিমাসিই ওদের উদ্ধারকর্ত্রী হিসাবে এসেছিল এবাড়িতে। নীলিমাকাকিমা ক'দিন এসে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সব। তারপর আর কাউকে তাকাতে হয়নি। একা হাতে সব সামলে নিয়েছে মাসি। ঘর-দোর আগের মতো ঝকঝকে করে ফেলেছে। বাবার ঘরের বিছানার চাদর অবধি টানটান করে রাখে মাসি। মা মারা যাওয়ার মাত্র তিনমাসের মধ্যেই টুয়াকে একটা প্রোজেক্টের কাজে কোম্পানি চেন্নাই পাঠিয়ে দেয়। টুয়া আটকানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু টুয়ার বস শুভাশিস তরফদার বলেছিলেন, 'আমাদের জীবনে প্রবলেম কোনোদিন শেষ হয় না চন্দ্রানী। আমরা একটা সমস্যার সমাধান করে মনে করি, আপাতত নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু ওই ভাবনার পথ ধরেই আরেকটা সমস্যা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন আমরা আবার নতুন উদ্যমে সেটাকে সলভ করতে লেগে পড়ি। এটাই লাইফ। সমস্যাবিহীন কোনো জীবন হয় না। ঢেউ বিহীন যেমন সমুদ্র হয় না তেমনই। তাই তুমি যদি মনে করে থাকো, চেন্নাই না গিয়ে তুমি বাড়ির সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলবে, তাহলে ভুল করছ। সমস্যা মেটে না। তাই কোম্পানির জন্য আর নিজের কেরিয়ারের জন্য বছরখানেক চেন্নাই থেকে ঘুরে এসো।'

টুয়া বোঝাতে পারেনি, মা মারা যাওয়ার পরে বাবা অদ্ভুত একটা ভাবনার জগতে চলে গেছে। সেখানে শুধুই চন্দনার অবাধ প্রবেশ। আর কারোর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই এই ক্রাইসিস টাইমে টুয়াকে বাবার দরকার ছিল। কিন্তু চাকরিটা ছেড়ে দিলে মুশকিল। প্রাইভেট কোম্পানি, তাই

দিনরাত এক করে খাটতে হয়। বাবার পেনশনের টাকার ওপরে নিজের ভবিষ্যৎকে ছেড়ে দিতে পারেনি টুয়া। অনেকে হয়তো আড়ালে টুয়াকে স্বার্থপর বলে, অনেকে ভাবে বাবার খেয়াল রাখল না। কিন্তু টুয়া নিরুপায়।

দীঘলের মেসেজ ঢুকল। 'কবে ব্যাক করছ? আচমকা কলকাতায় চলে গেলে, এনি প্রবলেম? আঙ্কেলের শরীর ঠিক আছে?'

টুয়া মেসেজগুলোর দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। দীঘল চেন্নাইয়ে ওর প্রজেক্টেই কাজ করছে। ব্রাইট ছেলে। বাঙালি। শুধু বাঙালি নয়, বাংলার প্রতি বেশ ইন্টারেস্ট আছে। টুকিটাকি নাকি লেখালিখির শখও আছে। আইটি'তে লেবার দিয়ে যে ছেলে কবিতা লেখে তাকে টুয়া একটু সম্মানের চোখেই দেখে। কারণ ও একটা ওয়েব সিরিজ শেষ করতে মিনিমাম কুড়িদিন লাগায়। এতটাই ক্লান্ত থাকে যে, চালানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে।

টুয়া একদিন দীঘলকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এনার্জি ট্যাবলেট খাও নাকি? এত হাসিখুশি থাকো কী করে?'

দীঘল মুচকি হেসে বলেছিল, 'কাজটাকেই ভালোবাসি আমি। আর জীবনটাকে বড্ড বেশি ভালোবাসি। তাই সময়গুলো কৃপণের মতো খরচ করি। সময় খুব মূল্যবান আমার কাছে।'

দীঘল ইদানীং একটু বেশিই খোঁজ নিচ্ছে টুয়ার। শুধু একই প্রজেক্টে একই টিমে কাজ করছে বলে নয়। তার থেকেও একটু যেন বেশিই খোঁজ নিচ্ছে।

মন্দ লাগে না অবশ্য। মনে হয়, কেউ তো একজন আছে যে ওর অনুপস্থিতিতে ওকে সামান্য হলেও মিস করছে।

দীঘল জানে, টুয়ার বাবার একটা শারীরিক সমস্যা আছে। সমস্যাটা ঠিক কী সেটা নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করেনি টুয়া অফিসের কারোর সঙ্গেই। ছোট থেকেই ওর সব থেকে অপছন্দের জিনিস হল সিমপ্যাথি। এই একটা জিনিস ও কারোর কাছ থেকে নিতে পছন্দ করে না। আর অদ্ভুত বিষয় হল,

এটাই সবাই ঢালাও দিতে পছন্দ করে। তাই ওর মা মারা গেছে, বাবার মেন্টাল ট্রমা চলছে—এসব কথা খুব কাছের মানুষ ছাড়া কাউকেই তেমন বলেনি।

দীঘল একদিন কফি খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি একটাই সন্তান? বাবা কী করেন?'

তখন টুয়া জানিয়েছিল, ওর মা রিসেন্ট মারা গেছে। আর বাবারও একটু শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই ও প্রতি মাসে কলকাতা ট্রাভেল করে।

দীঘল বলেছিল, 'আমার মা-ও অসুস্থ। ডায়াবেটিক পেশেন্ট। তবুও কলকাতা যাওয়া হয়ে ওঠে না। বাবা একাই সামলায় সব। আর দিদি আসে মাঝে মাঝে। দিদির কলকাতাতেই বিয়ে হয়েছে।'

টুয়া আর বেশি ঘনিষ্ঠ হতে চায়নি। তাই পারিবারিক কথার মাঝপথেই ওকে থামিয়ে দিয়ে অফিসের আলোচনায় ফিরে এসেছিল। তবুও দীঘল মাঝেমাঝেই জিজ্ঞাসা করে, 'আঙ্কেল এখন কেমন আছেন?'

টুয়া প্রতিবারই 'একটু বেটার' বলে এড়িয়ে গেছে। আরও দশটা ডক্টরের অ্যাড্রেস, আমার অমুকেরও সেম হয়েছিল— এসব বাক্যবাণে জর্জরিত হওয়ার থেকে, এড়িয়ে যাওয়া ঢের ভালো। মা বলত, টুয়া যে কী করে ছোট থেকে এত ম্যাচিওর হল কে জানে! টুয়া নাকি ছোট থেকে বড্ড বেশি বুঝদার। কখনও সেভাবে বায়না অবধি করেনি কোনো জিনিসের জন্য। বাবা, মা-ই একমাত্র সন্তানকে সবটুকু দিয়ে মানুষ করেছে। কিন্তু টুয়া চিরকালই একটু গম্ভীর, ভাবে বেশি বলে কম। বাবা বলত, 'আমার গিন্নি মেয়ে।' মা বলত, 'ধুর, ছেলেমেয়ে দুষ্টুমি করবে তবেই না।'

টুয়া যেন বলার আগেই সব বুঝে যেত। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতা বেড়েছে বৈ কমেনি। তাই টুয়া জানে, বাবার অসুস্থতার কথা শুনলেই সবাই আচমকা ডক্টর হয়ে যাবে। ও নিজে জানে, বাবাকে ও বেস্ট

নিউরোলজিস্ট, বেস্ট সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাচ্ছে। তাই অযথা কারোর পরামর্শের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া লোকজনের কথায় ও বিশেষ পাত্তা দেয় না। মায়ের অসুস্থতার সময় দেখেছে, আত্মীয় থেকে পরিচিত সকলেই নিজের নিজের মতো জ্ঞান দিয়ে গেছে বাবাকে। শেষ দিকে বাবার মনে হতে শুরু করেছিল, অমুক জায়গায় নিয়ে গেলেই ভালো হত। অমুকের কথা শুনলেই মা হয়তো বেঁচে যেত। তাই বাবার ব্যাপারে ডক্টরদের ওপরেই বিশ্বাস রেখেছে টুয়া।

দীঘল আবার মেসেজ করল, 'এনি প্রবলেম? একা সামলাতে অসুবিধা হলে নির্দ্বিধায় ডেকো।'

টুয়া লিখল, 'নো প্ৰবলেম। এভরিথিং ইস্ ফাইন।'

দীঘল লিখল, 'ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে? কলকাতার বৃষ্টি ভীষণ রোম্যান্টিক তাই না? শহর জুড়ে ভিজে চুপচুপে।'

টুয়া দুটো স্মাইলি পাঠিয়ে লিখল, 'আজও কি কবিতা লিখছ? হঠাৎ বৃষ্টির খোঁজ কেন?'

দীঘল লিখল, 'লিখেছি দু'লাইন। পাঠক নেই আমার।'

কী মনে হতে টুয়া বলল, 'আমি অজ্ঞ পাঠক হতে পারি। যদিও কবিতার তেমন কিছুই বুঝি না।'

'এক পশলা বৃষ্টি এলেই ছুটে গিয়ে তোমায় আমি ছুঁয়ে দেব।
এক পশলা বৃষ্টি এলেই তোমার ভেজা চুলের গন্ধ নেব।
ভিজে ঠোঁটের সবটুকু জল চুঁইয়ে তবে বৃষ্টি নামুক।
আমার দু'চোখে বৃষ্টি নেমেছে তোমার চোখও ভিজে উঠুক।
মেঘলা মনের আঙিনাতে রিম ঝিম ঝিম বৃষ্টি নামুক।'

কবিতা পাঠিয়ে দীঘল বলল, 'এরপরের লাইনটা কী লিখব বুঝতে পারছি না।'

টুয়া লিখল,

'এক পশলা বৃষ্টি এলেই তোমার সঙ্গে ভিজব আমি,
সব দ্বিধা ঘুচিয়ে দিয়ে বর্ষার মতো কাঁদব আমি।'

দীঘল লিখল, 'সত্যি ভিজবে?'

ইস্, সত্যি কলকাতা বড্ড রোম্যান্টিক। না হলে টুয়ার মতো মেয়েও দু'লাইন কবিতা লিখে ফেলল!

টুয়া লিখল, 'জানি না। বাই। পরশু অফিস যাচ্ছি।'

দীঘল কিছু একটা টাইপ করছিল, সেটা আর পাঠাল না।

টুয়া ল্যাপটপে তাকিয়ে কাজে মন দিল। খেয়াল করেনি কখন মিনতিমাসি এসেছে। টেবিলে কফির কাপটা রেখে বলল, 'রাতের খাবার কখন খাবে? এত কাজের চাপ তোমার, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করো তো? শরীর টিকিয়ে রাখতে হবে তো?'

টুয়া চোখ তুলে তাকাল মিনতিমাসির দিকে। ছোটখাটো মজবুত গড়ন। গায়ের রং বেশ কালো, সামনের দাঁতগুলো অনেকটা উঁচু। কপালটাও চওড়া। সত্যি বলতে কী, এক কথায় মিনতিমাসিকে দেখতে একেবারেই ভালো নয়।

টুয়া কফিতে চুমুক দিতেই মনটা ভরে গেল। মা মারা যাওয়ার পরে এই প্রথম এত ভালো কফি খেল ও। বহুদিন মনের মতো কফি পায় না। এমনিতেই ও চা আর কফির ব্যাপারে একটু খুঁতখুঁতে। মায়ের হাতের কফিটা ছিল বেস্ট। মিনতিমাসির বানানো কফিটাও চমৎকার।

টুয়া বলল, 'আগের বার যে কফিটা খাইয়েছিলে এটা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে, বুঝলে? আচ্ছা মাসি, তুমি বিয়ে করোনি কেন?'

মাসির চোখে একটু অবসাদের ছায়া ঘনিয়ে এল যেন মুহূর্তের জন্য। তারপরেই স্বাভাবিক গলায় বলল, 'করিনি নয় গো, হয়নি। বাবা অনেক চেষ্টা করেছিল। মা মরা মেয়ে, ছোট থেকেই সংসারের সব দায়িত্ব পালন

করেছি। একা হাতে দুই বোন, একভাইকে মানুষ করেছি। দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিয়ে দিয়েছি।’

টুয়া বলল, ‘তাহলে তুমি কেন বিয়ে করলে না?’

মাসি হেসে বলল, ‘পাত্রপক্ষ এল আর গেল। মাঝখান থেকে নারান ময়রার মিষ্টির দোকানের লাভ হল কিছু। মিষ্টি-সিঙ্গাড়া খেয়ে দেয়ে মুখ ধুতে ধুতে সবাই বলত, ‘মাধববাবু, মেয়েটা আপনার খুবই লক্ষ্মীমন্ত। কিন্তু গায়ের রংটা বড্ড চাপা, আর দাঁতটাও উঁচু। ভাগ্না আমার সুপুরুষ, তাই এমন মেয়েকে সে বিয়ে করতে রাজি হবে না।’ কারোর ভাগ্না, কারোর ভাইপো, কারোর ছেলে, তো কারোর বোনপোর আমায় পছন্দ হল না। তাই বিয়েটাও হল না। আমিও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বহুবার দেখেছি, এত খারাপ দেখতে মানুষকে কেউ বউ করে নিয়ে যায়! তারপর বোনেদের বিয়ের বয়স হল। তারা আমার মায়ের মতো রূপ পেয়েছিল। তাই বিয়ে হয়ে গেল ভালো বাড়িতে। ভাইয়েরও বউ আনলাম। বাবা আমার বিয়ে দিতে পারল না বলে মনে দুঃখ নিয়েই চোখ বুজল। তারপর শুরু হল আসল সমস্যা।

ভাই আর ভাইয়ের বৌ দুজনেরই আমায় নিয়ে সমস্যা তৈরি হল। পরের বাড়ির মেয়ের দোষ কেন দেব দিদিমনি? আমার ভাইও চাইছিল না আরেকটা পেট চালাতে। প্রায়ই বলত, ‘তুই শুধু ঘরের কাজ না করে বাইরে কাজে যা। বাইরে কাজ করলে তবুও তো দুটো পয়সা আয় হয়। এখন তো সংসারে খরচ বেড়েছে। এরপরে আমার ছেলে-মেয়ে হবে, খরচ বাড়বে। একা আর কত টানব?’

আমি বুঝলাম, আমার জন্য খরচ করতেই গায়ে লাগছে ভাইয়ের। তাই পাড়ার দুটো বাড়িতে রান্নার কাজ নিলাম। সে রোজগারের টাকাও ভাইয়ের হাতে তুলে দিলাম। তাতেও দেখলাম মন ভরল না ওদের। ভাই প্রায়ই বলছিল, ‘এই টাকায় কী হয় বল?’ বাধ্য হয়ে দত্তগিন্নিকে ধরলাম। ওখানেই

আমায় থাকতে দিতে হবে। আমি রান্না ছাড়াও সব কাজ করব। দত্তগিন্নি না করল না। যে দু'খানা কাপড় ছিল নিয়ে চলে এলাম। ভাইয়ের সংসারের খরচ কমল। আমারও খাবার হজম হতে লাগল। ওরা আমায় বাড়ির লোক করে রেখেছিল। কিন্তু কর্তাবাবু আর মা দুজনে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ছেলে-মেয়ে বাইরে নিয়ে চলে গেল। আমার আবার আশ্রয় গেল। তখনই তোমার পিসি বলল, তোমাদের বাড়িতে থাকতে পারব। এই তো এইটুকুই আমার জীবন। এমন বিশ্রী দেখতে যে আয়নাও লজ্জা পায় দিদিমনি। আমায় আর কে বিয়ে করবে, বলো দেখি?'

টুয়া অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, 'যারা শুধু বাইরের রূপটুকু দেখে মানুষ বিচার করে তাদের ভাবনা ভেবে লাভ নেই। তোমার যে এত গুণ, তা কি সকলের আছে? যারা তোমায় বিয়ে না করে ফিরে গেল, তারা ভীষণ ঠকল। বুঝলে?'

মিনতিমাসি উদাস গলায় বলল, 'হয়তো তারাই জিতল। যাক গে, এখন বলো রাতে কী খাবে? চিকেন আছে, বানাব?'

টুয়া হেসে বলল, 'যা ইচ্ছে। আমি সর্বভুক। বাবা কী করছে? বই পড়ছে?'

মাসি ঘাড় নেড়ে বলল, 'এখন পড়ছে। পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ে। ডেকে খাওয়াতে বসাতে হয় রোজ।'

টুয়া বলল, 'হুঁ। ডক্টর বলেছিলেন, নার্ভের ওষুধ আছে তো, ঘুমাবে একটু বেশি।' মাসি আর না দাঁড়িয়ে চলে গেল।

টুয়া ভাবনার জগতে ডুবে গেল। সামনে ল্যাপটপ খোলা। তবুও ও ছুটে গেল সেই স্কুলবেলার বাবার কাছে। সেই সাড়ে ন'টা বাজলেই ওর আর বাবার হুড়োহুড়ি। কে আগে স্নান সেরে খাবার টেবিলে বসতে পারে তার কম্পিটিশন। দুজনে দুটো বাথরুমে ঢুকে পড়ত ওরা। বেশিরভাগ দিন টুয়া

ফার্স্ট হত। বাবার মুখে হেরে যাওয়ার কষ্ট, আর টুয়ার জিতে যাওয়ার আনন্দ। আচ্ছা বাবা কি ইচ্ছে করেই টুয়াকে জিতিয়ে দিতে চাইত? যাতে টুয়া দেরি না করে স্কুলবাসে ওঠে, তাই? নাকি সত্যিই হেরে যেত! ইস্, এই কথাটা তো কোনোদিন ভাবেনি টুয়া!

আজ মনে হচ্ছে, বাবা বোধহয় চাইত টুয়া জিতে যাক।

ওই জন্যই খাবার টেবিলে মা টুয়ার পাতে বড় মাছের পিসটা দিয়ে মুচকি হেসে বলত, 'আজকেও তো তোমার মেয়ে বড় মাছের পিসটা পেয়ে গেল। তুমি তো আজও হেরে গেলে।'

খুব মনে করার চেষ্টা করল টুয়া, বাবার গোঁফের ফাঁকেও কি হাসি থাকত তখন? তবে টুয়ার পাতে বড় মাছের পিস পড়ায় বাবার মুখে তৃপ্তির হাসিটুকু মনে পড়ে গেল ওর। ওর বাবার গোটা জগৎ জুড়ে ছিল মা আর টুয়া। অফিস আর বাড়ির বাইরে লোকটা আজীবন কোনো আড্ডায় গেল না। অবসর কাটাত খবরের কাগজ আর বই পড়ে। অথবা টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখে। মায়ের হাতের চা খেতে খেতে খেলা দেখার নাকি মজাই আলাদা, এই কথাটা বারবার বলত বাবা। কথায় কথায় বিভিন্ন ব্যাপারে মায়ের প্রশংসা করাটা যেন বাবার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

বাবা অবশ্য কারোরই নিন্দে করত না। টুয়া একটা বাঁকাচোরা আঁকা নিয়ে এসে সামনে ধরলেও বাবা উৎসাহিত হয়ে বলত, 'ওহ, দারুণ এঁকেছিস তো।'

মা এসে বকুনির সুরে বলত, 'সবেতে প্রশংসা করো না তো। মেয়েটার ভুলগুলো ওকে দেখিয়ে দাও। যাতে ও বুঝতে পারে।'

বাবা হেসে বলত, 'আরেকটু বড় হোক, ঠিক বুঝবে। এই তো বেশ এঁকেছে।'

বাবার চোখে কারোর কোনো কিছুই খারাপ নয়। সবাই ভালো, সব ভালো। মায়ের রান্না নুন কম তরকারি অম্লানবদনে খেয়ে প্রশংসা করতে করতে আঙুল চাটত বাবা। মা নিজে মুখে দিয়ে রেগে গিয়ে বলত, 'এই মানুষটা কি কোনোদিন ভুল ধরে দিতে শিখল না!'

টুয়ার সবটা জুড়ে ছিল বাবা। স্কুলে বন্ধুরা কী করেছে, টিচাররা কী বলেছে, কলেজে কোন প্রফেসরের ওপরে ক্রাশ খেয়েছে, রাস্তায় কোন ছেলে ওকে প্রোপোজ করেছে, সব প্রাণখুলে গল্প করার জায়গা ছিল বাবা। সেই বাবাই যখন এমন চুপ করে গেল, তখন ভিতরে ভিতরে টুয়ার যে কতটা ক্ষরণ হয় সেটা কাকে বোঝাবে ও!

টুয়ার চাকরি পাওয়া, বাবার উল্লাস, টুয়ার প্রথম প্রেমে পড়া বাবার ছেলেটা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া আড়ালে, এমন কত কত কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বাবা। টুয়ার গোটাটা জুড়ে ছিল বাবা। ব্রেকআপের পরে বাঁধভাঙা কান্না বাবার বুকে মাথা রেখে কেঁদেছিল। বাবা শুধু শান্ত গলায় বলেছিল, 'টুয়া জীবনটা এরকমই। আমি খবর নিয়েছিলাম, ছেলেটা খুব একটা ভালো না। কিন্তু তবুও তোকে কিছু বলিনি। সবে কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়িস তুই। গোটা জীবনটা পড়ে আছে তোর। ভালো-খারাপ, ম্যাচ-মিসম্যাচ এগুলো তোকেই বুঝতে হবে। হোঁচট খাবি, আবার উঠে দাঁড়াবি, এভাবেই চলতে শিখে যাবি। শুধু হাঁটতে শেখা মানেই চলতে শেখা নয়। সমস্ত আঘাতকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ানোর নাম জীবন। এই যে রাতুলের সঙ্গে তোর মতের মিল হচ্ছিল না। রাতুল তোকে যাচ্ছেতাই কথা বলে অপমান করল, তাতে তোর মনে হল এই মানুষটাকে এতদিন আমি ভালোবাসলাম? কেন বাসলাম? কিন্তু টুয়া, ভালো না বাসলে তুই বুঝতিস কী করে রাতুল এমন ছেলে! দূর থেকে বা একদিনের পরিচয়ে তো কাউকে বোঝা সম্ভব নয়। মিশলে তারপর তো ভুল-ঠিক বুঝবি।'

টুয়া বলেছিল, ‘কিন্তু রাতুলকে ছেড়ে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছে তো বাবা।’

বাবা শান্ত স্বরে বলেছিল, ‘হবে তো। ওই কষ্টটাই তোর শক্তি হবে। একটু সময় দিতে হবে সময়কে। সে-ই সব ভুলিয়ে দেবে। চিন্তা করিস না। মানুষের মন সবেতে অভ্যস্ত হতে পারে। তুইও একটু কষ্ট পাবি, মন খারাপ করবে, রক্তক্ষরণ হবে মনে, তারপর দেখবি সময় ঠিক ধীরে ধীরে প্রলেপ লাগিয়ে দিল ক্ষততে। চিন্তা করিস না। এটাই জীবন। দুঃখ না পেলে সুখ কোনটা চিনতেই তো পারবি না।’

বাবার বলা কথাগুলো কাঁদতে কাঁদতে মন দিয়ে শুনেছিল টুয়া। সেদিন যে খুব বিশ্বাস হয়েছিল এমন নয়। বরং মনে হয়েছিল রাতুলকে ছাড়া চলবে কী করে। ওর দিনরাতের ভাবনায় তো রাতুল জুড়ে ছিল। কিন্তু ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে বুঝেছিল, বাবাই ঠিক। সময় ধীরে ধীরে ভুলিয়ে দিয়েছে অনেক কিছু।

আজ খুব ইচ্ছে করছে বাবাকে গিয়ে বলতে, ‘বাবা দীঘল হয়তো খুব তাড়াতাড়ি প্রোপোজ করবে আমায়। আমার ঠিক কী করা উচিত? যদি আবার রাতুলের মতো হয়, তাহলে?’

কিন্তু বাবা তো এখন বড্ড চুপচাপ। কালবৈশাখী হওয়ার আগের মুহূর্তের আকাশের মতো থমথমে। তাকে বলা, না-বলা দুই-ই সমান। মায়ের সঙ্গে কোনোদিনই এসব গল্প করত না টুয়া। মা টুয়ার পড়াশোনা থেকে খাওয়াদাওয়া সব খেয়াল রাখলেও মনের খবর তেমন রাখত না। বরং বকাঝকা করত বেশি। কিন্তু বাবা ছিল ওর সবকিছুর সঙ্গী। বড্ড অসহায় লাগে আজকাল। টুয়া কোনো বন্ধুর কাছেই নিজেকে উজাড় করে বলতে পারে না, এটা হয়তো ওর নিজেরই দোষ। সবকিছু নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে রেখে এটাই এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বুকের ভিতরটা শূন্যতা

গ্রাস করেছে। দীর্ঘশ্বাসগুলো ভারী আর দীর্ঘমেয়াদি হয়েছে। টুয়া অবশ্য এর নাম দিয়েছে পরিণত।

কাজে মন নেই ওর। গুটিগুটি পায়ে বাবার ঘরের সামনে দাঁড়াল টুয়া। মিনতিমাসি বাবাকে খেতে দিয়ে সামনে বসে আছে। বাবা এক মনে খাচ্ছে।

মাসি জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগল চিকেন?'

বাবা একগাল হেসে বলল, 'খুব ভালো হয়েছে। চন্দনার রান্না খারাপ হবে কেন? খুব ভালো হয়েছে।'

মাসি আরেক পিস চিকেন পাতে দিয়ে বলল, 'যাক, আপনার পছন্দ হয়েছে।'

বাবা ঘাড় নেড়ে জানাল, ভালো হয়েছে। বাবার একটা স্বভাব আগের মতোই রয়ে গেছে—সবকিছুর প্রশংসা করা। এই স্বভাবটার জন্য মায়ের সঙ্গে খুব ঝগড়া হত বাবার। মা বলত, 'যে যা দেবে সব ভালো তোমার কাছে? যে মানুষ আসল ভালো-মন্দর বিচার বোঝে না, তার প্রশংসায় অন্য কেউ গলে গেলেও আমি যাই না। কারণ আমি জানি যে, প্রশংসা অন্তরের নয়, মৌখিক। এই যে গতকাল রুমকির জন্মদিনে খেতে গিয়েছিলাম। যতজন নিমন্ত্রিত ছিল সবাই বলছিল, মাংসটা অতিরিক্ত ঝাল দিয়ে ফেলেছে রাঁধুনি। একমাত্র উনি বললেন, খুব ভালো রান্না হয়েছে। বেশ ঝাল ঝাল। মুখ ছেড়ে গেল।

বিশ্বাস করো, তোমার এই সবেতে ঘাড় নাড়ার স্বভাবটা একেবারে নিতে পারি না আমি।'

টুয়া দেখত, মা অত্যন্ত বিরক্ত হত বাবার প্রশংসা শুনে। মায়ের বক্তব্য ছিল ঠিককে ঠিক আর ভুলকে ভুল বলতে শেখা উচিত মানুষের। কিন্তু মা চেঁচিয়ে, ঝগড়া করেও বাবার এই স্বভাব যে বদলাতে পারেনি কোনোদিন,

সেটা টুয়া জানত। আজকেও দেখল বাবা, চিকেনের প্রশংসা করে তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছে।

টুয়া সামনে গিয়ে বলল, 'বাবা আমি কাল চলে যাব। অফিসের কাজ আছে। আবার পরের মাসে আসব।'

বাবা খুব শান্ত স্বরে বলল, 'সাবধানে যাবি। মন দিয়ে কাজ করবি।'

বাবা হয়তো বিশাল কিছু ভেবে কথাগুলো বলেনি, কিন্তু টুয়ার মনে হল বাবার বলা দুটো বাক্য যেন ওর কাছে আশীর্বাদ। বাবার গায়ে হাত বুলিয়ে টুয়া বলল, 'করব বাবা।'

মাসি বাবাকে যে খুবই যত্নে রেখেছে সেটা দেখেই বোঝা যায়। বাবার শরীর-স্বাস্থ্য আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে। শুধু মানসিক প্রবলেমটা সারেনি। ওটা রয়েই গেছে। সেই চুপ করে এক মনে বসে থাকা, সেই সব কথায় কথায় চন্দনা চন্দনা বলা— এগুলো রয়েই গেছে। ডক্টর বলেছিলেন, ওষুধ খেলে এটাও ঠিক হয়ে যাবে। এতদিন হয়ে গেল, এখনও বাবা আগের অবস্থায় ফিরে এল না।

মিনতিমাসি টুয়াকে যত্ন করে খেতে দিয়ে বলল, 'আমায় তোমরা তাড়িয়ে দেবে না তো?'

টুয়া খাওয়া থামিয়ে বলল, 'ও মা, হঠাৎ তাড়াতে যাব কেন? তুমি এত গুছিয়ে আগলে রেখেছ সব, তোমায় তাড়ালে এসব সামলাবে কে? এসব ভেবে মনখারাপ করো না। আমি কাল ফিরে যাব, ভালো করে বাবার খেয়াল রেখো। সব ওষুধ ঠিক করে খাওয়াবে মনে করে।'

মিনতিমাসি বলল, 'আর রুটি নেবে?'

টুয়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'তুমি কি আমায় একদিনে মোটা করে দেবে?'

মাসি হেসে বলল, 'এমন প্যাংলাকাঠি কি ভালো নাকি? খাও না নাকি?'

টুয়া খেতে খেতেই বলল, 'ডায়েট কন্ট্রোল করি মাসি। যত রাতই হোক জিমে ঢুঁ দিই।'

মাসির কথাগুলো ঠিক যেন মায়ের মতো। মা-ও বলত, 'রোগা হয়ে কী বিচ্ছিরি হচ্ছিস তুই টুয়া। মডেলদের মতো হয়ে যাচ্ছিস। একটু বেশি করে মাখন দিয়ে ভাত খা।'

টুয়া ফিরে গেছে। যাওয়ার আগে বাবাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ধরে আদর করেছে। মিনতিমাসি লক্ষ করেছে টুয়ার চোখে জল। একবছর হয়ে গেছে ও এবাড়িতে আছে। টুয়া খুব ভরসা করে ওর বাবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে যায় মিনতির ওপরে। যতবার বাড়ি আসে, ওর জন্য কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে আসেই। প্রতিমাসে মোটা টাকা মাইনে দেয়। মিনতির আর খরচ কী? সবটাই তো জমে। টুয়াই ব্যাঙ্কে একটা বই করে দিয়েছে। বলেছে, 'এখানে সব টাকা ফেলে দিও। তোমার ভবিষ্যতের জন্য।'

শাড়ি কিনে দেয়, মুখে মাখার ক্রিম কিনে দেয়, মাথার শ্যাম্পু, সাবান সব দামি দামি প্রোডাক্ট কিনে দেয়। অনেক টাকা মাইনে পায় টুয়া। তাছাড়া দাদাবাবুর পেনশনের টাকাও অনেক। তবে শুধু টাকা থাকলেই হয় না, মেয়েটার মনটাও বড়। এবাড়িতে ঢোকার পর মিনতির কোনোদিন নিজেকে কাজের লোক বলে মনে হয়নি। মনে হয়েছে, ও-ই যেন এবাড়ির গিন্নি। সপ্তাহে দু'দিন সুধীর আসে। ওকে লিস্ট ধরিয়ে দেয় মিনতি, ও-ই সব বাজার হাট করে দেয়। টুয়া ওকেও একটা মাইনে দিয়ে দেয়। এছাড়াও মাঝে মাঝেই এটা ওটা বাড়িতে আসে অনলাইনে। ফোনে বলে, 'মিনতিমাসি তোমার আর বাবার জন্য আজ গলদা চিংড়ি পাঠালাম। নিয়ে নিও।'

অত দূর থেকে কী করে পাঠায় প্রথমে বুঝতে পারেনি মিনতি। তারপর সুধীর বুঝিয়ে বলেছে। এত সুখ মিনতি ওর গোটা জীবনে পায়নি। কিন্তু টুয়ার চোখের জল এবারে মিনতিকে অস্থির করে তুলেছে। কিছুতেই যেন মন

বসছে না। প্রিয় সিরিয়ালগুলো চালিয়েও মন দিতে পারছে না। বারংবার মনে হচ্ছে শুধু নিজের স্বার্থের জন্য ও টুয়াদের ঠকাচ্ছে। পাপ করছে ও, খুব বড় পাপ। হয়তো ওপরে গিয়ে জবাব দিতে হবে ওকে। কিন্তু এ লোভ যে ভয়ঙ্কর লোভ। এর থেকে মিনতি বেরোবে কী করে!

দিবাকর ভরাট গলায় ডাকল, 'চন্দনা। এক কাপ চা দাও তো।'

মিনতি সোজা উঠে গিয়ে মৃত চন্দনার ঘরে দরজা বন্ধ করল। ঘরে বেশ বড় একটা চন্দনার ছবি বাঁধানো আছে। সেদিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে রোজ দাঁড়ায় মিনতি। ক্ষমা চায় রোজ। কিন্তু ও মনে মনে জানে, চন্দনা বৌদি কোনোদিন ক্ষমা করবে না ওকে। তবুও রোজ সন্ধেতে ধূপ জ্বেলে ক্ষমা চাওয়াটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে মিনতির। আলমারিটা খুলে হালকা গোলাপি শাড়িটা বের করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরে নিল মিনতি। তারপর ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে চা চাপাল। দিবাকরের পায়ের শব্দ ক্রমশ কাছে আসছে। বুকটা ধুকপুক করছে মিনতির। চায়ের জল ফুটছে সসপ্যানে। কাঁপা হাতে চা দিল মিনতি। দিবাকর এসে ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছে।

'কী ব্যাপার, পিছনে দাঁড়িয়ে আছ কেন দীঘল? কিছু বলবে?'

দীঘলের ঠোঁটে লাজুক হাসি। একটু ইতস্তত করে বলল, 'আজ একটা মুভি দেখতে যাবে? খুব ইচ্ছে করছে মুভি দেখতে। কিন্তু সঙ্গী পাচ্ছি না। ভাবলাম তোমায় বলে দেখি।'

টুয়া হেসে বলল, 'ওহ, তার মানে, আরও বেশ কয়েকজনকে অফার করেছ তুমি। তারা রাজি হয়নি। শেষে আমায় বলতে এসেছ?'

দীঘল অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'এ মা, তা কেন হবে? একসঙ্গে যাব ভাবলাম তাই বললাম।'

টুয়ার আজ জেদ চেপেছে যেন। মনে মনে চাইছিল, দীঘল আরও কিছু বলুক। বলুক, অন্য কেউ নয় তোমাকে নিয়েই যেতে চাই।

টুয়া বলল, 'সে বুঝলাম। কিন্তু তুমি অফিসে অনেককেই তো সঙ্গী খুঁজছিলে, পাওনি তাই বল। আচ্ছা দীঘল, আমাদের সৌরীও যাবে না বলল? ও তো মুভি দেখতে পেলে খেতেও ভুলে যায়। সৌরীকে বোধহয় বলতে ভুলে গেছ তুমি। দাঁড়াও তোমার সঙ্গীর ব্যবস্থা আমি এখুনি করে দিচ্ছি। আরে চাপ নিচ্ছ কেন? স্কুলে আমায় সবাই প্রবলেম সলভ করতেই ডাকত। আমি সকলের সব প্রবলেম মিটিয়ে দিতাম এক মিনিটে। এ তো সামান্য! তোমায় মুভি দেখতে যাওয়ার পার্টনার জোগাড় করে দেওয়ার মতো সহজ কাজ আর হয় না।'

দীঘল গম্ভীর গলায় বলল, 'চন্দ্রানী, আমার কোনো প্রবলেম নেই যে তোমায় সলভ করতে হবে। প্লিস সৌরী বা অফিসের অন্য কোনো মেয়েকে বলো না। আমি ওদের সঙ্গে যাব না। আমার বলার মধ্যে হয়তো ভুল ছিল বলে তোমার বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, আমি শুধুমাত্র তোমাকেই চাই মুভি পার্টনার হিসাবে। তুমি যদি না যেতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু প্লিস অন্য কাউকে বলো না।'

অন্য দিন চেন্নাইয়ের শুকনো গরমে বেশ হাঁসফাঁস করে টুয়া। আজ কেন কে জানে আচমকা বসন্তবাতাস এসে ছুঁয়ে দিয়ে গেল ওকে। মুহূর্তের মধ্যেই রাতুলের মুখটা মনে পড়ল। দীঘল আবার রাতুলের মতো নয় তো? পরক্ষণেই মনে পড়ল বাবার বলা কথাগুলো। বাবা বলেছিল, 'মানুষ ঠকে, তাই বলে কি সময় থমকে যায়? মানুষ চিনতে গেলে মিশতে হবে। ভয় পেলে, দূরে সরিয়ে দিলে তো বন্ধুই হবে না কেউ কোনোদিন।' দীঘল অপলক তাকিয়ে আছে টুয়ার দিকে। টুয়া সেটা অনুভব করছে বেশ কয়েক মাস ধরে। দীঘল যে টুয়ার ব্যাপারে বেশ কেয়ারিং সেটা ও বুঝেছে ওর আচরণে। আর এটাই হয়তো দীঘলকে ভালো লাগার একমাত্র কারণ।

দীঘল টুয়াকে মাপছে হয়তো।

টুয়া সুযোগ না দিয়েই বলল, 'ওহ, আমি একা তোমার সঙ্গী হলেই চলবে? তাহলে যেতেই পারি।'

দীঘলের ঠোঁটে এক চিলতে হাসির রেখা।

গত এক সপ্তাহে দীঘলের সঙ্গে বন্ধুত্বটা অন্য মোড় নিয়েছে। কলিগ, বন্ধুত্ব এসবের বাইরে গিয়ে আরেকটু গভীরতা বেড়েছে ওদের সম্পর্কটার। টুয়া এতদিনে ওর সবটুকু উজাড় করে বলতে পেরেছে দীঘলকে। দীঘলও বলেছে ওর বাড়ির কথা। টুয়ার বাবার অসুস্থতার কথা শুনে দীঘল বলেছে, 'নেক্সটবার আমি যাব তোমাদের বাড়ি। আঙ্কেলের সঙ্গে একটু কথা বলে আসব।'

ভালোবাসার প্রতি হারিয়ে ফেলা বিশ্বাসটাকে যেন একটু একটু করে ফিরিয়ে দিচ্ছে দীঘল। টুয়া আবার অনুভব করছে ভালোবাসা আর প্রবঞ্চনা সমার্থক শব্দ নয়।

দীঘল আজ অফিসে ঢুকেই বলল, 'চন্দ্রানী, আজ আমার জন্মদিন। তাই যা বলার আজকেই বলে দিও।'

টুয়া হেসে বলেছিল, 'আশীর্বাদ করি তুমি একশো বছর বেঁচে থাক। আর এই কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট হও। তখন আমায় একটু বেশি করে ছুটি দিও কিন্তু।'

দীঘল মুখ গোমড়া করে বলেছে, 'আমি তোমার জন্য ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ হেলায় হারাতে রাজি। এরপরে তো বলো আর কী বলার আছে তোমার!'

টুয়া লজ্জা পেয়ে বলেছে, 'শুভ জন্মদিন।'

দীঘল আরেক পা টুয়ার দিকে এগিয়ে এসে বলেছে, 'দেখো লাস্ট সুযোগ দিলাম তোমায়। এ সুযোগ হাতছাড়া করো না কিন্তু।'

টুয়া আর ভণিতা না করেই বলে দিয়েছে, 'এখন থেকে তোমার প্রতিটা জন্মদিনে তোমার পাশে থাকতে চাই।'

দীঘল হেসে বলেছে, 'এটা কোনো প্রোপোজ হল চন্দ্রানী? এভাবে কেউ প্রোপোজ করে? আচ্ছা বেশ, এখন এটাকে নিয়েই এগিয়ে চলি। আজ আমি তোমায় প্রোপোজ করব না। আমি যেদিন তোমায় বোঝাতে পারব, ভালোবাসা আসলে কী, সেদিন হাঁটু গেড়ে প্রোপোজ করব তোমায়।'

বেশ কাটছিল চেন্নাইয়ের দিনগুলো। সারাদিনের অফিস-ক্লান্ত টুয়া সবসময় অনুভব করত, কেউ একজন আছে ওর পাশে। যে কোনো সমস্যায় হাতটা বাড়ালেই হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে তুলে দেবে ওই খাদ থেকে। মিনতিমাসিকে রোজই ফোন করে বাবার খোঁজ নেয়। বাবাও কথা বলে টুকটাক। সারাদিন আকাশে উষ্ণতা বেলানোর পরে অস্ত গেলেও যেমন সূর্যের অস্তিত্ব থেকেই যায় আকাশ জুড়ে, বাবাও ঠিক তেমনিভাবে রয়ে গেছে টুয়ার জীবনে। এখন হয়তো সুচিন্তিত পরামর্শ দিতে পারে না বাবা, কিন্তু বাবার বলা কথাগুলো থেকেই যেন জীবনটাকে চালাতে শিখেছে টুয়া। এখনও বাবা যখন ফোনে আনমনে বলে, 'ভালো থাকতে হবে বুঝলি টুয়া, ভালো থাকতে হবে।' তখন মনে হয়, সত্যিই তো ভালো তো থাকতেই হবে। বাবা বলে, 'টুয়া লড়াইয়ের রাস্তাটা পাহাড়ের মতো খাড়া আর একমুখী। তুই যে শর্টকাটে পৌঁছে যাবি, তা হবে না। হয় তোকে ওই খাড়া একমুখী রাস্তা বেয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে, নয়তো ফেরত আসতে হবে।'

টুয়া জানে জীবনটা একটা লড়াই। সেখানে যদি একটা দুটো সহৃদয় বিশ্বস্ত যোদ্ধা পাওয়া যায়, তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবতে হয়। এই যেমন টুয়া এখন নিজেকে ভাগ্যবান ভাবছে। কারণ, দীঘল ওর পাশে আছে। শক্ত করে ওর হাতটা ধরে আছে। দীঘল সামনের সপ্তাহে কলকাতা যাবে, টুয়াও ওই সময়েই ফিরবে।

দীঘল বলেছে, ‘একই ফ্লাইট ধরি চলো।’

টুয়া হাসতে হাসতে বলেছে, ‘কেন, মধ্য আকাশে আমায় প্রোপোজ করবে বুঝি!’ দীঘল গম্ভীর স্বরে জানিয়েছে, ‘সেই মুহূর্ত ঠিক কখন আসবে আর কীভাবে আসবে আমি নিজেও জানি না চন্দ্রানী। তবে আমি বিশ্বাস করি, সেই মুহূর্ত আসবে।’

দীঘল আর টুয়া কলকাতা ফিরছে। এবারে টুয়া ইচ্ছে করেই বাড়িতে জানায়নি। দীঘলকে ওদের বাড়িতে সোজা নিয়ে যাবে। বাবার সামনে দাঁড় করিয়ে বলবে, ‘বলো মানুষ চিনতে কি এবারেও ভুল করলাম?’ চমকে দেবে বাবাকে। মিনতিমাসির সঙ্গে গতকাল রাতেও কথা হয়েছে, কিন্তু টুয়া জানায়নি আজ আসছে। হঠাৎ হঠাৎ কেমন যেন ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসে ওকে। লুকোচুরি খেলার নেশাটা মাথাচাড়া দিয়ে বলে, বয়েস তো একটা সংখ্যা মাত্র।

দীঘল কানের কাছে মুখটা নামিয়ে এনে বলল, ‘চন্দ্রানী এই আকাশগঙ্গাকে সাক্ষী রেখে কথা দিলাম, যতদিন আমার শ্বাস পড়বে ততদিন সেই নিঃশ্বাসে তুমি মিশে থাকবে। কলেজের মতো রোম্যান্টিক প্রেমিক মনে হচ্ছে আমায়? হোক না, ক্ষতি কী? প্রেম কবেই খুব পরিণত ছিল! প্রেম তো চিরকাল আবেগী, অপরিণত, তাই না চন্দ্রাণী? তাই তো হিসেব নিকেশ করতেই ভুলে যায় অর্ধেক সময়।’

টুয়া শুনছিল দীঘলের কথাগুলো। সেই মা অসুস্থ হওয়ার পর থেকে যেন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ আর দুশ্চিন্তা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিছুতেই এর থেকে নিস্তার পাচ্ছিল না। আজ বহুদিন পরে নাকের ওই ওষুধ ওষুধ গন্ধটা সরে গিয়ে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ পাচ্ছে। সম্ভবত দীঘলের পারফিউমের। প্রাণ ভরে গন্ধটা টেনে নিল টুয়া। দীঘলের কাঁধে মাথাটা

হেলিয়ে বলল, 'দমদম এয়ারপোর্ট আসতে আরও দেরি হোক। অনেক দেরি হোক।'

যেহেতু দু-তিনদিনের জন্য আসা, তাই লাগেজ একেবারেই বাড়ায়নি টুয়া। বাড়িতে জামার শেষ নেই। সর্বসময়ের সঙ্গী ল্যাপটপটা সঙ্গে নিয়ে চলে আসে।

মেন গেট খোলা দেখে একটু অবাক লাগল টুয়ার। দরজা তো বন্ধ থাকার কথা। দীঘল আর ও বাড়িতে ঢুকতেই সজোরে ধাক্কা লাগল মিনতিমাসির সঙ্গে। মাসির আঁচল থেকে পড়ে গেল কিছু ওষুধের স্ট্রিপ। ওষুধগুলো কি এক্সপায়ারি ডেটের? তাই মাসি ফেলে দিতে যাচ্ছে?

টুয়া একটা স্ট্রিপ তুলেই চমকে উঠল। এ তো সাইকিয়াট্রিস্টের দেওয়া ওষুধগুলো! ডেট তো রয়েছে।

মিনতিমাসির মুখ সাদা।

টুয়া বলল, 'এগুলো কেন ফেলে দিতে যাচ্ছ মাসি?'

আমতা আমতা করে মিনতিমাসি বলল, 'এগুলো খেতে চায় না, বলে তেতো।'

টুয়ার চোখে তীব্র সন্দেহের উঁকিঝুঁকি। দীঘলকে ইশারায় ভিতরে আসতে বলল টুয়া। দীঘল ওকে অনুসরণ করল। টুয়া বাবার ঘরে সোজা ঢুকে গেল। একটা বোতল এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বাবা এই ওষুধটা খেয়ে নাও তো।'

বাবা বাধ্য ছেলের মতো ওষুধটা মুখে ঢোকাতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় আচমকা মাসি এসে প্রায় জোর করে ওষুধটা কেড়ে নিয়ে বলল, 'সব ওষুধ আমি খাওয়াব। কিন্তু এটা নয়। এটা কিছুতেই নয়। এটা খেলেই সব মনে পড়ে যাবে! আমাকে আর চন্দনা বলে কাছে বসাবে না। আমার থুতনিতে হাত দিয়ে আর বলবে না, 'তুমি খুব সুন্দর। তোমার চোখ দুটো খুব সুন্দর।' কেউ কোনোদিন আমায় সুন্দর বলেনি। গোটা পাড়ার লোক মুখের ওপর

বলত, মিনতি সন্ধেবেলা পাড়ায় বেরোলে লোকে দাঁত উঁচু ভূত বলে ভয় পাবে। পাত্রপক্ষরা মিষ্টি খেয়ে বলে যেত, এই ভাতের হাঁড়িকে বউ করে নিয়ে গেলে লজ্জায় ডুবে মরবে আমার ছেলে। আমায় কেউ কোনোদিন সুন্দর বলে প্রশংসা করেনি দিদিমনি। আমি রোজ বৌদিমনির কাপড় পরে চন্দনা সাজি। ওই ব্যালকনিতে বসে আমরা কত গল্প করি। ওই ওষুধ তুমি খাইও না। সব মনে পড়ে যাবে ওর। আমাকে আর ভালোবাসবে না। আর আমার প্রশংসা করবে না কেউ।'

টুয়া স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ কী বলছে মাসি! এ কী অবাস্তব চাহিদা মাসির! বাবার চিরকালের সবকিছুতে প্রশংসা করার স্বভাব। মিনতিমাসিকেও সেভাবেই প্রশংসা করেছে। তাই বলে মাসি বাবাকে ওষুধগুলো খাওয়াবে না? বাবা মানসিকভাবে অসুস্থ থাকুক চায় মাসি! এ যে কল্পনার অতীত টুয়ার। এই জন্যই বাবার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও, মানসিক অবস্থার সেভাবে উন্নতি হয়নি। এখনও দিনরাত চন্দনা বলে ডেকে চলছে। আর মিনতিমাসি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মায়ের শাড়ি পরে বাবার সামনে বসে বিষয়টাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলছে বাবার কাছে। বাবারও কোথাও একটা বিশ্বাস রয়ে গেছে, মা বেঁচে আছে।

টুয়া ধিক্কার জানাল। দীঘল ওর মুখে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারায় চুপ করতে বলল।

টুয়া দেখল, বাবা মিনতিমাসির হাতটা ধরে টেনে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'দিনরাত এত কাজ কীসের চন্দনা? একটু বসো তো। আজকের খবরের কাগজের একটা খবর তোমায় পড়ে শোনাই।'

বাবার মুখে তৃপ্তির হাসি। মিনতিমাসির দুটো গাল ভেসে যাচ্ছে নোনতা জলে। বাবাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে চোখ দুটোতে অপরাধবোধ।

মিনতিমাসি বাবার হাতের ওপরে হাতটা রেখে বলল, ‘অসুস্থ রাখতে চাই না। শুধু হারিয়ে ফেলতে ভয় পাই। একজনের চোখে আমি সুন্দর— এই বিশ্বাস নিয়ে মরতে চাই। আমি চন্দনা হয়ে বাঁচতে চাই।’

বাবা হাত দিয়ে মাসির চোখের জলটা মুছিয়ে দিয়ে বলল, ‘আহা, কাঁদছ কেন চন্দনা? তোমার এই অভিমানী স্বভাবটা আর গেল না।’

দীঘল টুয়াকে টেনে বাইরে নিয়ে এল। হাঁটু গেড়ে ওর সামনে বসে বলল, ‘বলেছিলাম না, যেদিন সত্যি তোমাকে বোঝাতে পারব ভালোবাসা আসলে কী, সেদিন তোমায় প্রোপোজ করব। আজ আশা করি বুঝতে পারছ, মিনতিমাসি নিজের সবটুকু উজাড় করে ভালোবাসে তোমার বাবাকে। এর থেকে পবিত্র ভালোবাসা হয় না চন্দ্রানী। তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ে যেও না।’

মিনতিমাসি ব্যাঙ্কের বইটা টুয়ার সামনে ধরে বলল, ‘এই যে, এতে তুমি যা মাইনে দিতে সব আছে। একটা পয়সাও খরচ হয়নি। তুমি নিয়ে নাও। দোহাই দিদিমনি, আমাকে এবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিও না।’

দীঘল শান্ত গলায় বলল, ‘মাসি আঙ্কেলকে সুস্থ করে তুলতে হবে। আঙ্কেল আপনাকে ভালোবাসেন না, বাসেন চন্দনা আন্টিকে। কিন্তু আপনি যদি ধীরে ধীরে আঙ্কেলকে সুস্থ করে তোলেন ওষুধ খাইয়ে, তাহলে আপনার যত্নে, ভালোবাসায়, আঙ্কেল এই মিনতিকেই ভালোবাসবেন। ভালোবাসা তো শুধু ভালোবাসাকেই চেনে। ভয় নেই। সুস্থ হলেই আপনাকে ভুলে যাবেন এমন নয়।’

মিনতিমাসির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অস্ফুটে বলে উঠল, ‘মিনতিকে ভালোবাসবে? তুমি সত্যি বলছ দাদাবাবু?’

দীঘল ঘাড় নেড়ে বলল, ‘সত্যি বলছি।’

মিনতি টুয়ার হাত থেকে ওষুধের স্ট্রিপটা নিয়ে দিবাকরের মুখে দিয়ে বলল, ‘তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাও। তোমায় মিনতি নামের একটা

কুৎসিত মেয়ের গল্প বলব।'

দীঘল বলল, 'চন্দ্রানী, বলেছিলাম না ভালোবাসা পরিণত হয় না। বয়সের বা পারিপার্শ্বিকতার হিসেব নিকেশ করে না। ভালোবাসা চিরকাল অবুঝ, অপরিণত, বড্ড অভিমানী হয়। থাকুক না এই সম্পর্কটা। দুজনে যদি ভালো থাকে অসুবিধা কী?'

টুয়া জড়িয়ে ধরল দীঘলকে। কানে কানে বলল, 'ঠিক বলেছ, ভালোবাসা শুধু নিজেকেই চেনে।'

জানালায় চোখ রেখে দেখল টুয়া, বাবার মুখে হাসি। কোনো একটা খবর পড়ে শোনাচ্ছে মিনতিমাসিকে। মাসিও এক মনে শুনছে। দুজনকে এই মুহূর্তে দেখে মনে হচ্ছে এরাই বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষ।

দীঘলের ফোনটা বাজছে...দীঘল বলল, 'মা করছে। বিকেলে এসে তোমায় নিয়ে যাব আমাদের বাড়িতে।'

ফোনের রিংটোনটা বেজে চলেছে...

'বড় ইচ্ছে করছে ডাকতে, তার গন্ধে মেখে থাকতে,

কেন সন্ধে সন্ধে নামলে সে পালায়,

তাকে আটকে রাখার চেষ্টা, আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে তেষ্টা,

আমি দাঁড়িয়ে দেখছি শেষটা জানলায়।'



দক্ষিণের জানালা

‘কী রে, শুনলাম নাকি আজকাল তোকে প্রায়ই বাজারে-হাটে দেখা যাচ্ছে? তোদের বাড়ির বাজার তো তোর বড়দা করে, এই বাজারের ব্যাগটা কার রে?’

মুচকি হেসে নীলাঞ্জন বলল, ‘এটা সম্ভবত দীপশিখাবউদির তাই না?’

একটু অন্যমনস্কভাবেই বসে আছে সৃজন। ক্লাবে এই টাইমটাতে ওরা সবাই আসে, একটু আড্ডা দেয়। ক্যারাম খেলে। দুজন ছাড়া সবাই বেকার। মোটামুটি টিউশনিকেই জীবিকা মেনে নিয়ে মনোযোগ সহকারে সেটাই করছে। এদের মধ্যে সৃজনের মূল্য একটু বেশি। কারণ ওর সব স্টুডেন্ট সিবিএসসি, আইসিএসসি বোর্ডের। ও নিজেও সিবিএসসি থেকেই পাস করেছে উচ্চমাধ্যমিকটা। তারপর ইংরেজিতে অনার্স আর মাস্টার্স করেছে। ওই আর কী, বাঙালির ইংরেজি প্রীতির মতোই বাংলা মিডিয়ামের পড়ুয়াদের থেকে ইংরেজি মিডিয়ামের পড়ুয়াদের একটু অন্য চোখে দেখে বন্ধুরা। তাই শক্তিনগরে টিউশন টিচার হিসাবে সৃজনের ডিমান্ড একটু বেশি। ইনকামও ও

সকলের থেকে বেশিই করে। কিন্তু ওই বেকার শব্দটা পিছু ছাড়ে না এটাই যা দুঃখের।

কবে যে সব কাজকেই প্রফেশন হিসাবে মেনে নেবে মানুষ, কে জানে! আজ অবশ্য মনটা সেজন্য খারাপ নয় সৃজনের। কারণটা সম্পূর্ণ অন্য। অভিষিক্তাও ওকে এভাবে ভুল বুঝবে, কোনোদিন ভাবতে পারেনি সৃজন। ভাবত, এই একজন মানুষ ওকে ঠিক চেনে। যার কাছে কোনো কিছু কোনোদিন লুকনোর প্রয়োজন হয়নি। মায়ের কাছেও যেটা বলা হয়ে ওঠেনি সৃজনের, সেটাও ও বলেছে অভিষিক্তাকে। তারপরেও এভাবে আঘাত করল ও সৃজনকে! মানুষ চিনতে সত্যিই সৃজনের ভুল হয়েছে। আর ভালোবাসা শব্দের সঠিক অর্থ যে ঠিক কী—সেটা বোধহয় কোনোদিনই জানা হল না ওর।

ভালোবাসা শুধুই শরীর চেনা না, মনের খবরও রাখা, এটা যে কেন মানুষ বোঝে না কে জানে!

নীলাঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ রে, তুই ওই ধুমসি দীপশিখাবউদির জন্য অভিষিক্তার সঙ্গে ব্রেকআপ করলি? এটা মানা যায়? ওই বউদি তোর থেকে অন্তত বছর ছয়েকের বড় হবে। আর দেখতে লাগে মিনিমাম দশ বছরের বড়। ওই বউদির প্রতি তোর এত দরদ কেন রে? শোন বস, নিজেকে রবীন্দ্রনাথ ভেবে বসিস না।'

সৃজন অন্যমনস্কভাবে বলল, 'তোরা শিওর কাদম্বরীদেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল? কোনো প্রমাণ আছে? নেই। তারপরেও রবীন্দ্রনাথকে টেনে এসব বলতে একটুও বাধে না বাঙালির! বৌদি কারোর বন্ধু হতে পারে না? বউদি মানেই তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক, এটা তোদের কে বলল রে? এই অদ্ভুত ধারণাটা ঠিক কেন এসেছে আমি জানি না।'

আকাশ হেসে বলল, 'আরে বস আজকে হেভি মুডে আছে। হাতে একটা মাইক ধরিয়ে দিলে ফাটিয়ে দেবে। শিকাগোতে নিয়ে গেলে ওদেশের সবাইকে বশ করে ফেলবে।'

বন্ধুরা এমন ইয়ার্কি মারে। বিরক্তিকর হলেও সহ্য করে নেয় সৃজন। কিন্তু আজ ও নিজেই ভীষণরকমের ডিস্টার্বড আছে। তাই এসব কথা ভালো লাগছে না।

নীলাঞ্জন বলল, 'শোন, ইয়ার্কি নয়। গোটা পাড়া তোদের রিলেশন নিয়ে আড়ালে কানাকানি করছে। বলছে, সৃজনের মতো অমন একটা ব্রিলিয়ান্ট ভালো ছেলের মাথাটা মোড়ালো কী করে ওই মুটকি কালো দীপশিখা? তবুও যদি লাভলিবউদি তোর মাথাটা ঘোরাত, তাহলেও বুঝতাম। লাভলিবউদি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে তখন আমাদের মতো অনেকেরই হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বাস কর, ওই মাসি মার্কা দেখতে দীপশিখার জন্য তুই যা করছিস, আজব! বুঝলি? এখন কি বাজার করতে চললি ওর জন্য? আরে, ওর বরটা অবধি ওর দিকে তাকায় না। আমাদের পাড়ার অনুরাধার সঙ্গে সুযোগ পেলেই গল্প করে। সেখানে তুই কেন গিয়ে ওই ফাঁদে পড়লি বল তো?'

সৃজনের এই পরিবেশটাই দমবন্ধকর লাগছে। বন্ধুর সংজ্ঞাটাও ধীরে ধীরে ভালোবাসার মতোই আবছা হয়ে যাচ্ছে ওর কাছে। তবুও সেই কবেকার বন্ধু সব। সেই প্রাইমারি বেলার। পরে সবাই অন্য স্কুলে পড়েছে বটে, কিন্তু বন্ধু শব্দটা যবে থেকে চিনেছে তবে থেকে ওদের বন্ধুত্ব। তাই এভাবে সকলের কথা অগ্রাহ্য করতে পারে না সৃজন। দরকার-অদরকারে এরাই পাশে থেকেছে বরাবর।

সৃজনের বাবার অসুস্থতার সময়ে এই নীলাঞ্জন, আকাশ, বাপ্পাদিত্য, অরিজিৎরাই প্রাণ দিয়ে করেছিল। একবারও মনে হয়নি, বাবাটা ওদের নয়।

মনে হচ্ছিল বিপদটা শুধু সৃজনের নয়, ওদেরও। তাই যাই ঘটে যাক, এদের এড়িয়ে যেতে পারে না সৃজন। এমনকী অভিষিক্তাকে যখন কিছুতেই প্রোপোজ করতে পারছিল না, ব্যাগে চিঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দিনের পর দিন, তখন এই বাপ্পাদিত্যই অভিষিক্তাদের লেটারবক্সে চিঠিটা ফেলে এসেছিল। অভিষিক্তার সঙ্গেও এই চারজনের বেশ ভালোই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। তাই সৃজন না বললেও ওরা জেনে গেছে অভিষিক্তার সঙ্গে সৃজনের ব্রেকআপের আসল কারণ। মুশকিলটা হল, সৃজন ভেবেছিল এরা ওর ছোটবেলার বন্ধু, এদের কাছে অন্তত দীপশিখাবউদির সঙ্গে ওর সম্পর্কের আসল কথাটা বলতে পারবে। এখন বুঝল, গোটা পাড়া, ওর বাড়ি, অভিষিক্তা যা বুঝেছে এরাও সেভাবেই বুঝেছে ওদের সম্পর্কটাকে।

সৃজন বলল, 'আজ উঠি রে।'

আকাশ বলল, 'হ্যাঁ, তোকে তো এখন দীপশিখার বাজার বইতে হবে, তাই না? আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করিস না।'

সৃজনের মনটা এমনিতেই আজ তিক্ত হয়ে আছে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে চলে এল ক্লাব থেকে। রাস্তায় হাঁটছে সৃজন। আজ স্কুটি নিয়ে বেরোয়নি। পাড়ার মধ্যে থাকবে ভেবেই স্কুটিটা বের করেনি। সংযোগদার মেডিসিন শপে একবার যেতে হবে। কয়েকটা ওষুধ কিনতে বলেছে দীপশিখাবউদি। আসলে দীপাবউদির সঙ্গে ওর সম্পর্কটা যে ঠিক কী, সেটা বোধহয় ওকে বিশ্লেষণ করতে বললে ও নিজেও অপারগ হবে। ঠিক যেমন কালো রঙ বললেই সব কালোকে বোঝায় না, তেমনি সব সম্পর্ককেও এভাবে এক কথায় বোঝানো সম্ভব হয় না। কালোর কত রকমভেদ আছে। মেঘ ভর্তি আকাশ, অমাবস্যার ঘন রাত্রি, কুমারীর লম্বা বেণী, চোখের মণি, কাকের পালক...এমন কত উদাহরণ দিয়ে দিতে পারে সৃজন। এবং হলফ করে বলতে পারে, এই প্রতিটা কালো আলাদা। তাহলে প্রতিটা সম্পর্কের

ডেফিনেশন কী করে একই সুতোয় বাঁধা হতে পারে? দেওর-বউদি মানেই পরকীয়া—এমন দাগিয়ে দেওয়ার মানে কী? যে যাই বলুক, দীপশিখাবউদির প্রয়োজনে সৃজন যাবেই। কারণ, ওদের সম্পর্কে কোনো কালিমা নেই, কোনোদিন ছিল না। অবৈধ সম্পর্ক যদি কারোর সঙ্গে থেকে থাকে দীপাবউদির, সেটা ওর স্বামীর সঙ্গে। অনীকদার সঙ্গে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দীপাবউদির ভালোবাসার সম্পর্ক নয়। একটা ভালোবাসাহীন, আবেগহীন সম্পর্ক অবৈধ নয় তো কী? দুই বাড়ির অভিভাবকরা শুধু সামাজিক বন্ধনে যুক্ত করে দিলেই কোনো সম্পর্ক বৈধ হয়ে যায়! অদ্ভুত সব নিয়মকানুন।

সংযোগদার দোকানে গিয়ে দীপাবউদির লেখা কাগজটা ধরিয়ে দিল সৃজন। বলল, 'ওষুধগুলো দাও তাড়াতাড়ি।'

সংযোগদা কাগজে চোখ বুলিয়ে বলল, 'এই দুটো ওষুধ দেওয়া যাবে না রে প্রেসক্রিপশন ছাড়া। দুটোই কড়া ডোজের ঘুমের আর নার্ভের ওষুধ। বাকিগুলো দিচ্ছি। থাইরয়েড, হাই প্রেশার, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস...'

সংযোগদা বলল, 'হ্যাঁ রে, জেঠিমার শরীর কি খুবই খারাপ নাকি রে? এতগুলো ওষুধ কন্টিনিউ করছেন? তুই একবার রোববার বিকেলের দিকে কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জীকে দেখিয়ে নিয়ে যা না। কলকাতা থেকে সপ্তাহে একদিন আসছেন। এমডি ডক্টর, ভালো ট্রিটমেন্ট করেন।'

অন্যমনস্কভাবে সৃজন বলল, 'একজন বছর চৌত্রিশের মহিলার যদি এমন হয় তাহলে কী খুবই ক্ষতিকর সংযোগদা?'

সংযোগদা বলল, 'ক্ষতি কী রে পাগল, তাহলে রীতিমতো বিপদ।'

ওষুধের দামটা মেটাতে গিয়েই পকেটে হাত ঠেকল সৃজনের। দীপাবউদি হাতের একটা সোনার আংটি দিয়েছে ওকে। ওটা বেচে এই ওষুধগুলো আনতে বলেছে। নিজের পার্স থেকে টাকাটা বের করে দাম মিটিয়ে দিয়ে পা

চালাল সৃজন। বউদির শরীরটা এত ফোলা তাহলে কি এই জন্য! এত রোগ থাকলে সব কিছুরই তো গণ্ডগোল হবে।

ওষুধগুলো নিয়ে দীপশিখাবউদির বাড়িতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় ভিতর থেকেই বেশ চিৎকার ভেসে এল। অনীকদার গলা শোনা যাচ্ছে।

‘দিনরাত রোগের বাহানা শুনতে শুনতে নিজেকে রুগি মনে হয় বুঝলে। বাড়িতে ঢুকেই দেখব একটা বেকার শরীর চিতিয়ে পড়ে আছে। পাশবালিশের মতো বিছানা জুড়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কী কাজ আছে তোমার, আমায় একটু বলো তো? চিকেনটা তো আমি রাতে খাব বলে এনেছিলাম। তুমি ফ্রিজে কেন ঢুকিয়ে রেখেছ? রাতে রান্না করতে কি কষ্ট হচ্ছে? আগামীকাল তোমার কষ্ট কমে যাবে? ঠকানোর একটা লিমিট থাকে বুঝলে? তোমার ওই জোচ্চোর বাপটা এভাবে ঠকাবে জানলে বিয়েটাই করতাম না। ধুত্তোর, তোমার ওই আলুর ঘ্যাঁট তুমি গেলো।’

ভিতর থেকে একটা রিনরিনে গলার স্বর শোনা গেল, ‘ডিম ভেজে দেব একটা?’

অনীকদা আবার বলল, ‘না না, এত কষ্ট তোমার ওই শরীরে সইবে কেন! আমি হোটেলে খেয়ে নিচ্ছি।’

ঝড়াম করে গেটের আওয়াজ হল, একটু সরে গেল সৃজন। অন্যদিন অনীকদা ওকে দেখে তেমন বিরক্ত হয় না। বলে, ‘যা, তোর বৌদি ভিতরে আছে।’ কিন্তু আজ যেভাবে রেগে আছে তাতে হয়তো ওকে দেখলে আরও রেগে যাবে। তাই উঠোনের উত্তর দিকের অন্ধকার গাছের কোণটাতে একটু সরে গেল সৃজন। অনীকদা বাইকটা নিয়ে বেশ রাগী ভঙ্গিমায় বেরিয়ে গেল। তারপরেও একটুক্ষণ অপেক্ষা করল সৃজন। বউদি হয়তো ঘরে কাঁদছে, ও সামনে গেলে অস্বস্তিতে পড়বে, তাই একটু অপেক্ষা করল।

ভিতর থেকে ভেসে আসছে গানের আওয়াজ...

'ছোট ছোট দিন

আলাপে রঙিন, নুড়িরই মতোন

ছোট ছোট রাত

চেনা মৌতাত, পলাশের বন...আহা

অগোছালো ঘর, খড়কুটোময়

চিলেকোঠা কোণ

কথা ছিল হেঁটে যাব ছায়াপথ...'

বেল বাজাতে হল না, দরজা খোলাই আছে। সৃজন পায়ে পায়ে ঢুকল দীপশিখাবউদির ঘরে। বউদি বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে আছে। সামনে বউদির ভীষণ প্রিয় ছোট্ট জলপাই রঙের হোম থিয়েটারে বাজছে অন্তহীন সিনেমার গানটা।

ওকে দেখে গানটা অফ করে বউদি বলল, 'এসো সৃজন। তুমি বাংলা গান ভালোবাসো?'

সৃজন একটু অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'হ্যাঁ বাসি। অনীকদা রাগ করেছিল কেন? কোনো সমস্যা?

বউদি অন্যমনস্কভাবে বলল, 'রাগের আর দোষ কী সৃজন? ওই মানুষটাই বা পেয়েছে কী জীবনে! আমায় বিয়ে করেছিল কিছু টাকার লোভে। বোনের বিয়ে দিতে পারছিল না টাকার জন্য। আমার বাবার কোম্পানিতেই জব করত। বাবাও সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। রোগগ্রস্ত মেয়ের দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছে অনীকের মাথায়। নিজের বাবা, মা, দাদা, বউদি যার দায় নেয় না, তার দায় কেন একজন অপরিচিত নেবে বলো তো সৃজন? অনীক আমার থেকে মাত্র বছর দেড়েকের বড়। ও কী পেল আমায় বিয়ে করে? বাবার দেওয়া বেশ কিছু টাকা দিয়ে বোনটার বিয়ে দিয়েছে। ওদের ভাঙা বাড়িটা সারিয়ে নিয়েছে। আর এই বাড়িটা আমার বাবা করে দিয়েছে তার

মেয়ে-জামাইয়ের জন্য। কারণ, অনীকদের গ্রামের বাড়িতে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া অনীকের মা-বাবা আমায় তেমন পছন্দ করে না। অনীক এখন আমার বাবার কোম্পানির ম্যানেজার হয়ে গেছে। স্যালারি বেড়েছে। কিন্তু কোম্পানিটাও এখন লসে যাচ্ছে। তাই ওরও মাথার ঠিক নেই। এমন একটা মোটা, কালো অসুস্থ শরীরের দায় যে ও নিয়েছে এটাই তো অনেক সৃজন। আমি কৃতজ্ঞ যে, ও আমায় আমার বাপের বাড়ি থেকে বের করে এনেছে। ওবাড়িতে দিনরাত একটাই কথা শুনতাম জানো তো, 'দীপাকে নিয়ে যে কী হবে? ও-ই হল আমাদের ঘাড়ের বোঝা।' বউদি মাঝে-মাঝেই বিরক্ত হয়ে দাদাকে বলত, 'অন্যত্র ফ্ল্যাট কিনে রাখো। তোমার মা-বাবা চোখ বুঝলে আমি কিন্তু তোমার বোনের দায়িত্ব নিতে পারব না।' দাদার চোখেও বিরক্তি দেখেছি। বলত, 'এত ডাক্তার তো দেখানো হল, ভেলোর নিয়ে যাওয়া হল এত বার। দু'দিন ভালো থাকে তো তিনদিনের দিন পা ফুলে ঢোল। হাঁটার ক্ষমতা থাকে না। সত্যিই নিজেদের জীবনটা নরক হয়ে গেল।' এসব শুনে শুনে বুঝতে পারতাম আমি ওদের বড্ড গলগ্রহ। 'অনীক আমায় উদ্ধার করেছে ওখান থেকে।'

সৃজন একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'উদ্ধার করার কী আছে? বিয়েটা করেছিল নিজের স্বার্থে। তোমায় উদ্ধারের জন্য নয়। এখন স্বার্থ মিটে গেছে তাই যাবতীয় রাগ ঝাড়ছে তোমার ওপরে। অনীকদা তো জানেই তুমি অসুস্থ থাকো। তাহলে একটা রাঁধুনি রাখলেই পারে। টাকা তো তোমার বাবা দেবে।'

ফোলা হাতগুলোর ওপরে প্রেশার দিয়ে অনেক কষ্টে বসল দীপশিখা। বলল, 'ওর দোষ নেই। রাঁধুনি আমিই রাখতে দিইনি সৃজন। কাজের লোক সবটুকু করে দিয়ে যায়। আমি তো অনীককে কিছুই দিতে পারি না। রাঁধুনি রান্না করে দিয়ে গেলে এ সংসারে আমার প্রয়োজনটা কী বলো তো? নিজের

অধিকারটুকু হারাতে চাইনি বলেই রাঁধুনি রাখিনি। শরীরটা এতটা খারাপ হত না, জানো। প্রায় দিন কুড়ি ওষুধ খাইনি তাই এতটা অসুস্থ হয়ে পড়লাম।'

সৃজন বলল, 'তো খাওনি কেন?'

দীপশিখা মাথা নীচু করে বলল, 'টাকা ছিল না আমার কাছে। বাবার পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ব্যস্ত আছে হয়তো, তাই ভুলে গেছে।'

সৃজন বলল, 'তো অনীকদার কাছে চাওনি কেন? ওষুধগুলো তো অনীকদাই এনে দিতে পারত।'

মাথাটা নীচু করে নিল দীপশিখা। নরম গলায় বলল, 'শুকনো চোখের জল অন্যকে দেখালে যেমন কষ্টটা কমে যায় না, তেমনই নিজের রোগের গল্প অন্যকে বললেও সেটা ভালো হয়ে যায় না সৃজন। আমি চাই না, আমি দিনে কতগুলো ওষুধ খাই সেটা ও জানুক। সাধারণত আমাদের পরিচারিকার হাতে টাকা দিয়ে দিই, ও-ই এনে দেয়। এবারে টাকা ছিল না বলে, আংটি বন্ধক রাখতে হবে বলেই তোমায় ডাকলাম। ওদের তো জানো, সারা পাড়ায় বলে বেড়াবে।'

সৃজন ওষুধের ব্যাগটা সামনে রেখে বলল, 'এতে সব আছে। আর এই নাও আংটিটা। এটা লাগেনি। তুমি টাকা পেলে আমায় ধার শোধ করে দিও।'

দীপশিখা আচমকা সৃজনের হাতটা টেনে কড়ি আঙুলে সাদা পাথরের আংটিটা পরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা তবুও তোমার কাছে থাক।'

সৃজন হেসে বলল, 'বুঝলাম এটা ইউনিসেক্স আংটি। কিন্তু তাই বলে সামান্য ক'টা ওষুধের জন্য এত দামি আংটি আমি নেব কেন?'

দীপশিখা বলল, 'থাকুক না আমার একটা স্মৃতি তোমার কাছে।'

সৃজন আর কিছু বলল না।

দীপশিখা বলল, 'সৃজন একদিন আমায় একটা সিনেমায় নিয়ে যাবে? সেই কলেজে পড়তে লাস্ট সিনেমা দেখেছি। তারপর আর দেখা হয়নি। বিয়ের

পরে আমায় নিয়ে বেরোতে অনীকের লজ্জা করে বলে, আমিও জোর করিনি।'

সৃজন বলল, 'সে যাব'খন। তার আগে তোমায় একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। আর তুমি ঘুমের ওষুধ কেন লিখেছিলে?'

দীপশিখা একটা ওষুধ জল দিয়ে গিলে নিয়ে বলল, 'রাতে ঘুম আসতে চায় না তাই। তোমাদের বাড়িতে ক'দিন আগে একটা মেয়েকে দেখলাম ছাদে ঘুরছে। তোমার মা'ও ছিলেন। দুজনে খুব গল্প করছিল। ওটা কে গো? তোমার গার্লফ্রেন্ড? দারুণ দেখতে কিন্তু। আমায় বলোনি তো, তোমার গার্লফ্রেন্ডের কথা। আমার সঙ্গে আলাপ কবে করাবে?'

সৃজন বলল, 'সে হবে'খন।'

অভিষিক্তা সময় পেলেই বাড়িতে আসে। মায়ের সঙ্গে ওর খুব জমে। হবু শাশুড়ি নয়, ঠিক যেন দুই বান্ধবী এমনভাবেই গল্প করে। অভিষিক্তার সঙ্গে ব্রেকআপ হয়ে গেছে খবরটা বোধহয় এতক্ষণে বাড়িতেও পৌঁছে গেছে। কারণটা যে দীপশিখাবৌদির সঙ্গে মেলামেশা সেটাও হয়তো মা জানে এতক্ষণে। সৃজনকে বেশ কিছু কড়া কথা যে শুনতে হবে বাড়িতে, সেটা ও বেশ জানে। কিন্তু মা যদি বউদিকে চারটি কুকথা শুনিয়ে দেয়, তাহলে লজ্জায় শেষ হয়ে যাবে সৃজন।

একটু অন্যমনস্কভাবেই বলল, 'হ্যাঁ গার্লফ্রেন্ড।'

দীপশিখা বলল, 'তোমাদের ভারি মানাবে জানো। এই যে তোমার অনীকদা এমন সুপুরুষ, তার পাশে আমায় যেমন বিকট লাগে তেমন নয়। তোমাদের ভীষণ মানাবে।'

সৃজন বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে কবে যাবে?'

দীপশিখা বলল, 'সিনেমা যাব, ফুচকা খাব, আইসক্রিম খাব। যদি পারো নিয়ে যেও। তোমার প্রেমিকাকেও সঙ্গে নিতে পারো। বেশ মজা হবে। বলা

তো যায় না, বর্ষার প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটা যদি আর দেখা না হয় আমার। যদি আর উথাল করা কালবৈশাখী দেখা না হয়। ইস্ আফসোস হয়, জানো সৃজন।'

সৃজনের খুব রাগ হচ্ছিল অনীকদার ওপরে। স্ত্রী অসুস্থ জানে, তবুও তার মন ভালো রাখতে একটু সিনেমাও দেখাতে নিয়ে যেতে পারে না। এদিকে তো শ্বশুরের টাকায় ফুটানি করছে। বউদির অসুস্থতার জন্য অনীকদাই দায়ী। মন খারাপ থাকলে রোগ আরও বেড়ে যায়। অনীকদার যা ব্যবহার, তারপর বৌদির মন কীভাবেই বা ভালো থাকবে!

সৃজন বলল, 'ওষুধগুলো নিয়ম করে খেও। পরের সপ্তাহে একটা ছুটির দিন দেখে আমরা সিনেমা দেখতে যাব।'

ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল দীপশিখা। বলল, 'সত্যি নিয়ে যাবে? খুব মজা হবে। আমার আলমারিতে কত নতুন শাড়ি আছে। একটা পরে যাব। কোথাও যাওয়া হয় না বলে পরাও হয় না।'

সৃজন বেরিয়ে এল। গেট থেকেই শুনতে পেল...

"চেনাশোনা মুখ জানাশোনা হাত রেখে যায়

ধীরে ধীরে ঘুম ঘিরে ঘিরে গান ডেকে যায়

আজও আছে গোপন

ফেরারি মন

বেজে গেছে কখন

সে টেলিফোন..."

আনমনে বাড়ির গেটে এসে বেল বাজাল সৃজন। মাত্র একটা বাড়ি পরেই দীপশিখাদের বাড়ি। সৃজনদের ছাদ থেকে বউদিদের ছাদ পরিষ্কার দেখা যায়। অনীকদার ফুলশয্যার দিনে ওরা বন্ধুরা খুব খেটেছিল। মাত্র বছর তিনেক আগের কথা। তবুও যেন মনে হয়, দীপশিখার সঙ্গে পরিচয় ওর কত

দিনের। অনীক যেহেতু পাশের বাড়ির প্রতিবেশী তাই অনীকদার বিয়ের অনেক দায়িত্বই নিয়েছিল ওরা। অনীকদার এই বাড়িটা আসলে ছিল শিবাণী দিদিমনির। দোতলা বাড়িটা দিদিমনি মারা যাওয়ার পরে প্রায় তালা বন্ধ হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই বছর চারেক আগে অনীকদা এসে একতলাটায় ভাড়া থাকতে শুরু করে। দিদিমনির মেয়ে-জামাই কলকাতা থেকে এসে লোক লাগিয়ে পরিষ্কার করে গিয়েছিল ক'দিন আগে। অনীকদা বলেছিল, বিজ্ঞাপন দেখেই ভাড়া এসেছে। সেই থেকেই অনীকদার সঙ্গে সৃজনদের পরিচয়। ছুটিছাটায় ওদের ক্লাবে এসে ক্যারাম খেলত অনীকদা। ক্যারাম খেলায় আজ অবধি কেউ হারাতে পারেনি অনীকদাকে। বেশ হাসিখুশি ছিল। কখনো পরিবারের কোনো সমস্যার কথা বলেনি ক্লাবের কাউকে। হঠাৎই একদিন এসে বলল, 'বিয়ে করেছি আর শিবানী দিদিমনির বাড়িটাও কিনে নিচ্ছি।'

সৃজনরা মজা করে বলেছিল, 'তোমার তো হেভি টাকা গো। এবারে সরস্বতী পুজোয় বেশি করে চাঁদা দিতে হবে।'

অনীকদা হেসে বলেছিল, 'সে হবে রে। আপাতত বিয়েটা এই বাড়ি থেকেই হবে। তাই তোদের খাটতে হবে দাদার বিয়েতে। গ্রামের বাড়ি থেকে করব না। বোনের বিয়ে দিলাম, গোটা গ্রামকে নিমন্ত্রণ করতে হয়েছিল। এবারে আর অত পারব না।' শিবাণী দিদিমনির পড়ে থাকা বাড়িটা কয়েকদিনের মধ্যেই রিপেয়ার হয়ে গেল। পিচ রং চড়ল বাড়ির গায়ে। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করে উঠল। অনীকদাকে এক কথায় সুপুরুষ বলা চলে। সেই অনীকদা যেদিন বিয়ে করে বউ নিয়ে পাড়ায় এল, সবার মধ্যেই একটা চাপা ফিসফিস শুরু হল। অনীকের মতো সুদর্শন ছেলে কিনা এই কালো, মোটা মেয়েটাকে বিয়ে করে আনল? দেখে তো অনীকের থেকে বড়ই মনে হচ্ছিল বয়েসে। ওদের ক্লাবের টিমটা অবশ্যই বরযাত্রী হিসাবে গিয়েছিল। সৃজন সেদিনই দেখেছিল দীপশিখাকে। রীতিমতো কাঁচুমাচু হয়ে,

অস্বস্তি নিয়ে বসেছিল বউয়ের সাজে। দামি বেনারসি, এক গা গয়না পরেও চোখ দুটোতে যেন অনেকটা কষ্ট লুকিয়ে আছে—এটাই মনে হয়েছিল সৃজনের। দীপশিখার মুখশ্রী মোটেই খারাপ লাগেনি ওর, বরং বেশ মিষ্টি লেগেছিল।

বন্ধুরা অবশ্য বলছিল, 'দেখো বস, টাকার লোভে বিয়ে করলে এমনই বউ হবে। রাতারাতি যখন দোতলা বাড়ি হয়ে যাচ্ছে, দামি বাইক হয়ে যাচ্ছে, তখন বুঝতেই হবে গল্প কিছু আছে। অনীকদার বউকে দেখে বুঝলাম, অনীকদার শ্বশুর জামাই কিনেছে চড়া দামে।'

সৃজন সেদিনই শুনেছিল কানাঘুষো যে, অনীকদা দীপশিখার বাবার কোম্পানিতেই জব করে। কে জানে কেন সেদিন থেকেই দীপশিখার জন্য ওর কেমন মায়া লেগেছিল।

ফুলশয্যার দিন সৃজনরা সবাই মিলে প্রচুর খেটেছিল। নিমন্ত্রিত যদিও কম, মাত্র আড়াইশো মতো, তবুও অনীকদা বলেছিল, 'দেখিস বদনাম যেন না হয়।'

অনীকদাদের লোকজন কম ছিল বলেই বউভাত আর ফুলশয্যা একই দিনে করে দিয়েছিল। সৃজনের মনে আছে, স্নান করতে দুপুর দুটো বেজে গিয়েছিল। প্রায় তিনটে নাগাদ এসে দেখেছিল, বন্ধুদের খাওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎই একটা রিনরিনে গলায় কেউ বলেছিল, 'তুমি সারাদিন এত কাজ করছ, অথচ এখনও খাওয়া হয়নি? এসো খেয়ে নেবে এসো।'

সৃজন দেখেছিল নতুন বউ একটা লাল হলুদে মেশানো শাড়ি পরে মাথায় অল্প ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর পিছনেই।

সৃজন অপ্রস্তুত গলায় বলেছিল, 'না ঠিক আছে, আমি খেয়ে নিচ্ছি।'

দীপশিখা মিষ্টি করে হেসে বলেছিল, 'আজ তো বউভাত। তাই আমাকেই বসিয়ে খাওয়াতে হয় আত্মীয়দের।'

নিজের হাতে পরিবেশন করে খাইয়েছিল দীপশিখা ওকে। দীপশিখার আন্তরিকতায় আপ্লুত হয়েছিল সৃজন। দীপশিখাও ইংরেজিতে অনার্স করেছে শুনে ওদের বন্ধুত্বটা আরও জোরালো হয়েছিল। সৃজন কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি এই সম্পর্ক নিয়ে আড়ালে কানাকানি হতে পারে। অনীকদাও প্রায় বলত, 'তোর বউদি তোকে খুব স্নেহ করে। মাঝেমাঝে যাস, গল্প করে আসিস। একাই থাকে তো।'

তখন অবশ্য সৃজন জানত না দীপশিখার শরীরে এত রোগের বাস। জানত না অনীকদার সঙ্গে দীপশিখার বিয়েটা একটা ডিল। ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে একটা অসমবয়সি বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল দীপশিখার। কখনও ওরা রাজনীতি নিয়ে তর্ক করত। কখনো শেক্সপিয়ার নিয়ে নস্টালজিয়ায় ভেসে যেত। অভিষিক্তাও জানত দীপশিখাবউদির কথা। কখনও এই নিয়ে কিছু বলেনি। আচমকাই একমাস ধরে এই নিয়ে ঝগড়া শুরু করল। তার ফলাফল আজকের ব্রেকআপ। অভিষিক্তার বক্তব্য, সৃজন দীপশিখার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে পারবে না। ওদের বাড়ির চৌকাঠ ডিঙাতে পারবে না।

সৃজন বলেছিল, কারণটা ঠিক কী? আচমকা এমন একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নেবে কেন সৃজন! অভিষিক্তা কোনো যুক্তিতর্কের ধার ধারেনি। একটাই কথা বলেছিল, 'ইয়েস অর নো?'

সৃজন বলেছিল, 'আগে তুমি পুরোটা শোনো।'

অভিষিক্তা উত্তর দিয়েছিল, 'তাহলে সম্পর্কটার ইতি টানা উচিত।'

এভাবে ভুল বোঝাবুঝিতে শেষ হয়ে যাবে ওদের স্টেডি রিলেশনশিপটা ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেনি সৃজন। একজন অসুস্থ মহিলার দিকে বাড়ানো হাতটা সরিয়ে নিতে পারেনি সৃজন। মাঝে-মাঝেই টুক করে একটা

মেসেজ ঢুকেছে, 'আজ একবার টিউশন থেকে ফেরার পথে আমার বাড়ি হয়ে যাবে। নতুন আইটেম বানিয়েছি, খাওয়াব।'

সৃজন ঢুকতেই মুখ কাঁচুমাচু করে দীপশিখা বলেছিল, 'তোমার দাদা খেয়ে বলল ভালো হয়নি। ইউটিউব দেখে কত কষ্ট করে মোগলাইটা বানালাম।'

সৃজন হেসে বলেছে, 'আমার খিদের মুখে সব অমৃত। তুমি ঝটপট দাও দেখি।' অনীকদা হাসতে হাসতে বলেছে, 'হ্যাঁ, এই তো নির্বিবাদী প্রশংসাকারী পাবলিক এসে গেছে। ওকে করে খাওয়াও তুমি।'

নিজের কাজে বেরিয়ে গেছে অনীকদা। বউদি গরম গরম মোগলাই ভেজে দিয়েছে। সৃজন খেয়ে দেখেছে বেশ সুন্দর খেতে হয়েছে। অদ্ভুত লেগেছে অনীকদার ব্যবহার। একটু ভালো বললেই তো বউদির মুখে হাসি ফুটত। সেটুকুতেও আপত্তি! তবে কোনোদিনও এত ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠেনি সৃজনের। বরং ও খেতে খেতেই বলেছে, 'হয়ে গেল বউদি, তুমি আমাদের স্কুল মোড়ের মদনদার মোগলাইয়ের দোকানটা উঠিয়ে ছাড়বে মনে হচ্ছে।'

বউদির মুখে হাসি ফুটেছে। ঠিক যেন থমথমে মেঘের পরে এক টুকরো সূর্যের উঁকিঝুঁকি। দীপশিখা অভিমানী গলায় বলেছে, 'ধুর, তুমি মিথ্যে মিথ্যে প্রশংসা করছ। তোমার দাদা বলল, খাওয়া যায় না।'

সৃজন নিজের পাত থেকে এক টুকরো দীপশিখার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বলেছে, 'তুমি নিজেই খেয়ে দেখ।'

দীপশিখা বিস্ময়ে বলে উঠেছে, 'খারাপ তো হয়নি। তোমার দাদার কিছুই পছন্দ হয় না।'

দীপশিখার গলার মনখারাপি বাতাসটাকে এক ঝটকায় সরানোর জন্যই সৃজন কলেজ লাইফে মোগলাই খাওয়ার গল্প ফেঁদেছে। সেই গল্পের স্রোতে মিশে গেছে দীপশিখাও। এমন কত সন্ধে কাটিয়েছে ওরা। একটা জিনিস

ধীরে ধীরে বুঝেছে সৃজন, অনীকদার যেহেতু দীপশিখাকে পছন্দ নয়, তাই ওর করা কোনো জিনিসই পছন্দ করে না। ওই কারণেই সবসময় বিরক্তি ঝুলিয়ে রাখে ঠোঁটের কোণে। আর ওই বিরক্তিটুকুকে হাসিতে বদলাতে কী আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে চলে দীপশিখা।

একদিন মেসেজ এল, 'চটপট আসবে বাড়িতে, গোপন পরামর্শ আছে।'

সৃজন টিউশন সেরে যেতেই দেখল দীপশিখা খুব উত্তেজিত। ওকে বসিয়ে চা আর জলখাবার দিয়ে বলল, 'যা প্ল্যান সব তোমার দাদা ফেরার আগে কমপ্লিট করতে হবে।'

সৃজন দীপশিখার এসব ছেলেমানুষির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। কোনোদিন ফিসফ্রাই বানাবে ভেটকি চাই, কোনোদিন রজনীগন্ধার স্টিক চাই রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নিজের ঘরেই রবি ঠাকুরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবে। এসব বায়না শুধু সৃজনের কাছেই করে। অবশ্য পাই-পয়সা হিসেব করে দিয়ে দেয় দীপশিখা। সৃজন নিতে না চাইলেও জোর করে দিয়ে দেবেই। তাই 'উঠল বাই তো কটক যাই' স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল সৃজন। দীপশিখার সব পাগলামির দোসর থেকেছে সৃজন। চায়ে চুমুক দিয়ে ও বলেছিল, 'আজ্ঞা করুন মহারানি। আজ কি ডুমুরের ফুল আনার আদেশ হবে?'

দীপশিখা হো-হো করে হেসে বলেছিল, 'বড্ড জ্বালাই আমি তোমায়, তাই না? আর তো কেউ নেই আমার বন্ধু এখানে, তাই তোমাকেই জ্বালাই।'

সৃজন হেসে বলেছিল, 'এখন তাড়াতাড়ি বলো, করতে কী হবে?'

অনীকদার সারপ্রাইজ বার্থ-ডে পার্টি অ্যারেঞ্জ করেছিল দীপশিখা। অনীকের বাবা-মাকেও ডেকে এনেছিল। সারাদিন অসুস্থ শরীর নিয়ে একা হাতে রান্না করেছিল অনীকের পছন্দের সমস্ত রকম খাবার। সৃজন কেক এনে দিয়েছিল দীপশিখার নির্দেশ মতো। কিন্তু সন্ধেতে এসে দেখেছিল মুখ

ভার করে বসে আছে দীপশিখা। গালে চোখের শুকনো জলের দাগ বলে দিয়েছিল, মন ভালো নেই ওর।

সৃজন আসতেই অনেক খাবার সাজিয়ে দিয়েছিল। কেকের পিস দিয়েছিল। কিন্তু সেই উত্তেজনা, হাসি কিছুই ছিল না দীপশিখার মুখে।

সৃজন বলেছিল, 'কী হল? হাসি নেই কেন মুখে?'

দীপশিখা করুণ হেসে বলেছিল, 'হাসি, আনন্দ, সুখ এগুলো ভীষণ দামি সৃজন। সকলের ভাগ্যে থাকে না। এই সারপ্রাইজ বার্থ-ডে'তে অনীক ভীষণ বিরক্ত। ওর নাকি বন্ধুদের সঙ্গে অন্যত্র প্ল্যান করা ছিল। ওর বাবা-মাও বিশেষ খুশি নয়।'

সৃজন কিছু না বলে কোনোমতে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে এসেছিল। রাগ হয়েছিল অনীকদার ওপরে। কিন্তু অন্যের ফ্যামিলি ম্যাটারে কথা বলাটা সমীচীন নয় বলেই চুপ করে গিয়েছিল। এভাবে দীপশিখার কত আনন্দ, উত্তেজনাপূর্বক মুহূর্তকে এই তিনবছরে দুঃখে পরিণত হতে দেখেছে সৃজন, তার ইয়ত্তা নেই। তবুও অনীককে পাওয়ার কী ভীষণ ব্যাকুলতা ওর মধ্যে। অনীকদার মুখে একটু হাসি দেখবে বলে সব করতে রাজি ছিল মেয়েটা। কিন্তু অনীকদা ভালোবাসা তো দূরে থাকুক একটু ভালো ব্যবহার অবধি করেনি। দীপশিখার এত ডিপ্রেশনের কারণ একমাত্র অনীকদা। এটা সৃজন জানে।

বাড়িতে ঢুকতেই মা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সৃজনের ওপরে। বিরক্তির গলায় বলল, 'একটু শান্তি কি তুই আমাদের দিবি না ঠিক করেছিস? এত লেখাপড়া শিখে চাকরি পেলি না। মেনে নিলাম। অভিষিক্তাকে ভালোবাসিস বললি, মেনে নিলাম। এখন শুনছি ওই অনীকের ঘরকুনো অহংকারী বউটার সঙ্গে নাকি তুই...ছি-ছি ভাবতেই তো কেমন লজ্জা করছে। হ্যাঁ রে, অভিষিক্তার

মতো অমন একটা সুন্দরী, শিক্ষিত মেয়েকে ছেড়ে ওই বউটার মধ্যে তুই কী দেখলি যে, সম্পর্কটা নষ্ট করে ফেললি?'

সৃজন ভাবছিল, নিজের মা, গর্ভধারিণী মা, যে ওকে তিলতিল করে বড় করেছে তার যদি এমন ধারণা হয় ছেলের সম্পর্কে, তাহলে ক্লাবের বন্ধুদের বা অভিষিক্তাকে কী দোষ দেবে ও? একই কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত লাগছিল সৃজনের। যাদের কাছে সম্পর্কের ডেফিনেশন শুধুই ফিজিক্যাল রিলেশনে গিয়ে শেষ হয়, তাদের কাছে ওর আর দীপশিখাবৌদির সম্পর্কের রসায়ন বোঝানোর কোনো দায় নেই।

সৃজন নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। কাঁধের ব্যাগটা চেয়ারে রেখে ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওর আর অভিষিক্তার পুরোনো চ্যাটগুলো পড়ছিল। কে জানে কখন নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে ওর। ছেলেরা নাকি কাঁদে না, এমন ধারণার মান রাখার জন্যই তাড়াতাড়ি চোখের জলটা মুছে নিল। হোয়াটসঅ্যাপে ব্লক করেনি অভিষিক্তা ওকে। মিনিট দুয়েক আগেই অনলাইন ছিল। এখন সম্ভবত হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে। এটা ওর রেওয়াজের টাইম। ঘণ্টাখানেক রেওয়াজ করে তারপর পড়তে বসবে। গানের স্কুলটাকে রাখার জন্য অভিষিক্তা নিজেকেও তৈরি করে প্রতিমুহূর্তে। এই মুহূর্তে ওর গানের 'কলাক্ষেত্র' স্কুলটা বেশ নাম করেছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মন্দ নয়। একদিকে চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অভিষিক্তা, অন্য দিকে গানের স্কুলটাকে বাড়াচ্ছে। প্রায়ই ওরা দুজন আলোচনা করত, বিয়েটা করেই ফেলবে কিছুদিন পরে। দুজনের রোজগারে চলে যাবে বেশ।

একটা মেসেজ চোখ পড়ল সৃজনের।

অভিষিক্তা লিখেছে, 'একটা সময়ের পরে ভালোবাসাটা থিতু হয়ে যায়। তখন আর কোনো চঞ্চলতা কাজ করে না তার মধ্যে। রুটিন মাফিক রোজ

দেখা করার তাগিদও থাকে না। সপ্তাহে একদিন দেখা হলেই চলে। আর ব্যস্ততার মাঝে ছোট্ট দুটো মেসেজ বা একটা ফোন কল। শুধু একটা গাঢ় অনুভূতি কাজ করে, তুমি আছ। আমারই আছ। এই অনুভূতিটুকুই বোধহয় ধীরে ধীরে বিশ্বাস, ভরসা এসব শব্দের জন্ম দেয় সম্পর্কের মধ্যে। সেই উথালপাথাল মনটা অনেক শান্ত হয়ে যায়। সব কিছু অকপটে বলার একজন আছে জেনেই হয়তো দস্যিপনা কমিয়ে দিয়ে শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে যায় সে। আচ্ছা সৃজন, তোমার কোন অবস্থাটা বেশি ভালো লাগে? এই শান্ত ভরাট দিঘিকে? নাকি বর্ষার দামাল তিস্তাকে?'

সৃজন লিখেছে, 'দুটোই। কখনও খুব ইচ্ছে করে তুমি আমার জন্য অস্থির হও। অনেক রাগ করো, গভীর অভিমান করো, ঝগড়া করে কথা বন্ধ হোক। আবার বিরহের পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিলন হোক। আবার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, শান্ত ভরাট দিঘির পাশে বসে উপলব্ধি করি, ভালোবাসা তো আছেই। থাকবে এই নিশ্চিন্ত ভাবটাকেই অনুভব করি বরং।'

বুকের ভিতরটা তোলপাড় করছে সৃজনের। কখনো ভাবেনি কোনো পরিস্থিতিতেই অভিষিক্তা ওকে ভুল বুঝবে। ও তো বোঝাতে চেয়েছিল। আনতে চেয়েছিল দীপাবউদির বাড়িতে ওকে। সামনে বসে ওদের সম্পর্কটাকে দেখলেই বুঝতে পারত অভিষিক্তা, ওদের সম্পর্কের রসায়নটা। কিন্তু অবুঝের মতো ও কোনো কথাই শুনতে চাইল না।

দিন দুই হয়ে গেল দীপাবউদির কোনো মেসেজ আসেনি সৃজনের কাছে। কে জানে বউদির শরীরটা ভালো আছে তো? সেদিন ওষুধগুলো দিয়ে আসার পরে একবার নিজে থেকেই খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ছেলেমেয়েদের এক্সাম চলছিল বলে একটু ব্যস্ত ছিল সৃজন, তাই সময় করে উঠতে পারেনি। তাছাড়া অভিষিক্তার এই নীরব হয়ে যাওয়াটা প্রতি মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত করছে ওকে। আসলে যেটা কখনও ও বা অভিষিক্তা আলোচনা

করেনি সেটা হল, ভালোবাসাটা একটা অভ্যেস। দীর্ঘদিনের অভ্যেস থেকে বেরোনো ভীষণ কঠিন। সৃজন ভাবল, দীপশিখাবউদির বাড়ি ঘুরে আসবে আজকে। শরীরটা কেমন আছে জেনে আসবে।

অন্যদিন বাড়িটা সন্ধেতে বেশ ঝলমল করে। বাড়ির সব আলো জ্বালিয়ে রাখাটা দীপশিখাবউদির নেশা। বলে, 'আলো ঝলমল করলে বাড়িটাকে রুগির বাড়ি মনে হয় না। মনে হয় এ বাড়িতে খুব সুখী, সুস্থ একটা মানুষ থাকে। তাই ঘর অন্ধকার রাখতে আমার একেবারে ভালো লাগে না সৃজন। তোমার দাদা বলে, ইলেকট্রিক বিল কে দেবে? আমি বলি তোমার শ্বশুর।'

বলতে বলতেই ডাইনিং-এর আরও দুটো আলো পট পট করে জ্বালিয়ে দিয়ে বলত, 'দেখো, বেশ অনুষ্ঠান বাড়ি অনুষ্ঠান বাড়ি ফিল হচ্ছে না?'

কী যে পাগলামি করে বউদি কে জানে! বড্ড ছেলেমানুষি বুদ্ধি নিয়ে চলে মানুষটা। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বেল বাজাল সৃজন। বেশ খানিকক্ষণ পরে এসে দরজাটা খুলল বউদি। মুখ চোখ বেশ ফোলা। থমথম করছে। দেখেই মনে হল দীর্ঘক্ষণ ধরে কেঁদেছে। ওকে দেখে বলল, 'এসো সৃজন। খুব ভালো হল তুমি এলে।'

সৃজন বলল, 'শরীর কেমন আছে তোমার? তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। আমাদের সিনেমা যাওয়া আর ফুচকা খাওয়ার প্ল্যানটা সাকসেসফুল করতে হবে তো তাড়াতাড়ি। আর আজ লাইট জ্বালোনি কেন?'

দীপশিখা বলল, 'এতদিন বুঝতে পারিনি অন্ধকারের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। অন্যের দুঃখ-কষ্ট নিমেষে লুকিয়ে রাখতে পারে। যারা অগভীর মনের অধিকারী তারাই নিজের দৈন্যতা লোকের সামনে দেখাবে বলে, আলো জ্বালিয়ে রাখে। জানো সৃজন, এপাড়ার অনেকে বলে আমি নাকি অহংকারী, মিশুকে নই। আসলে আমি মিশতে চাই, কিন্তু এই রোগগ্রস্ত ফোলা শরীর নিয়ে কারোর সামনে যেতেই বড় লজ্জা করে। শুধু মনে হয়

যেই আমি ওই আড্ডা থেকে উঠে আসব, তখন সবাই বলবে, 'ইস্ অনীক যে কী করে এই মেয়েকে বিয়েটা করল?' তাই গত তিনবছরে যতটা পেরেছি নিজেকে লুকিয়েই রেখেছিলাম। সত্যি বলতে কী, অভিমানে বাপের বাড়িও যাইনি তেমন। আমার একমাত্র জানালা ছিলে তুমি। যেখানে থুতনি ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আমি একটুকরো আকাশ দেখতাম, আকাশে বকমবকম করে উড়ে বেড়ানো পায়রার ঝাঁক দেখতাম, মেঘ থমথমে আকাশের পরে অঝোরে বৃষ্টি নামা দেখতাম।'

সৃজন লক্ষ করল, আজ যেন দীপশিখা একটু বেশিই কথা বলছে। এত ব্যক্তিগত কথা খুব কমই বলেছে ওকে।

'তুমি হচ্ছ আমার সেই জানলা সৃজন, যেটা বন্ধ হয়ে গেলে আমি ইনহেলার নিয়েও নিশ্বাস নিতে পারব না। অনীকের কোনো দোষ নেই। ও আমার এই মোটা শরীরটা ভেদ করে মনের সন্ধানই করতে পারেনি। মধ্যরাতে ওর শরীর জেগেছে। পাশে শুয়ে থাকা আমায় আদর করবে বলে জড়িয়ে ধরেছে, তারপরই কেন কে জানে ওর শরীর শীতল হয়ে গেছে। কোনো আকর্ষণ অনুভব করেনি ও। কতরকম ডায়েট ট্রাই করেছি আমি। কাজ কিছুই হয়নি। ডায়াবেটিক পেশেন্টরা রোগা হয়ে যায়। কিন্তু আমার থাইরয়েডের মাত্রা এতটাই বেশি যে, আমি ফুলেই থাকি। কিছুতেই রোগা হতে পারিনি।

চামড়ার রংটাও অনীকের পাশে বড্ড বেমানান। তাই হয়তো আমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে গিয়ে ওর ঠোঁটে বিরক্তি, হতাশা জমেছে। একজন সুস্থ পুরুষ মানুষ হয়ে, শারীরিক চাহিদাটুকু মেটাতে পারেনি ও। আমার প্রতি ওর যে দুর্ব্যবহার তার কারণটা পরিষ্কার আমার কাছে সৃজন। তাই দোষ ওকে দেব না। কিন্তু আমি কোনোদিন চাইনি আমার যে খোলা জানালাটা দিয়ে আমি মুক্তির শ্বাস নিই, আকাশ দেখি, সেই জানালাটার জীবনে কোনো কষ্ট নেমে

আসুক। আমার জন্য তোমার আর অভিষিক্তার ব্রেকআপ হয়েছে সৃজন। আমি সব জানি, লুকিয়ে রেখো না।'

সৃজন বলল, 'উঁহু, তোমার জন্য নয়। অভিষিক্তা আমায় ভুল বুঝেছে।'

দীপশিখা বলল, 'ধুর পাগল। মেয়েমানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নয়। তারা নিজেদের সবটুকু দিয়ে দিতে প্রস্তুত, শুধু ভালোবাসায় কেউ ভাগ বসাবে এটা সহ্য করতে পারে না। অভিষিক্তা ভুল কিছু ভাবেনি সৃজন। আমি সত্যিই তোমায় ভালোবাসি। তুমি আমার সব থেকে কাছের বন্ধু, প্রাণ ভরে টেনে নেওয়া শ্বাস। অনেকটা মুক্ত আকাশ, একরাশ শিউলি ফুলের সুবাস। মন খারাপের অব্যর্থ ওষুধ তুমি। জমে থাকা কথারা শব্দ খুঁজে পায় তোমার উপস্থিতিতে। এত কিছু বুঝতে পারবে না, এমন মেয়ে অভিষিক্তা নয়। তাই সকলের চোখে ফাঁকি দিতে পারলেও আমি ওর চোখে ধরা পড়ে গেছি। ও আমায় না দেখেই বুঝতে পেরেছে, তুমি আমার দক্ষিণের বারান্দা। শুধু অবসর কাটানোর জন্য নয়, বেঁচে থাকার প্রয়োজন। সৃজন তুমি আমায় যা দিয়েছ, আমি ভীষণ ঋণী। কিন্তু তুমি আর আমার কাছে এসো না। আমি কোনোভাবেই চাই না তোমার বদনাম হোক, তোমাদের মিষ্টি সম্পর্কটা ভেঙে যাক।'

সৃজন অপলক তাকিয়ে আছে দীপশিখার দিকে। ওর গাল বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জমে থাকা যন্ত্রণাগুলো। দীপশিখার যেন সব প্রয়োজন ফুরিয়েছে নিজের কষ্টগুলোকে আড়াল করার। তাই মোছার চেষ্টাও করছে না। নরম গলায় বলল, 'তুমি আজ এসো সৃজন। আমার সব ছেলেমানুষির সঙ্গী হওয়ার জন্য একটা পুরস্কার দিতে চাই তোমায়। এই নাও, এটা আমার ডায়রি। সময় পেলেই এতে হাবিজাবি লিখে ভরিয়েছি। পড়ে তোমার অভ্যস্ত ঢঙে প্রশংসা করো।'

সৃজন আজ কথা বলতে পারল না। বুঝতে পারল, হয় ওর মা নয়তো কোনো বন্ধু দীপশিখাকে জানিয়েছে এসব কথা। ওর আর অভিষিক্তার ব্রেকআপের কথা। তাই দীপশিখাবউদি এভাবে ওর মুখের সামনে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

প্রায় সপ্তাহখানেক হয়ে গেল, সৃজন যায় না দীপশিখার বাড়িতে। ছাদে উঠে দেখেছিল সন্ধেবেলা, বাড়িটা অন্ধকার। বুঝেছিল নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় বউদি। অভিষিক্তা ফোন করেছিল। টুকটাক কথা হয়েছে। কিন্তু কেন কে জানে, মনটা ভালো নেই সৃজনের। অভিষিক্তার সঙ্গে কথা বলতে বা দেখা করতেও ইচ্ছে করছে না ওর। শুধুই মনে হচ্ছে, অভিষিক্তার অকারণ সন্দেহের বশে একজন ভালো বন্ধুকে ও হারিয়ে ফেলল। সৃজনও কি ভালোবাসত দীপশিখাকে? হয়তো বাসত। সে ভালোবাসার সংজ্ঞা আলাদা। গড়পড়তা দুইয়ে দুইয়ে চার করে মিলিয়ে দেওয়া ভালোবাসা নয়। একজন বন্ধুহীন মানুষের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করতে করতে কবে যেন দীপশিখাও বন্ধু হয়ে গিয়েছিল সৃজনের। তাই আজ এত শূন্যতা।

ভোরবেলায় হাঁকডাকে ঘুম ভেঙে গেল সৃজনের। মা এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলতেই মা বলল, 'অনীক ডাকছে তোকে। দীপশিখা বোধহয় খুব অসুস্থ।'

কোনোমতে প্যান্টের ওপরে গেঞ্জিটা চাপিয়ে ছুটেছিল সৃজন। বাড়িতে ঢোকার আগেই দেখল বাড়ির সামনে দু-একজনের ভিড়। সৃজন ঢুকতেই অনীক প্রায় আর্তনাদ করে বলল, 'সৃজন তোর বউদি আমায় মুক্তি দিয়ে চলে গেল। ভোরের দিকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। এদিকে গোটা বাড়িতে ইনহেলার খুঁজে পেলাম না। হার্টফেল করল জানিস।'

চমকে উঠল সৃজন। সেদিনই তো ও ওষুধের দোকান থেকে দুটো ইনহেলার কিনেছিল। এত তাড়াতাড়ি তো শেষ হওয়ার কথা নয়।

ডাক্তার এসেও বলে গেলেন, 'হার্টফেল করেছেন।'

ঠিক যেমন করে ওরা অনীকদার বিয়েতে গিয়েছিল, সেভাবেই দীপশিখাবউদিকে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল ক্লাবের ছেলেরা। সৃজন শুধু যায়নি। যেতে পারেনি।

দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, ইনহেলার দুটো নীচে বেলফুলের গাছতলার কাছে পড়ে আছে। তার মানে দীপশিখা নিজেই ফেলে দিয়েছিল। হাতে তুলে দেখেছিল, ভর্তি রয়েছে। তবে কি দীপশিখা বৌদির দক্ষিণের জানালাটা বন্ধ হয়ে যেতেই বাঁচার শেষ ইচ্ছেটুকু চলে গিয়েছিল? তাই এভাবে চলে গেল?

বাড়ি ফিরে এসেছিল। অনীকদা বিলাপ করছিল, 'আরেকটু যদি যত্ন করতাম!' সৃজনের বলতে ইচ্ছে করছিল, 'কোনোদিন মানুষটার মনের খবর নিয়েছ অনীকদা? মানুষটা কীসে খুশি হত, কীসে দুঃখ পেত, জানো তুমি? তিন বছরের জন্য অতিথি হয়ে যে মানুষটা তোমার বাড়িতে থেকে গেল, তার প্রিয় রং কী সেটুকুও তো জানো না তুমি!'

এই সমস্ত কথা বলা হল না কিছুই। কারণ দীপশিখা ভালোবাসত অনীকদাকে। বাড়ি ফিরে এসে দেখল, অভিষিক্তা বসে আছে। ওকে দেখেই কেঁদে ফেলল। বলল, 'সরি সৃজন। আমি জানতাম না উনি এতটা অসুস্থ ছিলেন। আমায় তোমাদের পাড়ার দুজন ভুলভাল বুঝিয়েছিল, তাই আমি মাথা গরম করে ফেলেছিলাম। তুমি শ্মশানে গেলে না?'

সৃজন বলল, 'নিজের খুব প্রিয় মানুষকে শেষ হতে দেখতে পারব না বলেই যাইনি অভিষিক্তা। আসলে আমাদের সম্পর্কটা যে ঠিক কী ছিল, সেটা বোধহয় আমরাও জানতাম না। কখনও মনে হত আমি ওর ভালো বন্ধু। কখনও মনে হত আমি ওর ভাই। কখনও মনে হত আমি ওর আবদারের জায়গা, বায়নার জায়গা। শাসনে মনে হত আমার বড় দিদি। ঠিক

বুঝতে পারিনি। আসলে সব সম্পর্ককে একই সমীকরণে ফেলে হিসেব মিলিয়ে দিতে চাইলেই তো মেলে না। বউদি বলত, আমি ওর দক্ষিণের বারান্দা। ও নাকি আমার সঙ্গে বকবক করে গল্প বলার স্বাদ মেটায়। জানো অভিষিক্তা, বউদির ইচ্ছে ছিল তোমার আর আমার সঙ্গে একটা মুভি দেখতে যাওয়ার। ঠিক কলেজের মতো। হল না যাওয়া।'

অভিষিক্তা সৃজনের হাতটা ধরে বলল, 'ক্ষমা করো আমায় প্লিস।'

সৃজন বলল, 'না না দোষ তো তোমার নয়। আমিই হয়তো বোঝাতে পারিনি।'

সৃজন একলা ঘরে বসে দীপশিখার ডায়রিটা খুলল, কত টুকরো কবিতা লিখেছে দীপশিখা। কখনও কোনো বিশেষ দিনের ঘটনা। তাতে সৃজনও আছে।

সৃজন বলল, 'কেন নিজে ইচ্ছে করে তুমি তোমার দক্ষিণের জানালাটা বন্ধ করে দিলে বউদি? লোকের কথায় এভাবে অভিমান করে চলে গেলে?'

দীপশিখা যেন দূর থেকে বলে উঠল, 'তুমিই আমার একমুঠো আকাশ ছিলে সৃজন। ভালোবাসি তোমায়।'

ভালোবাসার সংজ্ঞাটা আজও বোঝা হল না সৃজনের। দূর থেকে তাকিয়ে দেখল বাড়িটা অন্ধকার হয়ে রয়েছে। আর কেউ আলো জ্বালাবে না। বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসবে না সেই চেনা গানের লাইনগুলো।

'আঙুলের কোলে জ্বলে জোনাকি
জলে হারিয়েছি কান সোনা কি?
জানলায় গল্পেরা কথা মেঘ
যাও মেঘ চোখে রেখো এ আবেগ...'



পরাজয়

'রঞ্জন, ভালো বন্ধু আর প্রেমিকের মধ্যে যে বেসিক পার্থক্যটা আছে সেটা বোধহয় তুই জানিস না, তাই না রে?'

রঞ্জন একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'কীসের বন্ধু রে রোহিনী? আমরা কোনোকালে ক্লাসমেট ছিলাম না। তোর থেকে আমি আর শুভম দুজনেই বছর চারেকের বড়। তাই আমি তোর ঠিক সহপাঠী তো নই।'

রোহিনী ওর কাঁধের শান্তিনিকেতনী ব্যাগটা স্বস্থানে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আসলে কী জানিস রঞ্জন, অনেকেই এটা বুঝতে পারে না যে, প্রেম জোর করে হয় না। অনুভূতির কাছে আমরা নিজেরাও বড্ড অসহায়। বিশ্বাস কর, তোকে আমার ভালো বন্ধু মনে হয়। প্রেমিক হিসাবে কল্পনা করার ইচ্ছেও হয়নি কখনও। তুই নাটক আর বাস্তব জীবনটাকে একই সুতোয় গাঁথতে চেষ্টা করছিস। এটা হয় না রে। আমরা একসঙ্গে নাটক করেছিলাম মাত্র।'

রঞ্জন কাতর গলায় বলল, 'নাটকের নন্দিনী তো রঞ্জনকেই ভালোবাসত, এটা অস্বীকার করতে পারিস?'

রোহিনী হেসে বলল, 'পাগল। ওটা রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাই। তুই অরিজিনাল রঞ্জন হতে পারিস, আমি নন্দিনী নই। এনিওয়ে ট্রামে ফিরবি না বাসে?'

রঞ্জন বিরক্ত হয়ে বলল, 'ট্যাক্সিতে ফিরব। তুই নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে চাপবি না?'

রোহিনী হেসে বলল, 'একটু কাজ আছে, সেরে বাড়ি ফিরব। তাছাড়া তোর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। অকারণ ট্যাক্সি ভাড়া গুনবি কেন?'

রঞ্জন মুচকি হেসে ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলল, 'তুই বোধহয় ভুলে যাচ্ছিস আমি একটা সরকারি চাকরি করি এবং বেশ ভালো স্যালারি পাই। বামপন্থী ড্রামা ডিরেক্টর নই।'

রোহিনী কথা না বাড়িয়ে ট্রামের সিঁড়িতে পা দিল।

রঞ্জন ট্যাক্সিতে বসে একটা বিজবিজে আক্রোশে ট্যাক্সির সিটটা নিজেই নখ দিয়ে ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। রোহিনীর ছিপছিপে শরীর, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, আটপৌরে তাঁতের শাড়ি, আর কপালের মাঝে পরা কালচে মেরুন টিপটা চোখের সামনে ভাসছিল। ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কোনো চরিত্র। সৌন্দর্য আছে, কিন্তু তার আড়ম্বর নেই। ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে, কিন্তু তার উগ্রতা নেই। ঠিক এমন একজনকেই যেন সেই কবে থেকে খুঁজে আসছিল রঞ্জন। শুধু বেশভূষায় আধুনিক নয়, মননেও ভীষণ রকমের আধুনিক রোহিনীকেই যেন এতকাল খুঁজছিল ওর মন। আর এখন সামনে পেয়েও, নিজের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেও, কিছুতেই রোহিনীর প্রেমিক হতে পারল না। অদ্ভুতভাবে ওকে 'বন্ধু স্থানীয়' করে রেখে দিল রোহিনী। হয়তো রোহিনী ওর হতে পারত, যদি ওই ট্যালেন্টেড ডিরেক্টর শুভম মুখার্জী রোহিনীর মন জুড়ে বসবাস না করত।

শুভমের বড্ড গুণ। শুভম খালি গলায় দুর্দান্ত গান গায়, কবিতা বলে উদাত্ত কণ্ঠে, আচমকা কাগজ টেনে নিয়ে লিখে ফেলে দু'লাইন কবিতা বা মুক্ত গদ্য। অথবা আনমনে এঁকে ফেলে রোহিনীর চোখ দুটো। আর স্টেজে উঠে মাইক পেলে তো একাই উত্তেজিত করে তোলে দর্শকদের, ওর প্রতিবাদী বক্তব্য দিয়ে। এত এত গুণের অধিকারী শুভম নাকি জীবন সম্পর্কে বড্ড এলোমেলো। মেয়েদের আবার এই এলোমেলো টাইপ ছেলেগুলোকেই পছন্দ হয়। রঞ্জনকে ভোরবেলা ফোন করে ডেকে দেয় না ওর কোনো প্রেমিকা। এমনকী অ্যালার্মও দিতে হয় না ওকে। ওর মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা রুটিন সেট হয়ে আছে। ও জানে ওকে ভোর ভোর উঠতে হবে। নিজের বিছানাপত্র গুছিয়ে, এককাপ চা খেয়েই বাজারে যেতে হবে। বাজারে যেতে দেরি হলে ওর মেড চলে যাবে ফিরে। ফলে ওর সেদিনের রান্না হবে না। মেড রান্না করে দিয়ে গেলে নিজেই জল ভরে, টিফিন ভরে, আয়রন করা জামা-প্যান্ট পরে ঢুকতে হবে অফিসে। যেহেতু ব্যাঙ্ক-এ চাকরি করে ও, তাই ঘাড় তোলার সময় খুব কমই পায়। বাবা-মা দেশের বাড়িতে থাকেন। এখানে রেন্টের ফ্ল্যাটে ও একা থাকে। ফ্ল্যাট একটা বুক করেছে, কিন্তু সেটা হ্যান্ডওভার হতে হতে এখনও এক বছর। তার আগে যদি কোনো বাড়ি পায়, নিয়ে নেবে। বাড়িই ভালো লাগে ওর বেশি। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে এসে রঞ্জন কিছু কম অ্যাচিভ করেনি। অন্তত লোকের কাছে সিগারেট খাওয়ার টাকা চাইতে হয় না শুভমের মতো।

মায়ের পেনশনের টাকায় শুভমদের সংসার চলে। গোটা দুই চাকরিতে ঢুকেছিল শুভম। কারণ ফিজিক্সে এমএসসি করা শুভমের যোগ্যতা নিয়ে কোনো কথা হবে না। কিন্তু দুটো চাকরিতেই নাকি ওর বাক্‌স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে বলে চাকরির মুখে লাথি মেরে সেই স্বাধীনচেতা পুরুষ বেরিয়ে এসেছেন। এসব গল্পগুলোই রোহিনী মুগ্ধতা নিয়ে শোনে। আর রঞ্জনকে

বলে, 'আসলে কী জানিস, শুভম অন্য ধাতুতে গড়া। ও ঠিক ভেতো বাঙালির মতো নয়। ওই দশটা-পাঁচটার অফিস কি ওকে মানায়? আসলে যারা ক্রিয়েটিভ জগতের মানুষ হয়, তারা আর পাঁচজনের থেকে একটু হলেও আলাদা হয়। সেই কারণেই সবাই তাদের বুঝতে পারে না।'

রোহিনীর মুখে শুভমের সম্পর্কে এমন প্রশ্রয় শুনতে শুনতে কবে যে শুভমকে হিংসা করতে শুরু করেছিল রঞ্জন নিজেও বুঝতে পারেনি। অথচ শুভমের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বটা বেশ গভীরই ছিল। শুভমের ট্যালেন্ট নিয়ে রঞ্জনেরও যথেষ্ট গর্ব ছিল এতদিন। শুভমের সঙ্গে ওর পরিচয়টা আজও মনে আছে রঞ্জনের। তখন ও এই ব্যাঙ্ক-এর ব্রাঞ্চে নতুন ঢুকেছে। একটি ছেলে তার মাকে নিয়ে এসেছে পেনশন তুলতে। সোমবারের সকালে লাইন মন্দ নয়। কাউন্টারের ভিতর থেকেই রঞ্জন লক্ষ করেছিল লাইনে দাঁড়িয়ে ছেলেটি বারবার ওকে দেখছে আর হাতের কাগজে কিছু একটা লিখছে। অস্বস্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল রঞ্জন। কিন্তু একজনের পর একজন কাস্টমার আসার কারণে রঞ্জন কাউন্টার থেকে উঠতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা তার মাকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল রঞ্জনের কাউন্টারে। আচমকা প্রশ্ন করেছিল, 'এমন ফটোজনিক ফেস নিয়ে ব্যাঙ্কে কেন ভাই? এনিওয়ে, এই যে এটা রেখে গেলাম। পিছনে আমার ফোন নম্বর লেখা থাকল, যদি মনে হয় জীবনে মাঝে মাঝে পাগলামি করা একান্ত প্রয়োজন, তাহলে যোগাযোগ করবেন।'

মায়ের কাজ মিটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ছেলেটা। ওর কথা বলার ধরণে কিছু একটা ছিল যেটা ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল রঞ্জনকে। কাগজটা খুলে দেখেছিল, ওর নিখুঁত একটা পেন্টিং, তাও পেন দিয়ে। নীচে লেখা, 'নাটকে নায়কের চরিত্রে আপনাকে ভেবেছি। যদি রাজি থাকেন প্লিস কল মি।'

রঞ্জন ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে ফোন করেছিল ছেলেটাকে। বলেছিল, 'থ্যাঙ্কস আমার এমন একটা সুন্দর ছবি এঁকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমি আবৃত্তি বলতে ওই স্কুলে বারদুয়েক স্টেজে উঠেছিলাম। নাটক করার তো অভ্যেস নেই।'

ছেলেটা বলল, 'আমি শুভম, শুভম মুখার্জী। আমি চ্যালেঞ্জ লড়তে পারি আপনাকে দিয়ে আমি নাটক করাবই।'

রঞ্জনের বেশ মজা লাগছিল এমন আধপাগলা, জগৎ বহির্ভূত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে। সাধারণ একঘেয়ে অফিস আর পরিচিত মানুষের গণ্ডিতে সেই কিছু চেনা মুখের কেজো প্রশ্নের ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে আসছিল রঞ্জনের। এমন বেহিসেবি অথচ আত্মবিশ্বাসী কথা ও শুনেছিল সেই স্কুল লাইফে ওর লাইফ-সায়েন্স স্যারের মুখে। জীবনবিজ্ঞান সাবজেক্টটাকে যখন ও রীতিমতো ভয় পেতে শুরু করেছিল, যখন নিজের অজান্তেই ওই বইটাকে লুকিয়ে রাখছিল সব বইয়ের নীচে, ঠিক তখনই দেখা হয়েছিল বিনোদ স্যারের সঙ্গে। বিনোদ স্যার রঞ্জনকে বলেছিলেন, 'আমি যদি তোকে জীবনবিজ্ঞানের প্রেমে ফেলতে না পারি, তাহলে শিক্ষকতাই ছেড়ে দেব।' স্যারের এই আত্মবিশ্বাসই রঞ্জনের লাইফ-সায়েন্সের ভীতি কাটিয়ে দিয়েছিল।

শুভম বলল, 'এ পৃথিবীতে আমাদের সকলের সময় বড্ড অল্প রঞ্জন। ক'টা দিনই বা আমরা জঙ্গলে হাঁটতে পারব? ক'টা দিনই বা চাঁদকে মনখারাপের সঙ্গী ভাবতে পারব? কতদিনই বা রবীন্দ্রনাথকে নিজের সব সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারব? সময় নেই বুঝলেন রঞ্জন, সময় নেই। তাই যা করতে হবে এইবেলা করে ফেলতে হবে। নিজেকে নিজের কাছে প্রমাণ করে নিতে হবে তাড়াতাড়ি। না হলে চন্দনকাঠের চিতায় শুয়ে শুয়ে আফসোস করতে হবে। আপনি যদি আমার নাটকের দলে যোগ দেন, তাহলে আমি আপনাকে টাকা হয়তো দিতে পারব না, কিন্তু একঝাঁক

জোনাকির জগৎ দেব। উঁহু, হ্যালোজেনের তীব্রতা নেই সেখানে, বরং নরম আলোয় স্নান করে নিতে পারবেন এই স্বল্প সময়ের জীবনে।’

রঞ্জন বলেছিল, ‘শনি আর রবি দু’দিন যেতে পারব আমি রিহার্সালে, এতে চলবে?’

শুভম হাসতে হাসতে বলেছিল, ‘দৌড়াবে।’

শুভমের দোতলা বাড়ির একতলায় ওর নাটকের মহড়া চলে। ওর বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ভালো চাকরি করতেন। তাই দক্ষিণ কলকাতার মতো জায়গায় দোতলা বাড়ি তুলেছিলেন। শুভম যখন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে, তখন ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে বাবাকে হারায় শুভম। ওর মা পেনশন পেলেও সেই আতিশয্য থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় ওদের পরিবার। ওর মায়ের পেনশনের টাকায় টলোমলো করে চলে যাচ্ছিল দুজনের সংসারটা। কিন্তু কক্ষচ্যুত পৃথিবীর মতোই শুভম চলছিল ওর বানানো নিজস্ব গতিপথ ধরে। তাই সমাজের সবকিছুর সঙ্গেই ওর অনবরত সংঘর্ষ বেধে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজেকে পরিবর্তন না করে ও নিজের চারপাশে থাকা মানুষগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগে গেল। পড়াশোনায় ভালো, ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করা মানেই দশটা-পাঁচটার চাকরি জয়েন করার ধারণাটাই নাকি ভুল। মানুষ দু’দিন না খেয়েও কাটাতে পারে অভাবে পড়লে, কিন্তু শিল্পীদের মৃত্যু তখনই হয় যখন তাঁরা ধরাবাঁধা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এসব তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই ‘ঘরে বাইরে’ নাটকের দলটা তৈরি করে ফেলেছিল ও। এই দলটাতে মূলত অ্যামেচার আর্টিস্টরা কাজ করে, যাদের রোজগারের অন্য পথ আছে। যারা শুধুই একঘেয়েমি কাটাতে, আর নিজেকে শিল্পী হিসেবে দেখতে চায় তারাই আসত শুভমের ‘ঘরে বাইরে’ নাটকের দলে। তা নয় নয় করে প্রায় পঁচিশ জনের একটা দল গড়ে ফেলেছিল শুভম।

রঞ্জন যখন কসবা রথতলায় শুভমদের বাড়িটাতে পৌঁছাল, তখন শুভম হাতে একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে ঘনঘন মাথা নেড়ে চলেছে। বড় হলঘরে ঢুকেই রঞ্জনের দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল যার ওপরে, সে রোহিনী। রঞ্জন সেই মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল রোহিনীর কপাল জুড়ে রাজত্ব করা নীলচে টিপটাতে। হিংসে হয়েছিল ওর চোখের ঘন কাজলটাকে।

শুভম রঞ্জনকে দেখেই উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল, 'এই যে, আরেকজনকে পেয়েছি যার রক্তে নাটক বিরাজ করে। তাই এক ডাকে ছুটে এসেছেন। এসো, এসো রঞ্জন, এসো। আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম। তুমিও 'ঘরে বাইরে'-র মেম্বার হলে।'

রঞ্জন অপলক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল রোহিনীর দিকে। বারংবার মনে হচ্ছিল ঠিক এমনই কাউকে ও খুঁজে যাচ্ছিল এতদিন ধরে। হাজার বছর ধরে যেন এরই অপেক্ষায় ছিল রঞ্জন। শুভম সকলের সঙ্গে রঞ্জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। রঞ্জন অপেক্ষায় ছিল ওই পেঁয়াজ খোসা আর নীলের রঙের ডোরার আটপৌরে শাড়ি পরা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মেয়েটার নাম জানার অপেক্ষায়। অবশেষে এল সেই মুহূর্ত।

শুভম বলল, 'ইনি হলেন মিস রোহিনী আচার্য। ইংলিশে বিএড কমপ্লিট করেছেন। পিএইচডি করবেন নাকি চাকরির হাতছানিতে সাড়া দেবেন এই দ্বিধায় দিন কাটাচ্ছেন। তবে 'ঘরে বাইরে'-র একজন মেম্বার। আগের নাটকে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, এবং বলাই বাহুল্য প্রশংসা অর্জন করেছেন নিজগুণে।'

রোহিনী অদ্ভুত মিষ্টি একটা ভঙ্গিমায় হাত জোড় করে নমস্কার করে বলল, 'রঞ্জনদা, শুভমের স্বভাব অন্যের প্রশংসা করা। তাই ওতে খুব বেশি পাত্তা দেবেন না।'

রঞ্জন হেসে বলেছিল, 'এ তো ঘোর অন্যায়। আমি শুভমের বন্ধু হলে আপনার দাদা কী করে হই রোহিনী? আমাকেও শুধু রঞ্জন বলেই ডাকবেন।'

শুভম বলেছিল, 'তাহলে আর দেরি কেন? আমাদের সামনে রঞ্জন রেডি, রবিঠাকুর 'রক্তকরবী' লিখে গেছেন। রোহিনীর নাম বদলে নন্দিনী করে দিতে আমার দু'মিনিট লাগবে। এই নববর্ষে 'ঘরে বাইরে'-র নিবেদন হোক — রক্তকরবী।'

রঞ্জন স্তম্ভিত হয়ে বলেছিল, 'আমার যে কোনো অভিজ্ঞতা নেই শুভম। একেবারে নায়ক? তারপরে আবার অমন বিদুষী নায়িকার বিপরীতে? এভাবে বিপাকে কি কেউ ফেলে?'

শুভম হেসে বলেছিল, 'শুভম মুখার্জী গাধা পিটিয়ে টাট্টু গড়তে পারে। এক রঞ্জনকে পিটিয়ে আরেক রঞ্জন গড়ে নিতে বেশি পরিশ্রম করতে লাগবে না আমার।'

শুভমের এই আত্মবিশ্বাস অনেকটা সাহস জুগিয়েছিল রঞ্জনকে। তাছাড়া রোহিনীর বিপরীতে অভিনয় করার উত্তেজনায় রঞ্জন বিভোর হয়ে ছিল। আচমকাই ওর ওই এককামরার ভাড়াটে জীবন, ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ার পদের একঘেয়ে কাজ, অন্যের টাকার ভ্যাপসা গন্ধ—সবকিছুর বিরক্তি উবে গিয়েছিল রোহিনী নামের উপস্থিতিতে।

সারা সপ্তাহ রঞ্জন অপেক্ষা করে থাকত কবে শুভমের বাড়ির ওই স্যাঁতস্যাঁতে হলঘরে রক্তকরবীর রিহার্সালের ফাঁকে রোহিনীকে অপলক দেখবে, আর কখনও অভিনয়ের সূত্রে ওর হাত ছুঁয়ে যাওয়ার মুহূর্তটুকুর জন্য। এইটুকুর জন্য রঞ্জন আজীবন অপেক্ষা করতে পারবে, এই বিশ্বাস ওর আছে। রঞ্জন বেশ বুঝতে পারছিল, রোহিনী ওর একটা অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে। শুধু প্রিয়জন নয়, প্রয়োজন হয়ে উঠছে ওর জীবনে।

মন-প্রাণ ঢেলে অভিনয় করার চেষ্টা করছিল রঞ্জন। শুভম ঠিক যেভাবে দেখাচ্ছিল, সেভাবেই আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিল। রোহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় হয়তো রঞ্জন কোনোদিনই করতে পারবে না। শুভমের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারবে না কোনোদিন, তবুও ওর সাধ্যমতো আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সিনের শেষে যখন রোহিনী এসে হাসি মুখে বলত, 'দেখ শুভম, রঞ্জনকে কিন্তু মনেই হচ্ছে না ও নতুন। রঞ্জন তুই দারুণ করছিস রে।'

ক'দিনের মধ্যেই রোহিনী ওকে ডিরেক্ট তুই বলে ডাকতে শুরু করেছে। রঞ্জনের 'তুই'তে একটু আপত্তি ছিল। 'তুমি'তেই রয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রোহিনী বলল, 'দেখ বস, তুই হয়তো একটু বড় আমার থেকে, হয়তো শুভমের বয়েসিই হবি, কিন্তু তুই বললে বেশ একটা বন্ধু বন্ধু ফিলিংস আসে। সব কথা শেয়ার করা যায় নির্দ্বিধায়।'

রঞ্জনও বাধ্য হয়েই রোহিনীকে তুই ডেকেছিল।

রঞ্জনের সব থেকে বিরক্তির বিষয় ছিল যখন রোহিনীর গলায় শুভমের প্রশংসা শুনত। রোহিনী আর শুভম যখন একসঙ্গে অভিনয় করছিল, রঞ্জন দেখেছিল, এরা মেড ফর ইচ আদার। তারপর থেকেই তীব্র রাগ হচ্ছিল শুভমের উপর। বারবার মনে হচ্ছিল, ও কেন শুভমের মতো নয়? কেন নয়? শুভম কেন এতটা ব্যতিক্রমী হল?

একদিন রিহার্সাল থেকে ফেরার পথে রোহিনীর মনে শুভম সম্পর্কে একটু বিরক্তি ঢোকানোর জন্যই রঞ্জন বলেছিল, 'রোহিনী, তোর কখনও মনে হয় না শুভমের একটা চাকরি করা দরকার? মানে এই বয়সের একটা ছেলে বাড়িতে বসে বসে মায়ের পেনশনের টাকায় খাচ্ছে, মায়ের প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই ওর! বড্ড দৃষ্টিকটু লাগে, তাই না রে? শুভম এত পড়াশোনা শিখে শেষে এই ফ্রি-র নাটকের ডিরেক্টর হয়ে জীবন কাটাবে?

কোনো মেয়েই তো ওকে বিয়ে করবে না। প্রেমে হয়তো পড়তে পারে কেউ, কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিয়ে কেউ করবে না, বুঝলি?'

রোহিনী রাস্তার মাঝেই একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর কপালে উড়ে আসা অবাধ্য চুলের গোছাকে সরিয়ে আবারও টিপটাকে প্রকাশ্যে এনে বলেছিল, 'শুভম তো চাকরি পেয়েছিল, জানিস না? কলেজের লেকচারার ছিল বছরখানেক। তারপর একদিন হাঁপিয়ে উঠল বুঝলি। ঠিক যেমন নীল আকাশের পাখিকে খাঁচায় ভরলে ছটফট করবে, ওরকম ছটফট করছিল শুভম। নাটক, কবিতা কিছুতেই মন দিতে পারছিল না ও। একদিন আমায় বলল, 'রোহিনী চাকরিটা কি আমি ছেড়ে দেব?'

বিশ্বাস কর রঞ্জন, ওর মুখের ওই অসহায়তা, কষ্ট দেখে আমার মনে হয়েছিল শুভম ভালো নেই। এভাবে চলতে থাকলে ও ক্ষয় হয়ে যাবে। ওর প্রতিভার মৃত্যু হবে। তাই আমিও বলেছিলাম, 'ছেড়ে দে।'

ও যেন আমার মুখ থেকে এই উত্তরটাই শুনতে চাইছিল। বাচ্চাদের মতো ভিড় রাস্তার মোড়ে জড়িয়ে ধরেছিল আমায়। তারপর বলেছিল, 'রোহিনী, আজ আমি আবার স্বাধীন হলাম। নিজের ইচ্ছের মালিক হলাম।'

রাগে রঞ্জনের ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গিয়েছিল। শুভম রোহিনীকে জড়িয়ে ধরার অধিকার পেয়েছে। রোহিনী যতবার শুভম নামটা উচ্চারণ করছে ততবার যেন আলতো করে একটু নরম যত্ন ছড়িয়ে দিচ্ছে এই নামের মানুষটার ওপরে। অসহ্য রাগ হচ্ছিল রঞ্জনের। রোহিনীর চোখে শুভমের প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত প্রশ্রয় দেখতে দেখতে রঞ্জনের মনে শুভম সম্পর্কে যে ভালোলাগাটা ছিল, সেটা ক্রমশ আক্রোশে পরিণত হতে লাগল।

তার মানে কি ও আসার আগেই শুভম আর রোহিনীর মধ্যে দানা বেঁধেছে সম্পর্কের বীজ? কারণ রোহিনী 'ঘরে বাইরে'-তে আছে জন্মলগ্ন থেকে।

রঞ্জন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তোর সঙ্গে শুভমের আলাপ হয়েছিল কী করে?'

রোহিনীর গালে বোধহয় শেষ বসন্তের একমুঠো আবীর এসে পড়ল। আনমনে হাসল যেন। ঠোঁটের কোণে অনেক কথার ভিড়। চোখে পুরোনো দিনে ফিরে যাওয়ার তাড়া। স্বপ্নিল গলায় বলল, 'মেট্রোতে দেখা। আমি ডুবে ছিলাম 'শেষের কবিতার' নিবারণ চক্রবর্তীতে। শুভম আমার পাশের সিটে ছিল। আচমকাই বলে উঠেছিল, 'যদি নিবারণ চক্রবর্তী কবিতা না লিখে ফুটবল খেলত, তাহলে কি সুন্দরী মহিলারা তাকে বুকে জড়িয়ে বসে থাকত?'

আমি চমকে উঠে তাকাতেই বলেছিল, 'কাকে বেশি ভালো লাগে অমিত না নিবারণ? îûÄy!þ›'þ ফায়ার রাউন্ড। কুইক।' ওর বলার ধরণে কিছু একটা ছিল। তাই অপরিচিত কারোর কথায় আমি উত্তর দিতে শুরু করলাম। বললাম, 'অমিতকে দশ দিলে নিবারণকে এগারো দেব দশে।'

পরের প্রশ্ন, 'লাবণ্যর জন্য কে পারফেক্ট, অমিত না শোভনলাল?'

আমি বলেছিলাম, 'শোভনলাল।'

'শিলং পাহাড়ের বদলে কাশ্মীরের কমলালেবু আনতে গেলে কি অমিতকে বেশি মানাত?'

আমি একটুও দেরি না করে বলেছিলাম, 'উঁহু, শিলং পাহাড় পারফেক্ট।'

এরপরেই শুভম বলেছিল, 'কেন অমিতের থেকে নিবারণ বেশি নম্বর পেল?'

আমি বলেছিলাম, 'বাহ্ রে। এত ভালো কবিতা লেখে যে।'

শুভম বলল, 'আমি হলে অমিতকে দিতাম। কেন জানেন? নিজেকে গোপন রাখার ক্ষমতার জন্য। না, লাবণ্যর জীবনে শোভনলাল পারফেক্ট নয়। অমিত পারফেক্ট ছিল। তর্ক যুদ্ধ না হলে প্রেম কীসের? বুদ্ধির গোড়ায় জল

দেবে কে? শোভন পাহাড়ের মতো গম্ভীর। লাবণ্যর গাম্ভীর্যকে তাই স্পর্শ করতেই পারেনি। আর তৃতীয়টা? অবশ্যই শিলং পাহাড়। নিস্তব্ধতাই যার সৌন্দর্য।'

নিজের ফোন নম্বর দিয়ে নেমে গিয়েছিল শুভম। যাওয়ার আগে বলেছিল, 'তাহলে নিবারণ ফুটবল খেললে তাকে ভালোবাসতেন না তো? তার মানে যার যেটা কাজ তার সেটাই করা উচিত। আপনার কাজটা আপনি এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ফোনে। আপনার আসল জায়গাটা আমি খুঁজে দেব আপনাকে। যদি মনে করেন অসম্ভব স্পর্ধা, তাহলে ভুলে যাবেন এই পনেরো মিনিট।'

তারপরেই আমি হাজির হয়েছিলাম শুভমের বাড়িতে। তখন 'ঘরে বাইরে'-র মেম্বার মাত্র চারজন। আমায় শুভম আমার আসল কাজ খুঁজে দিল, বিনাপয়সায় নাটক করা। তাই এখনও করছি।' হো-হো করে প্রশ্রয়ের হাসি হেসেছিল রোহিনী।

রঞ্জনের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল একটা আট চাকার লরি। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল লরিটা রঞ্জনকে পিষে দিয়ে যাক। রোহিনীর এই প্রশ্রয় মিশ্রিত হাসি, শুভমের নামটাকে আলতো করে মনকুঠুরিতে ভরে তালা দিয়ে দেওয়া, এগুলো আর সহ্য হচ্ছিল না ওর। দিশাহারা লাগছিল।

রঞ্জন নিজের অস্থিরতা কোনোভাবে প্রশমিত করে বলল, 'শুভম জানে তুই ওকে এত ভালোবাসিস? নাকি শুভমের সেটুকু খেয়ালও নেই? দেখ রোহিনী, নাটক আমরাও করছি। তাই বলে শুভমের মতো বাকি সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। একটা সামঞ্জস্য তো দরকার জীবনে। যাকে বলে প্রপার ব্যালেন্স।'

রোহিনী কলকাতার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হো-হো করে হেসেছিল রঞ্জনের কথায়। রঞ্জন একটু ভয় পেয়েই গিয়েছিল। এসব কথা যদি রোহিনী

শুভমকে বলে দেয়! কাল থেকে যদি রঞ্জন রক্তকরবীর রঞ্জনের ভূমিকা থেকে বাদ পড়ে যায়, তখন কী হবে? রোহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের এই সামান্য সুতোটুকুও তো ছিঁড়ে যাবে। তাই তাড়াহুড়ো করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'না...মানে, তোদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বললাম আরকি। তোদের দুজনকেই যেহেতু পছন্দ করি তাই।'

রোহিনী এমনভাবে তাকাল, যেন রঞ্জনের ভিতরটা অবধি দেখতে পেল। রঞ্জনের মুখের কৃত্রিম হাসিতে কিছুতেই যেন রোহিনীকে নিজের করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটাকে চাপা দিতে পারল না ও।

রোহিনী স্বভাবিক গলায় বলল, 'শুভম সামঞ্জস্য করতে পারে না বলেই, যেটা করে সেটা নিখুঁত করে। তারপরে আর কোনো প্রশ্ন চিহ্নের অবতারণা ঘটে না। আর আমরা এদিক-ওদিক ব্যালেন্স করতে গিয়ে সবকিছুতেই মধ্যমমানের নম্বর পাই, তাই না রঞ্জন?'

রঞ্জন বলল, 'কিন্তু তুই তো এই নাটকটা দুর্ধর্ষ করছিস।'

রোহিনী কয়েক পা চুপচাপ হেঁটে বলেছিল, 'সে তো শুভম শেখাচ্ছে বলে। তোতাপাখির আর কী ক্রেডিট বল দেখি!'

শুভমের প্রশংসা শুনতে শুনতে ক্লান্ত রঞ্জন বাসের পা-দানিতে পা দিয়ে হাত নেড়েছিল রোহিনীকে।

বাসটা এগোচ্ছিল। রঞ্জন দেখতে পাচ্ছিল রোহিনী দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ, আরও বেশি করে শুভমের হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিটা রাতে ঘুমের মধ্যেও ছটফট করে রঞ্জন। বারংবার মনে হয় শুভমের মতো একটা চাকরিবাকরি নেই, বেকার ছেলের কাছে হেরে যাবে ও? সরকারি চাকরি করে রঞ্জন, তারপরেও হেরে যাবে! রোহিনী হচ্ছে সেই মেয়ে যার অবয়ব আঁকা ছিল ওর মনের গভীরে। তাকে এতটা কাছে পেয়েও নিজের করে পাবে না ভাবলেই অসহ্য কষ্টে ভেঙেচুরে যাচ্ছে রঞ্জন।

'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হওয়ার দিন এগিয়ে আসছে। শুভম দিনরাত এক করে খেটে চলেছে। ব্যানার বানানো, আমন্ত্রণ পত্র রেডি করা থেকে মধুসূদন মঞ্চ বুক করা। রঞ্জন জানে, ওর সঙ্গে এসব কাজে রোহিনীও যায়। রঞ্জনের অফিস আছে। ওর পক্ষে ব্যাঙ্কে চাকরি করে এসব দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়।

কাউন্টারে বসে অন্যমনস্ক হয়ে যায় রঞ্জন। বাইরের রোদের দিকে তাকিয়ে ভাবে, শুভম নিশ্চয়ই রোহিনীকে রোদে রোদে হাঁটাচ্ছে। পকেটে তো পয়সা নেই তাই ট্যাক্সি করবে না। আর রোহিনীর বাবার যত টাকাই থাকুক রোহিনী শুভমের সঙ্গে পা মেলাতেই পছন্দ করে। ওরা কি কাজের মাঝে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কুলফি খাচ্ছে আর হাসছে? নাকি আনমনে দুজনে হেঁটে চলেছে পাশাপাশি। দুজনের কাঁধ দুজনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে বেখেয়ালে? নাহ্, এভাবে চলতে পারে না। রঞ্জন পাগল হয়ে যাবে। এর থেকে রক্তকরবীর শেষ দিনে ও প্রপারলি প্রোপোজ করবে রোহিনীকে। শুভম ভালোবাসার, আগলে রাখার, যত্নের কী বোঝে? ও তো দিনরাত শিল্পের পিছনে ছুটছে। ও কেমন করে রোহিনীকে পেতে পারে! রোহিনীকে ভালো রাখার যোগ্যতা নেই শুভমের। থাকতে পারে না। শুধু নাটক-কবিতা দিয়ে পেট চলে না। শুভম কিছুতেই রোহিনীকে ডিজার্ভ করে না।

নাটকের দিন যত এগিয়ে আসছে সকলের মধ্যে উত্তেজনা তত বাড়ছে। অ্যামেচার গ্রুপের নাটক হলেও ভালো পারফরমেন্স দেওয়াটা খুব জরুরি। তাহলেই ওরা পরে কল শো পাবে। 'ঘরে বাইরে' নাম করবে। এসব ভাবনা শুভম সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছে।

নাটকের ঠিক আগের দিন শুভম হঠাৎই বলল, 'রঞ্জন, চল একটু চা খেয়ে আসি তুই আর আমি। মাথাটা ফ্রেশ হওয়া দরকার।'

রঞ্জন আর শুভম চা হাতে আগামীকালের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করছিল। শুভমের ভাবনায় এখন শুধুই রক্তকরবী।

রঞ্জন বলল, 'ভালোবাসিস কাউকে?'

শুভম হেসে বলল, 'বাসি তো। এই যে "ঘরে বাইরে" আমার প্রথম ভালোবাসা।'

রঞ্জন বলল, 'সেটা জানি। আমি কোনো মেয়ের কথা বলছিলাম। আমায় বলতে পারিস বন্ধু হিসাবে।'

একটু এলোমেলো কথা বলে কথাটা ঘোরানোর চেষ্টা করছিল শুভম। রঞ্জন আবার বলল, 'ভালোবাসিস রোহিনীকে?'

শুভম চায়ের ভাঁড়টা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'আওয়াজ শুনতে পেলি ভাঁড়টা পড়ার?'

রঞ্জন ঘাড় নেড়ে বলল, 'না পাইনি।'

শুভম অন্যমনস্কভাবে বলল, 'কিন্তু আমার হাতে যেহেতু ভাঁড়টা নেই, তাই ওটা যে ফেললাম সেটা নিশ্চিত, তাই না? সবকিছুর আওয়াজ পাওয়া যায় না, বুঝলি। চল, কালকে ভালো করে নাটকটা উতরে আমায় তোরা উদ্ধার কর মেরে বাপ। তোদের টেনশনে ঘুম উড়ে গেছে আমার।'

রঞ্জন বলল, 'তাহলে রঞ্জনের চরিত্রটা আমায় কেন দিলি? রোহিনী যখন নন্দিনী, তখন শুভমের তো রঞ্জন হওয়া দরকার ছিল, তাই না?'

শুভম হো-হো করে হেসে বলেছিল, 'সমুদ্রকে তুই বালির বাঁধ দিয়ে আটকাতে চেষ্টা করতেই পারিস, সেটা তোর ইচ্ছে। সমুদ্র সে বাঁধ ধুয়ে-মুছে দেবে, সেটাও নিশ্চিত। মানুষের মনকে যে আগলে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে তার মতো বোকা খুব কম আছে। রোহিনী খোলা আকাশে ঘুরুক। যদি ওর ক্লান্ত লাগে, যদি কখনও বিশ্রাম নেবে বলে কোনো গাছতলা খোঁজে আর সেটা যদি আমি হই তাহলে ও এমনই এসে জিরিয়ে নেবে আমার ছায়ায়। তার জন্য ওর কাছ থেকে আমি আকাশ কেড়ে নিতে পারি না রঞ্জন।'

রঞ্জন আরেকটু তৎপর হয়ে বলল, 'এই নাটকের কারণে তো আমি রোহিনীকে স্পর্শ করছি। তোর রাগ হচ্ছে না?'

শুভম মুচকি হেসে বলল, 'রঞ্জন স্পর্শ করছে রক্তকরবীর নন্দিনীকে। রোহিনীকে নয়। আর সব স্পর্শ ছোঁয়া হয় না রে পাগল। চল, অনেক কাজ বাকি এখনও। আমার প্রেম নিয়ে পরে একদিন আমরা দীর্ঘ আলোচনায় বসব।'

শুভম পা চালিয়ে চলে গিয়েছিল। রঞ্জন একলা দাঁড়িয়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণ।

শুভম আর রোহিনীর বন্ডিংটা এতটাই দৃঢ় মনের দিক থেকে যে, ওদের একে অপরকে 'ভালোবাসি' কথাটাও বোধহয় বলতে হয় না। সেটাও বোধহয় ওদের নিঃশ্বাসই জানিয়ে দেয় দুজন দুজনকে। দুজনেরই প্রবল শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস দুজনের প্রতি। এদের মাঝে পাঁচিল তৈরি করা কোনোদিন সম্ভব নয় রঞ্জনের পক্ষে। আবার রোহিনীকে ছেড়ে থাকাও অসম্ভব।

মধুসূদন মঞ্চের দর্শকাসন কানায় কানায় পূর্ণ। শুভমের মুখে দুশ্চিন্তা আর জয়ের একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি। কম টাকার টিকিট রেখেছিল শুভম, যেহেতু ওরা নতুন দল। কিন্তু সব টিকিট বুক হয়ে গেছে দেখে উত্তেজনা বাড়ছে সকলের মধ্যেই। গ্রিনরুমে ঢুকল শুভম। রঞ্জনের মেকআপ কমপ্লিট। রোহিনীর মেকআপ চলছে।

হঠাৎই শুভম খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'রোহিনী তুই এদিকে ঘুরে যা একবার। অরিজিনাল রক্তকরবীর মালা এনেছি নিউ মার্কেট থেকে। দাঁড়া তোর খোঁপায় লাগিয়ে দিই।'

রোহিনীর ঠোঁটে আবেশ। চোখে মুগ্ধতা। শুভম মালাটা খোঁপায় জড়িয়ে দিয়েই বলল, 'স্টেজ রেডি। সবাই রেডি তো?'

রঞ্জনের মনে হচ্ছিল এক টানে করবীর মালাটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে।

ওদের নাটক যে সফল হয়েছে তা দর্শকের উচ্ছ্বসিত করতালিই প্রমাণ করছে।

শুভম বেশ ক্লান্ত গলায় বলেছে, 'এবার কিছুদিন রেস্ট নেব। কবিতা লিখব রোহিনীর জন্য। রোহিনী আবৃত্তি করবে সেগুলো। আপাতত ছুটি নিলাম বন্ধুরা।'

রঞ্জন আর রোহিনীর দেখা হয়নি বহুদিন। শনিবার আর রবিবার সন্ধেগুলো বড্ড ফাঁকা লাগে রঞ্জনের। ওদের মঞ্চের ছবিগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল রঞ্জনের। তাই বাধ্য হয়েই রোহিনীকে ফোন করে আজ প্রায় দু'মাস পরে ডেকেছিল। রোহিনী বলেছিল, 'কেন রে? কোনো দরকার?'

রঞ্জন এলোমেলোভাবে উত্তর দিয়েছিল, 'বন্ধুরা বুঝি প্রয়োজন ছাড়া মিট করতে পারে না? একটা জিনিস দেখাব তোকে।'

সেই কারণেই আজ রোহিনী এসেছে রঞ্জনের কাছে। রঞ্জন বলল, 'একটা বাড়ি কিনেছি লোন নিয়ে। ছোট দোতলা বাড়ি। কিন্তু একটু রেনোভেট করা দরকার বুঝলি। ফ্ল্যাটও একটা বুক করা আছে। ওটা হাতে পেলে ভাড়া দিয়ে দেব। বাড়িই বেশি ভালো, বল? একটা নিজস্ব ছাদ থাকে।'

রোহিনী খুব খুশি হয়ে বলেছিল, 'পার্টি কবে দিবি?'

আর থাকতে না পেরে রঞ্জন বলেছিল, 'এই বাড়িটা কেন কিনলাম জানিস? এখানে আমাদের নতুন সংসার পাতব।'

রোহিনী হেসে বলেছিল, 'ওহ্, প্রেমে পড়েছিস বুঝি?'

রঞ্জন ভনিতা না করে বলেছিল, 'আমি তোকে ভালোবাসি রোহিনী। আমি তোর সঙ্গে ওই বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় একটা জোনাকি জ্বলা সন্ধে, একটা বৃষ্টিভেজা দুপুর কাটাতে চাই।'

এটা শোনার পরেই রোহিনী পরিষ্কার জানিয়েছিল, প্রেম নাকি জোর করে হয় না। এমনকী অনুভূতির ওপরেও জোর চলে না। মুখের ওপর সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল রোহিনী। নাটক আর বাস্তব জীবন নাকি এক নয়।

রঞ্জন ফিরছে ট্যাক্সিতে। অপমানের গভীর ক্ষতটা থেকে রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। রোহিনী আচমকাই পিএইচডি করবে না সিদ্ধান্ত নিয়ে স্কুলের চাকরি জয়েন করার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। শুভমকে আর্থিকভাবে সাপোর্ট করা হয়তো। অথবা একজন চাকরি করবে, আরেকজন বামপন্থী লেকচার ঝেড়ে নাটক করে বেড়াবে, এমনই প্ল্যান হয়তো। কোথায় কোন কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে নাকি মিটিং করছে শুভম। ভালো বক্তা হায়ার করে নিয়ে গেছে দল। সেটা আবার গর্বের সঙ্গে বলছিল রোহিনী।

নাহ্, আর ভেবে লাভ নেই। সিদ্ধান্ত আজকেই নিতে হবে রঞ্জনকে। শুভমকে ফোনটা করল ও।

'কোথায় আছিস রে? নাটক শেষ হয়ে যাবার পরে এতগুলো মাস তো খোঁজও নিলি না?'

শুভম ওর পরিচিত ভঙ্গিমায় বলল, 'তোরা আর কী বুঝবি শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট? মাসের শেষে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে, নিশ্চিন্ত জীবন।'

রঞ্জন বলল, 'চলে আয় কাল অথবা পরশু, সেলিব্রেট করব। আমি বাড়ি কিনেছি।'

শুভম বলল, 'এখন জোরদার মিটিং চলবে পরপর সাতদিন। তারপরে আসছি।'

ঠিক দিনছয়েক পরে শুভমকে আরেকবার ফোন করল রঞ্জন।

'কী রে, আজ আসবি?'

শুভম এককথায় রাজি।

শুভম হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকে বলল, 'কী ব্যাপার বস? আজ ফুটের চায়ের দোকান বাদ দিয়ে একেবারে বারে? আমি কিন্তু এসব খাই না।'

রঞ্জন হেসে বলেছিল, 'তুই এমন ভাব করছিস যেন আমি রেগুলার খাই! আরে জীবনে সব কিছু একবার অন্তত খেয়ে দেখা উচিত। এ তো তোর থিওরি শুভম।'

দুজনেই দু'পেগ করে খেল। শুভমের নেশা বেশ গাঢ় হয়েছে। সেটা ওর বুজে আসা চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। রঞ্জন নিজে লাইট ভদকা খেলেও শুভমের জন্য কড়া হুইস্কি অর্ডার করেছিল। অনভ্যস্ত শুভমের উঠে দাঁড়াতেও অসুবিধা হচ্ছিল।

রঞ্জন বলল, 'চল তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

শুভম টলোমলো পায়ে এগোচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। পিছনে রঞ্জন। আচমকাই একটা বীভৎস চিৎকারে স্তব্ধ হয়ে গেল 'ঘরে বাইরে' নাট্য সংস্থা। আট চাকার লরিটা পিষে দিয়ে গেল শুভমের শরীরটা। ভূতে পাওয়া মানুষের মতো ছুটে পালিয়ে গেল রঞ্জন।

ছোট্ট একটা ধাক্কা ও দিয়েছিল শুভমের পিঠে, তাতেই শুভম রাস্তায় গিয়ে পড়ল। আর তারপর জান্তব শব্দে লরিটা স্তব্ধ করে দিল ওর ব্যারিটোন ভয়েসকে।

নিরুপায় ছিল রঞ্জন। শুভম যতদিন এই পৃথিবীতে থাকবে ততদিন রোহিনী রঞ্জনের হবে না।

কোনোমতে টলতে টলতে নিজের ভাড়া ফ্ল্যাটের দরজা খুলল রঞ্জন। বাথরুমে গিয়ে অনেকটা বমি করল। জীবনের প্রথম খুনের উত্তেজনায় এখনও কাঁপছে ওর গোটা শরীর।

ভোরে রোহিনীর ফোনে ঘুম ভাঙল। কাঁপা গলায় রোহিনী বলল, 'একবার আসতে পারবি? থানায় যেতে হবে।'

রঞ্জন ভাগ্যিস কাল শুভমের ফোনটা থেকে নিজের লাস্ট কলের হিস্ট্রিটা মুছে দিয়েছিল। তাই থানা থেকে ডিরেক্ট ফোনটা ওর ফোনে আসেনি। রঞ্জন ঘুম জড়ানো গলায় বলেছিল, 'থানায় কেন রে?'

রোহিনী বুজে আসা গলায় বলল, 'বডি শনাক্ত করার জন্য।'

রঞ্জন বলল, 'কী সব বকছিস রোহিনী? কার কী হয়েছে একটু ক্লিয়ারলি বল প্লিস। এভাবে টেনশনে ফেলিস না।'

রোহিনী থমকে গিয়ে বলল, 'শুভম কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি। এখন ফোন এল শুভমের নম্বর থেকে। রিসিভ করতেই বলল, থানা থেকে বলছে। শুভম নাকি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তাই বডি শনাক্ত করার জন্য ডাকছে। একা একা যেতে ভয় করছে। তুই আসবি?'

রঞ্জন বলল, 'এত বাজে বকছিস কেন রোহিনী? এমনও তো হতে পরে কোনো চোর শুভমের মোবাইলটা চুরি করে ছুটছিল তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওটা শুভম হতে পারে না রোহিনী।'

রোহিনী বলল, 'কাল রাতে কাকিমা আমায় ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিল, শুভম কোথায়? ও নাকি বাড়ি ফেরেনি।'

রঞ্জন তবুও আশ্বাসের গলায় বলল, 'হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছে। কী সব শ্রমিক আন্দোলনে ধরনা দেবে বলছিল তো ক'দিন আগে ফোনে। ওখানে আটকে যেতেও তো পারে রে, রোহিনী। আগেই এমন ভাবিস না প্লিস।'

ভয় করছে রঞ্জনের। আয়নায় সামনে দাঁড়াল। রোহিনীর সঙ্গে থানায় যাবে ও। কিন্তু ওর মুখে-চোখে কি কোথায় কোনো অপরাধী বাসা বেঁধে আছে ঘাপটি মেরে? যদি রোহিনী ওর দৃষ্টি দিয়ে এক্স-রে করে ধরে ফেলে

রঞ্জনকে? তাহলে তো এত পরিশ্রম সব বৃথা যাবে। ঘৃণা করবে ওকে রোহিনী। জীবনে আর ওর মুখদর্শন করবে না। নিজেকে ভালো করে গুছিয়ে নিল রঞ্জন। অভিনয়টা ও মন্দ করে না, শুভমই সার্টিফিকেট দিয়েছিল। শুভম যখন অভিনয় শেখাত, তখন বারবার ওদের একটাই কথা বলত, 'তুই যেমন, ঠিক তেমন ভাবেই ডায়ালগগুলো থ্রো করবি। এমন কিছু অস্বাভাবিক করবি না যাতে সকলের মনে হয় তুই অভিনয় করছিস। যেমন ধর তুই কথা বলার সময় "ল" অক্ষরে একটু জোর দিস, ওটাই অরিজিনাল তুই। ওটাই তোর টেকনিক। যখন অভিনয় করবি তখনও একইভাবে কথা বলবি। অভিনয়ের সময় 'ল' অক্ষরে জোর দিবি না কোনোভাবে, এটা ভাবতে শুরু করলেই তোর অভিনয়ে কৃত্রিমতা আসতে বাধ্য। তাই তুই যা, ঠিক সেভাবে স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করবি। সকলে অরিজিনালিটির প্রেমে পড়বে।'

আজকেও রোহিনীর সামনে খুব বড় একটা একাঙ্ক নাটক অভিনীত হবে, যেটাতে নিখুঁত অভিনয় করতে হবে রঞ্জনকে। ভয়ে ভয়েই বেরোল রঞ্জন। শুনেছে মেয়েদের নাকি সিক্সথ সেন্স ভীষণ প্রখর হয়।

রোহিনী ওর জন্যই দাঁড়িয়ে আছে থানার সামনে। মুখের সেই সপ্রতিভ হাসি, গোছানো ভাবটাই যেন নেই। মুখে যেন অবসাদ ইচ্ছে করেই আঁকিবুঁকি কেটে দিচ্ছে। বিধ্বস্ত লাগছে রোহিনীকে।

রঞ্জন ট্যাক্সি থেকে নামতেই রোহনী ছুটে এসে রঞ্জনের হাত ধরল। কাঁপা গলায় বলল, 'ভিতরে শুভম নেই তো রে?'

রঞ্জন ওর হাতটা আলতো করে ধরে বলল, 'চল রোহিনী, আমরা ভিতরে যাই।'

থানায় ওটা শুভমের বডি শনাক্ত করে সইটা রঞ্জনই করল। কারণ রোহিনী পাথরের মতো স্থির। কোনো কথা বলছে না। পুলিশ জানাল, 'বডি

মর্গে যাবে। পোস্টমর্টেম হবে। তারপর সন্ধের দিকে বডি পাবেন। ফোন নম্বর রেখে যান, আমরা কল করে দেব।'

রঞ্জন নিজের ফোন নম্বর দিল থানায়।

শুভমের ক্ষতবিক্ষত শরীরটা দেখে কালকে ওর বলা কথাগুলো মনে পড়ছিল। রোহিনী শক্ত করে ধরে রয়েছে রঞ্জনের হাত। রঞ্জন বলল, 'ঘরে বাইরে'-র সবাইকে খবরটা দিতে হবে তো। আর শুভমের মাকে...'

রোহিনী ডুকরে কেঁদে উঠল এতক্ষণে। 'কাকিমাকে আমি কী বলব রে রঞ্জন? কত অল্পবয়সে স্বামীকে হারিয়েছেন। এখন আবার ছেলেকে। আমি পারব না কিছুতেই।'

রঞ্জন আর রোহিনী শুভমের বাড়িতে বসে আছে। শুভমের মা স্থির হয়ে বসে আছেন। আঘাত পেতে পেতে মহিলা বোধহয় কাঁদতেও ভুলে গেছেন। রোহিনী শুভমের দোতলার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। 'ঘরে বাইরে'-র প্রায় সবাই এসেছে। সবার সাহায্যেই শুভমের দেহ সৎকার মিটে গেছে।

রঞ্জন প্রায় মাঝরাতে বাড়ি ফিরে এসেছে। গা'টা কেমন যেন ছমছম করছে ওর। অপরাধবোধ ওকে ঘুমাতে দিচ্ছে না কিছুতেই। একটা রাতচরা পাখি তীব্র স্বরে ডেকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন শুভম চিৎকার করে সবাইকে বলে দিতে চাইছে, ও-ই খুনি।

শুভমের মৃত্যুর পর প্রায় মাসখানেক পেরিয়ে গেছে। এই একমাসে রঞ্জন বহুবার ফোন করেছে রোহিনীকে। প্রতিবারই শুভমের কথা আলোচনা করেই ফোনটা রেখে দিয়েছে রোহিনী। রঞ্জন যেন একমাত্র ব্যক্তি যে রোহিনী আর শুভম দুজনের বন্ধু ছিল। তাই শুভম কেন্দ্রিক যত স্মৃতির পসরা, রোহিনী রঞ্জনের সামনেই খুলে বসে।

রঞ্জন রোহিনীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্যই ওকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়া, নাটক দেখতে যাওয়া, বা ওর নতুন বাড়ির জন্য শপিং করতে যাওয়া এগুলো করছে। রোহিনীর বাবা-মায়ের রঞ্জনকে বেশ পছন্দ, সেটা ওঁদের ব্যবহারেই বোঝা যায়। রোহিনীর মা তো একদিন বলেই ফেললেন, 'ভাগ্যিস তুমি ছিলে রঞ্জন নাহলে শুভমের মৃত্যুর পরে রোহিনী যেভাবে চুপ করে গিয়েছিল আমরা তো ভেবেছিলাম, বোধহয় আমাদের সেই আগের রোহিনীকে আর খুঁজেই পাব না।'

রোহিনীর বাড়িতে এখন অবাধ যাতায়াত রঞ্জনের। কিন্তু রোহিনীর মনের দরজায় সেই বড় সাইজের তালাটা ঝোলানোই আছে। যেটার চাবি নিয়ে শুভম স্বর্গে চলে গেছে। রোহিনীরও কোনো ইচ্ছে নেই ওই তালাটার আরেকটা ডুপ্লিকেট চাবি বানানোর। যেন মনে হচ্ছে, হারিয়ে গেছে তো যাক। বন্ধ থাকুক ওই দরজাটা।

রোহিনী আর রঞ্জন আজকে বসে আছে প্রিন্সেপ ঘাটে। সূর্য ডুবেছে কিছুক্ষণ আগেই। তবুও আকাশ জুড়ে এখনও নিজের সাম্রাজ্য সামলানোর চেষ্টায় পশ্চিমাকাশ লালচে হয়ে আছে। সেদিকে বিভোর হয়ে তাকিয়ে রোহিনী বলল, 'দেখ রঞ্জন, চলে যাওয়া মানেই মুছে যাওয়া নয়। ঠিক আমাদের শুভমের মতো। চলে গিয়েও আমাদের জুড়ে আছে, তাই না? তুই, আমি রোজ একবার হলেও ওর নামটা উচ্চারণ করি। শুভমের বাড়িতে গিয়েছিলাম কালকে। মানুষের কী অদ্ভুত জীবন কাকিমাকে দেখলে বোঝা যায়। নিখুঁত করে গোছাচ্ছিলেন শুভমের ঘরটা। যেন ও এখুনি ফিরবে কোথাও থেকে। আমাকে দেখে বললেন, আগে তো ঘরে হাত দিতে দিত না কাউকে। তার নাকি অনেক কাগজপত্র সম্পত্তি সব আছে সেসব হারিয়ে যাবে। জঞ্জাল করে রেখেছিল ঘরটা। আজ ভাবলাম, এখন তো বকার নেই

কেউ তাই গুছিয়ে রাখি একটু। কাকিমাকে দেখে ভাবলাম, জীবন কী ভীষণ রকম চলমান তাই না রে! বেশ গড়িয়ে গড়িয়েও চলছে।'

রঞ্জন আলতো করে রোহিনীর হাতটা তুলে নিয়ে বলল, 'শুভম তোকে কখনও কিছু বলেনি রোহিনী?'

রোহিনী আজ আর হাতটা সরিয়ে নিল না। বরং রেখেই দিল। বলল, 'কী বিষয়ে?'

রঞ্জন বলল, 'না, মানে...ও তোকে ভালোবাসে বলেনি কোনোদিন?'

রোহিনী হেসে বলল, 'বলার কি খুব প্রয়োজন ছিল? ছিল না, জানিস। ও জানত ওকে আমি ওর থেকেও ভালো চিনি। ওর মনের প্রতিটা আনাচে কানাচে আমি ঘুরে বেড়াই। তাই ও আর নতুন করে কী বলবে বল? আমি তো জানতাম শুভমের মনে একটাই নামের অস্তিত্ব ছিল, সেটা রোহিনী।'

রঞ্জন বলল, 'আমার মনের গলিতে কখনো ঘুরেছিস রোহিনী? একবার কষ্ট করে ঘুরে দেখিস তো, কার নাম পাস ওখানে!'

রোহিনী চুপ করে থেকেছে। তারপর বলেছে, 'বাবা-মা আমার বিয়ের কথা ভাবছে তোর সঙ্গে। যদি আমি রাজি না হই তোকে বিয়ে করতে তাহলে অন্য কাউকে দেখবে পাত্র হিসাবে। আমি বাবা-মাকে বলেছিলাম, আমি চাকরি করছি। বিয়েটা কি না করলেই নয়?'

বাবা আমার স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করেনি জানিস। তারপরেও বলল, 'করলে খুব একটা খারাপ হবে না রুহু। আমরা চাই তুই রঞ্জনের সঙ্গে সংসার পাত। যদি তোর আপত্তি থাকে রঞ্জনকে বিয়ে করতে তাহলে জানাস, আমরা অন্য পাত্র দেখব।'

বাবা আসলে কখনও চায়নি আমার কাছে কিছু। আমিও ভেবে দেখলাম, তোর জায়গায় অন্য কেউ থাকলে লাভ বিশাল কিছুই হবে না। বরং শুভম

তোর বন্ধু ছিল, তাই তুই আর আমি মিলে শুভমের 'ঘরে বাইরে' দলটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারি, কি বলিস?'

রঞ্জন ওর লক্ষ্যের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রোহিনী ওর হতে চলেছে। এর থেকে বড় পাওনা আর কিছুই নেই ওর জীবনে। এই দিনটার জন্য ও অনেক কিছু করেছে। তবুও কোথায় যেন চিনচিনে ব্যথাটা পীড়া দিচ্ছে। ওকে বিয়ে করার কারণটাও রোহিনীর কাছে সেই শুভম-ই। যেহেতু রঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে হলে শুভমকে নিয়ে আলোচনা করতে পারবে, 'ঘরে বাইরে' দলটাকে আবার জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে, তাই রোহিনী রঞ্জনকে বিয়ে করতে নিমরাজি হয়েছে। সূক্ষ্ম অপমানবোধ ওর পৌরুষে এসে তীব্র আঘাত করল যেন। তবুও রোহিনীকে পেতে ও সব করতে পারে।

রোহিনী যতক্ষণ ওর পাশে থাকে, ততক্ষণই যেন বসন্ত থাকে ওর জীবনে। রোহিনী যখনই চলে যায়, অদ্ভুত এক ধূসরতা ধীরে ধীরে গ্রাস করে ওর ছাপোষা কেরানি জীবনটাকে।

রোহিনীর সঙ্গে ধুমধাম করে বিয়েটা হয়ে গেল রঞ্জনের। শুভমের মৃত্যুর পর প্রায় দশমাস অতিক্রান্ত। রঞ্জন জানে নতুন সংসার, নতুন বাড়ি, নিজের চাকরি, কবিতা, শ্রুতিনাটক নিয়ে ধীরে ধীরে ভুলে যাবে রোহিনী শুভমকে। আর তখনই হবে রঞ্জনের নিরবিচ্ছিন্ন জয়।

ফুলশয্যার বিছানাতেও রোহিনী রঞ্জনের বউ হিসাবেই ধরা দিয়েছে। কোনো ছন্দপতন ঘটেনি সেখানে। ওদের নতুন বাড়িটা রোহিনীর হাতের ছোঁয়ায় নতুন করে সেজে উঠেছে। ড্রয়িংয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তের বড় বাঁধানো ছবি। ফুলদানিতে রজনীগন্ধা। বইয়ের তাকে রবীন্দ্র রচনাবলী, ঠিক যেন পারফেক্ট সংস্কৃতিবান বাঙালি বাড়ি। সঙ্গে শিক্ষিতা, রুচিসম্পন্না, সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী। রঞ্জনের জীবন কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

এবার শুধু নিজের প্রমোশন নিয়ে একটু ভাবতে হবে। রোহিনী আর রঞ্জনের উপার্জনে ওদের সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে ঠিকই। তবুও রঞ্জনের নিজেকে প্রমাণ করার ইচ্ছেটা চেপে বসেছে। রোহিনীর চোখে আরেকটু শ্রদ্ধার আসনে বসার ইচ্ছে থেকেই এমন জেদ হয়েছে ওর।

অফিস থেকে ফিরে নতুন করে পড়াশোনায় মন দিয়েছে রঞ্জন। রোহিনীকেও বলেছে, 'পারলে পিএইচডি-টা কমপ্লিট করতে পারতিস।'

রোহিনী হেসে বলেছে, 'ইচ্ছেটা মরে গেল যে আচমকাই। যদি কখনও আবার ইচ্ছেটা মাথাচাড়া দেয় তাহলে দেখব। আপাতত লেকচারার হয়েই চলুক জীবন।'

রোহিনীর চলার মধ্যেও যেন অদ্ভুত একটা ছন্দ আছে। সেদিকে মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকে রঞ্জন। বারংবার মনে হয়, একটা মেয়ে কী করে এত সুন্দর হয়! ভাবতেই অবাক লাগে রঞ্জনের। রোহিনীর শরীর-মন জুড়ে ওর একাধিপত্য। বিছানায় রোহিনীকে আদর করতে করতে কেঁপে ওঠে রঞ্জন। বিশ্বাস হয় না যেন রোহিনী শেষ পর্যন্ত ওর হয়েছে!

ওদের আজ ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি। রঞ্জন রোহিনীর জন্য একটা ছোট্ট পেনডেন্ট কিনেছে। ওদের দুজনের একটা ছবি লকেটের মধ্যে মিনাকারী কাজে বাঁধানো হয়েছে। সন্ধেতে এটা পরিয়ে দেবে রোহিনীকে। সঙ্গে একটা ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের ব্যবস্থাও করেছে।

বাড়ি ঢুকতেই রোহিনী এসে হাসিমুখে জড়িয়ে ধরল রঞ্জনকে। বলল, 'তোর জন্য একটা উপহার আছে।'

রঞ্জন দেরি না করে লকেটটা একটা সরু সোনার চেন সমেত পরিয়ে দিল রোহিনীর গলায়।

রোহিনী লকেটটা দেখেই বলল, 'দারুণ ছবিটা। এটা আমাদের মালাবদলের ছবি, তাই না রে?'

রঞ্জন ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলল, 'ঠিক। থাকুক তোর গলায় এটা, আমি-তুই একসঙ্গে।'

রঞ্জনকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল রোহিনী ওদের বেডরুমে। দেওয়াল জুড়ে শুভমের একটা ছবি। শুভম হাসছে। হাসিটা ভীষণ মিনিংফুল। কিছু যেন বোঝাতে চাইছে হাসির মাধ্যমে।

রঞ্জন অবাক হয়ে বলল, 'হঠাৎ শুভমের ছবি বেডরুমে কেন?'

রোহিনী বলল, 'যেদিন আমি বিয়েতে রাজি হলাম, সেদিন ভেবেছিলাম, শুভমকে ছেড়ে আমি বোধহয় আর কাউকেই মানিয়ে নিতে পারব না, জানিস রঞ্জন। সেদিন আমি শুভমের কাছ থেকেই শক্তি চেয়ে নিয়েছিলাম। ও সেই শক্তি আমাকে দিয়েছিল বলেই তো আমরা আজ একসঙ্গে একবছর কাটিয়ে দিলাম সুন্দরভাবে। তাই ভাবলাম, শুভম থাকুক আমাদের বেডরুমে। আমি তোকে বিয়ে করতে রাজিই হয়েছিলাম শুভমকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব এই ভেবে। তাছাড়া তুইও শুভমের ভালো বন্ধু ছিলি। আমাদের পরিচয়ও ওর 'ঘরে বাইরে'-তে গিয়েই। সব মিলিয়ে এটা আমাদের বিবাহবার্ষিকীর বেস্ট গিফ্ট আমাদের দুজনের জন্যই।

তুই বস, আমি চা আনছি।' বলেই শুভমের ছবিটাতে নরম করে গাল ঠেকিয়ে চলে গেল রোহিনী।

রঞ্জন শুভমের ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। শুভম যেন বলছে, 'সব স্পর্শে আদর থাকে না। কিছু ছোঁয়ায় শুধুই কর্তব্য থাকে বুঝলি রঞ্জন? তুই এখনও প্রেম আর বন্ধুত্বের মানে বুঝলি না রে। রোহিনী আজও আমার, শুধুই আমার। তুই হেরে গেছিস রঞ্জন, ভীষণ রকমের হেরে গেছিস।'

রোহিনী চায়ের কাপ হাতে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'ঘরে বাইরে' নাট্যগোষ্ঠীর সবাইকে ডেকেছি। আবার আমরা নাটকটা শুরু করব বুঝলি?'

রঞ্জন হেরে গেছে। মারাত্মক পরাজয় ঘটেছে ওর। রোহিনীর মনের ঘরের ওই কুঠুরিটার তালার চাবিটা কিছুতেই খুঁজে পেল না রঞ্জন। ছবিতে থাকা শুভম হাসছে। ওদের বেডরুমে বসে হাসছে।

